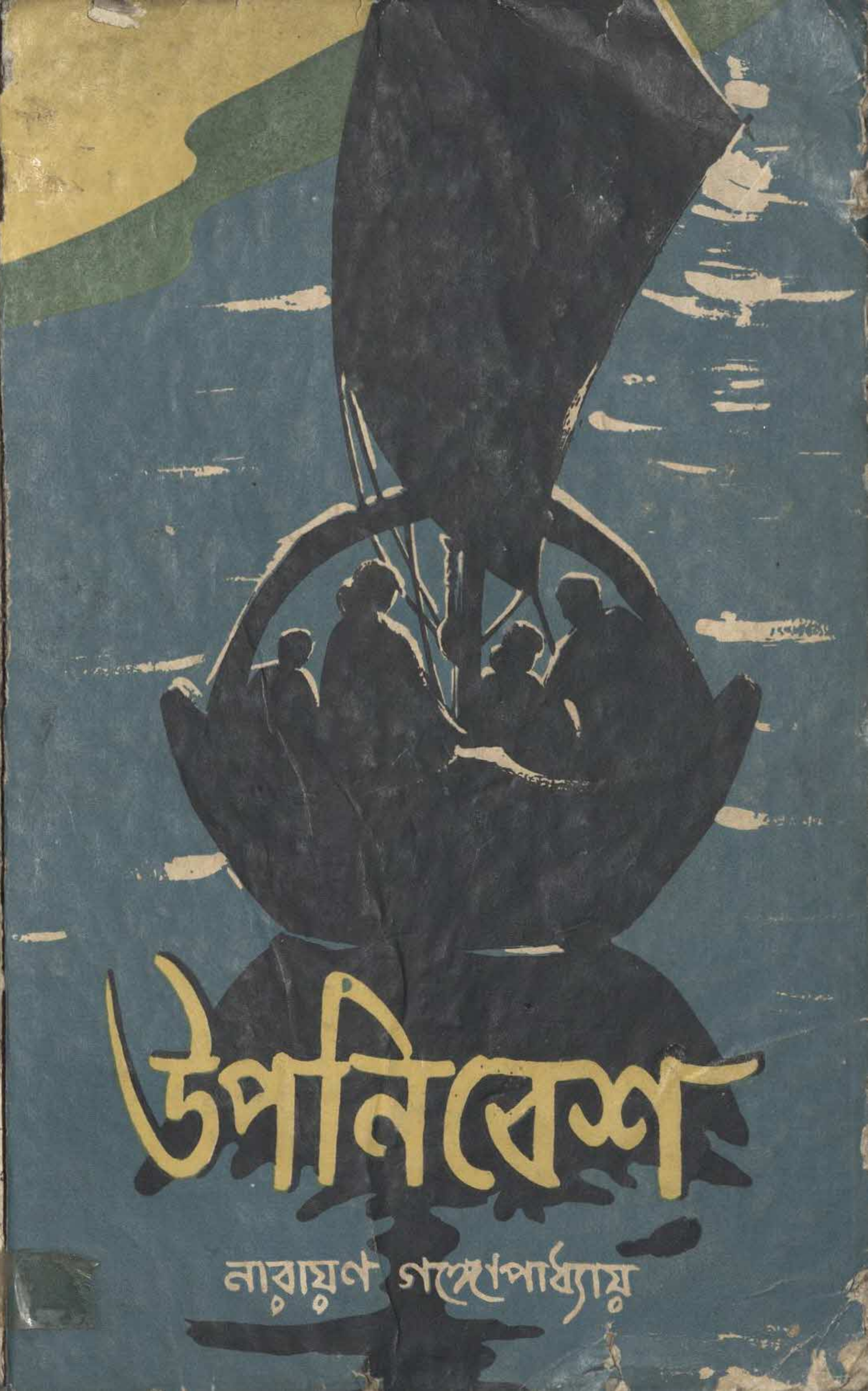

উপনিবেশ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



উপনিবেশ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড

৩৩, কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

বাক্-সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৭৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৭৮

প্রকাশক ঃ
শ্রীসোমশুভ্র মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট ঃ
শ্রীকানাই পাল

আট টাকা পঞ্চাশ প.

নৃত্যশিল্পী

বুলবুল চৌধুরী এম-এ

প্রিয়বরেষু

উপন্যাসের ভূমিকা

উপন্যাস লেখবার কথা সেই দিনই আমার মনে এসেছিল—যেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম পৃথিবীটা অনেক বড়ো।

খুব পুরানো দিনের কথা খুব সহজ ভাষায় বলা হল। কিন্তু নিজের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, তখন উপন্যাস লেখবার পক্ষে এই একটিমাত্র কৈফিয়ৎই আমি খুঁজে পাই।

প্রকৃতি আমার মন ভুলিয়েছিল চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গেই। ধূ-ধূ বালির বুকে একটা ক্ষুরধারা নদী—নাম কাঞ্চন। এমন অপূর্ব নাম তার কে দিয়েছিল জানি না। বর্ষায় রাক্ষসী হয়ে উঠে রেলের মস্ত পুলটাকে যেন ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইত—বালির ডাঙা থেকে উপড়ে নিয়ে যেত বৈঁচির বন। তার এক ধারে ছিল শীতে লাল-হলুদের রঙ্-মাখানো একটা আদিগন্ত ফুলের জঙ্গল—আর পাড়ে ছিল পঞ্চাশ বছর আগে পরিত্যক্ত পুরাণো আমগাছের ছায়ায় ঢাকা একটা ইয়োরোপীয় গোরস্থান। নদীর ধারে সমান্তরাল ওই ফুলের বন মনটাকে সামনের দিকে হাতছানি দিত, ওই গোরস্থানটা ঘনিয়ে আনত থমথমে অন্ধকার।

এই হল সূচনা।

বলা যেতে পারে, আমার মন দিয়ে প্রকৃতিকে আমি দেখিনি, প্রকৃতিই আমার মনকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে একেবারে সরে গিয়ে বিশুদ্ধ নিসর্গরসে তন্ময় হয়ে থাকা যাবে—এমন সুযোগ এ যুগে কে পায়? আমিও পাইনি। অহিংসার রাজনীতি থেকে বিপ্লববাদের পথেও পদক্ষেপ করতে হল একদিন। আমার প্রকৃতির মধ্যে মানুষ এসে দাঁড়ালো। আকাশ, জল, মাটি পেল একটা নতুন তাৎপর্য—পেন্সিলের রেখায় ভৌগোলিক পৃথিবীর একটা আদ্‌রা এঁকেছিলাম, রক্ত মাংসের রঙ্ পড়ল তাতে।

অর্থাৎ পটভূমি আগে সৃষ্টি হল, তারপর এল চরিত্র। আমার মাটি থেকে আত্মাকে গ্রহণ করল মানুষ। একটা লোক নদীতে সাঁতার দিয়ে পার হচ্ছে—এইটিকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে প্রথমে নদীটাকেই আমার মনে পড়বে; তার তীর, তার তরঙ্গ, তার খাড়া পাড়ের ফাটলে গাং-শালিকের বাসা, তার আধ-ডুবো চড়ার ওপর একসার বন-ঝাউ। যে মানুষটা সাঁতার দিয়ে চলেছে, সে এই পরিপার্শ্বের সঙ্গেই একাকার হয়ে থাকবে; নিজের একটা উগ্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে একে আচ্ছন্ন করে দেবে না। তাকে এই নদীটিরই একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে হবে।

সুতরাং কাকন নদীর ধার থেকে যখন বরেন্দ্রভূমির আচক্রবাল মাঠের দিকে পা বাড়ালাম, তখন এমন একটা পৃথিবীকে দেখলাম, যা আমার কল্পনাকে ছাড়িয়ে তরঙ্গিত রাঙা মাটির টিলায় টিলায় মহাশূন্যতায় অগ্রসর। আর তার ওপর চোখে পড়ল আমার দেশের মানুষকে। তিন মাসের বেশি তার খোরাকীর ধান থাকেনা, পাঁচ মাস পরে তার দু'পয়সার লবণ জোটেনা এবং অন্তত তিনমাস তাকে বুনো ওল সেদ্ধ করে পেটের জ্বালা জুড়োতে হয়। আমার মহা-পৃথিবীতে এসে মিশল মহা-বুভুক্ষা; লাল মাটির ওপর বৈশাখী ঘূর্ণি আমার চোখে দীর্ঘশ্বাস হয়ে উঠল।

আমার প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশে'র জন্মও এই ভাবেই। নিম্ন বাংলার নদী সমুদ্রের দেশে মাটির মতোই সমাজ আর জীবন যেখানে অপরিণত, তার একটা অপরূপ রূপ, আমার কিশোর-কল্পনাকে রোমাঞ্চিত করে রেখেছিল। তার সঙ্গে কী করে যে একদিন মিখেইল শোলোকভের যোগাযোগ ঘটল, তা আজ আর আমার ভালো করে মনে পড়ছেনা। কিন্তু ডন কোজাক্‌দের নিয়ে শোলোকভের সেই আশ্চর্য সৃষ্টি—সেখানে ব্যক্তি চরিত্র মুখ্য নয়, আলোড়িত বিলোড়িত একটা বিপুল গোষ্ঠির প্রাণ-বন্যায় ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে গেছে এবং বিলিতী অর্কেস্ট্রার বহু যন্ত্রের হার্মনির মতো বিচিত্রের অখণ্ডতা যেখানে ধ্বনিত হয়েছে সেই রকম ভাবে একটা সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে আমি প্রলুব্ধ হয়ে উঠলাম। চর ইসমাইলের পটভূমি তার আদিমতার স্বরলিপিতে বহুচরিত্রের যন্ত্রকে ঐক্যতানে বাজিয়ে তুলল। তাই এই উপন্যাসের, অন্তত প্রথম খণ্ডের মানুষগুলি উপনিবেশেরই সৃষ্টি—তারা উপনিবেশকে গড়ে তোলেনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উপনিবেশ

ভূমিকা

পৃথিবী বাড়িতেছে।

দিনের পর দিন নদীর মোহানা-মুখে পলিমাটির স্তর পড়িতেছে, আর ক্রমে ক্রমে সেই স্তরের উপর দিয়া সুন্দরবন প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহাতেই শেষ নয়। প্রয়োজনের ধারালো কুঠার দিয়া লোভী মানুষ বনভূমিকে করিতেছে সমভূমি—অরণ্যকে করিতেছে উপনিবেশ।

আবার ওদিকে যখন মেঘনার কালো জলে কল্ কল্ করিয়া ঘূর্ণি ঘুরিতে থাকে, আকাশের একপ্রান্তে এতটুকু বৈকালী মেঘ দেখিয়াই বৈশাখী নদী উন্মত্ত উদ্দাম হইয়া উঠে, তেঁতুলিয়ার মুখ দিয়া যখন পাহাড়ের মতো খাড়া হইয়া দুর্জয় বেগে 'শরের' জল ছুটিয়া আসে, তখনো সেই মৃত্যু-তরঙ্গের নিভৃত তলাটিতে বসিয়া জীবন-কীট অন্ধ-প্রেরণায় রচনা করিয়া চলে। দেখিতে দেখিতে অতলস্পর্শ নদী গর্ভে স্টিমার কোম্পানীর লোক আসিয়া বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতিয়া যায়, রাত্রে সেই বাঁশের মাথায় লাল আলো মিট্ মিট্ করে, জানাইয়া দেয় এখানে বাঁও মিলিবে। আরো কিছুদিন পরে ভাঁটার সময় সেখানে মহাজনী নৌকার হাল আটকাইয়া যায়, ইলিশ মাছের ডিঙ্গিগুলি লগি পুঁতিয়া অবসর সময়ে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লয়। তার পর আস্তে আস্তে সেই অথই জল ঠেলিয়া অতিকায় তিমির মতো একটা প্রচণ্ড চড়া জাগিয়া ওঠে। রোদে বৃষ্টিতে চড়ার নোনা ক্ষয় হইতে থাকে, আগাছা জন্মায়, তার পরে আসে মানুষ। অমনি সোনার কাঠির ছোঁয়াচ লাগিয়া যায় যেন। পৃথিবী বিস্তৃত হয়—নতুন মাটিতে নতুন নতুন ফল ও শস্য জন্মিয়া প্রয়োজনের ভাণ্ডারটিকে পূর্ণতার দিকে লইয়া চলে।

ইহাই উপনিবেশ। জাতিক্ষেত্রে নয়, দেশক্ষেত্রেও নয়। সমগ্র পৃথিবী, সমস্ত সৌর-জগৎ, মহাকাশ ও মহাকাল ব্যাপিয়া এই উপনিবেশ রচনা হইয়া চলিয়াছে।

১

অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা মনে পড়িতেছে।

নবাব আলীবর্দী তখন বাংলার সিংহাসনে। মাকড়সার জালের মতো ধীরে ধীরে ইংরেজের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি বাংলাময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর পলাশীর প্রান্তরে যে ঝড় একদিন করাল মূর্তি নিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, দিকে দিকে তাহারি নিঃশব্দ আয়োজন স্বরু হইয়া গিয়াছে।

সেই সময় এবং তার বহু আগে হইতেই নিম্ন বাংলায় পর্তুগীজ জলদস্যুরা অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিল। এই 'আর্মাডা' বা হার্মাদদের ভয়ে তখন সমুদ্রের মুখে নদীনালাগুলি এতটুকুও নিরাপদ ছিল না। এই পর্তুগীজদের দল কেবল যে বড় বড় জাহাজ লইয়া সমুদ্রে বা নদীতে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত তাহাই নয়, স্বন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে নদীর চরে তাহারা স্বরক্ষিত অনেকগুলি কেল্লা তৈয়ার করিয়াছিল। বড় বড় তোপ পাতিয়া এই সব কেল্লাতে তাহারা শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করিত, বোম্বেটে জাহাজে পাল তুলিয়া তাহারা গ্রামের উপর, জমিদার বাড়ির উপর হানা দিত। তাহাদের সেই সমস্ত অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাসের বিবর্ণ পৃষ্ঠায় আর ক্ষীয়মান জনস্মৃতির উপরে আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে। এই পর্তুগীজদেরই স্মরণ-চিহ্নিত তেঁতুলিয়ার মোহনায় চর ইস্মাইল।

অতীতকে ভুলিয়া যাওয়ার আশ্রান্ত সাধনার মধ্য দিয়াও চর ইস্মাইল সেদিনের কথা অনেকখানি মনে রাখিয়াছে। নোনা জল আর নোনা মাটির দেশ—ইটের দেওয়াল ছুদিনেই জীর্ণ হইয়া আসে, তবুও পর্তুগীজদের ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজ অবধিও আত্মরক্ষা করিয়া আছে। চরের দক্ষিণ দিকের যে অংশটা নদীতে ভাঙিয়া নিয়াছে, মাত্র দশ বছর আগে আসিলেও ওখানে তাহাদের প্রকাণ্ড গীর্জার খানিকটা অবশেষ অন্তত দেখিতে পাওয়া যাইত। বালির মধ্যে পুঁতিয়া যাওয়া একটা লোহার কামান দেখিয়া তাহাদের বলবিক্রম আজিকার দিনেও খানিকটা অনুমান করিয়া লওয়া চলে।

চর ইস্মাইল।

আজ কিন্তু সেখানে মস্ত বাজার বসিয়া গিয়াছে। সরকারী ডাক্তারখানা, ডাকঘর, কোর্ট অব্ ওয়ার্ড্সের ছোটখাট একটি কাছারী। বাসিন্দা যাহারা,

তাহাদের অধিকাংশেই চট্টগ্রাম আর নোয়াখালি হইতে আসা একদল দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, কিছু পরিমাণে মগ আর একদল জেলে।

কম করিয়াও এখন প্রায় দেড়হাজার মানুষের বসতি। সপ্তাহে একদিন খুব বড় করিয়া হাট বসে, আশে পাশের চরে বালাম ধান আর মহিষের বাথান লইয়াই যাহারা দিন গুজরাণ করে, এই একটি দিনে এখানে আসিয়া তাহারা প্রয়োজন অপ্রয়োজনের অনেক কিছু কেনা-কাটা করিবার সুযোগ পায়। অনেক সময় এখানে আসে বড় বড় মহাজনী নৌকা—আশা করা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের কিছু কিছু প্রসার ঘটিলে হয়তো বা আর্-এস্-এন্ কোম্পানী এই পর্যন্ত ষ্টিমারের একটা লাইন খুলিলেও খুলিতে পারে।

কিন্তু এত করিয়াও চর ইস্‌মাইল সভ্য জগতের খুব কাছে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। নদীর নিবিড় ও গভীর স্নেহ ইহাকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া আছে। সে স্নেহের কঠিন বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিয়া সম্পূর্ণভাবে ইহাকে আত্মসাৎ করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে।

নদী—অশান্ত এবং চঞ্চল। জলের আস্বাদ যেমন আঁশ্‌টে, তেমনই নোনা। ভাঁটার সময় আবার সে জলের রঙ নীলাভ হইয়া আসিতে চায়। আর বিচিত্র বর্ণ-গন্ধসমন্বিত সেই জল অন্তহীন বিস্তারে চর ইস্‌মাইলকে সমস্ত জগৎ হইতে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে বলিলেই চলে। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার সহিত বৎসরে মাত্র ছয় মাস পৃথিবীর সত্যিকারের যোগ-সূত্রটা বজায় থাকে। আশ্বিনের শেষ হইতে ফাল্গুনের শেষ—সময় বলিতে ইহাই। যেই নদীর বুকের উপর হইতে কুয়াশার পর্দাটা একটু একটু করিয়া সরিয়া যায় আর চরের গায়ে এখানে ওখানে দু'চারিটি বুনো ফুল ফুটিতে শুরু করে, অমনি পাটির মতো শান্ত নদীটির চেহারা যায় বদ্‌লাইয়া। হয়তো চৈত্রের এক বিকালে আকাশের ঈশান কোণে কে একবিন্দু কালি ছিটাইয়া দেয়—আর তারপরেই গোঁ গোঁ করিয়া চাপা একটা কান্নার মতো শব্দ নদীর তলা হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। ক্রমে সেই শব্দ বাড়িতে থাকে, বাড়িতেই থাকে—সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেরও আগড় খুলিয়া যায়। সেই তাণ্ডবে একবার পড়িলে এক গাছের শাল্‌তি নৌকাও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে না। আর ঝড় না উঠিলেই বা কী আসে যায়। তেঁতুলিয়া, মেঘনা, ইলসা কিংবা কালাবদরের মুখে যখন তখন যে এক একটা দমকা উঠিয়া আসিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে।

অতএব বৎসরে ছয় মাস চর ইস্‌মাইল নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া নদীর নিভৃত বুকের মধ্যে দিন কাটাইয়া চলে। কেবল ডাকের নৌকাই যা একটু যাতায়াত করে, কিন্তু তেমন-তেমন প্রকৃতিবিপর্যয় ঘটিলে তাও যায় বন্ধ হইয়া। সেই সময়ে চর

ইস্‌মাইল একটা অনাবিষ্কৃত দ্বীপের মতো তার সভ্য এবং অর্ধ-সভ্য একদল মানুষ লইয়া নিজস্ব মহিমায় বিরাজ করিতে থাকে।

এমন একটি সময়ে, সেই সব সভ্য ও অর্ধ-সভ্য মানুষদের লইয়াই এই কাহিনী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্তুগীজেরা আর নাই।

তেঁতুলিয়ার জলে বোম্বেটে জাহাজগুলির ভাঙা দাঁড় আর হালের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কঙ্কালগুলিও লোপ পাইয়াছে। চরের দক্ষিণ দিকে বিলুপ্ত গীর্জাটার সঙ্গেই ছিল তাহাদের গোরস্থান। আজ সেখানে নোনাজলে তির তির করিয়া ছোট ছোট ঘূর্ণি ঘোরে।

তাহারা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের স্মৃতি যে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে সে কথাও বলা চলে না। এই চর ইস্‌মাইলে এখনো আট দশ ঘর পর্তুগীজ বাস করে। বাহির হইতে চট্‌ করিয়া দেখিলে তাহাদের চেনা কঠিন। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের মুসলমানদের সহিত রক্ত-সম্পর্ক ঘটিয়া একটা বিচিত্র সঙ্কর জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহারা। পরে লুঙ্গি, কানে গুঁজিয়া রাখে গোলাপী বিড়ি, পিতৃপুরুষের ভাষায় শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত চাটিয়া খাইয়াছে বলা চলে। কথায় কথায় কেবল মেরীর নামে শপথ করে এবং বিবর্ণ একটা ধর্মসিক্ত কালো কারের সহিত গলায় ঝুলাইয়া রাখা একটা নিকেলের ক্রস্‌ তাহাদের ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দেয়।

আর বাড়্‌তির মধ্যে যা আছে তাহা হইতেছে তাহাদের নাম।

ইহাদের একজন ডি-সুজা সকাল বেলাতেই অত্যন্ত চীৎকার করিতেছিল। বোঝা যাইতেছিল লোকটা চটিয়াছে। বয়সের প্রভাবে সামনের তিনটা দাঁত ঝরিয়া পড়িয়াছে, কথার মধ্যে আসিয়াছে খানিকটা জড়তা। তাই কী সে বলিতেছিল সেটা ঠিক স্পষ্ট হইতেছিল না, কিন্তু যে রকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করিতেছিল, তাহা হইতে ইহা বুঝিয়া লওয়া চলে যে কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি সে আপ্রাণ-চেষ্টায় গালিবর্ষণ করিতেছে।

গালির চোটে অস্থির হইয়া পাশের বাড়ি হইতে জোহান বাহির হইয়া আসিল।

জোহানের বয়স অল্প। চেহারা দেখিয়া বোঝা যায় লোকটি সৌখীন। চুলটি কাঁধের উপর দিয়া বেশ করিয়া বাব্‌রী করা, পরনে একটি ফর্সা পায়জামা। এই সাত সকালেই সে একমুখ পান লইয়া চিবাইতেছিল।

জোহান বলিল, কী হয়েছে ঠাকুর্দা, এই সকাল বেলাতে অমন ভাবে চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

এমন মোলায়েম সম্বোধনেও কিন্তু ঠাকুর্দা খুশি হইল না, বরং আরো ক্ষেপিয়া উঠিল ঃ

—চ্যাঁচাচ্ছি মানে? তুমি যেন এর কিছুই জানো না। ন্যাকা আর কি!

জোহান বিস্মিত হইল না, রাগও করিল না। আবার তাকেই প্রশ্ন করিল, আবার আমাকে নিয়ে পড়লে কেন? কী হয়েছে ব্যাপারটা তাই খুলে বলো না?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। তুমি যে একেবারে গাছ থেকে পড়ছ, বলি আমার বড় রাওয়া মোরগটা গেল কোথায়?

—তোমার বড় মোরগটা? কেন, সেটার আবার কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? দন্তহীন মুখটাকে ডি-সুজা বিকট রকমে ভ্যাংচাইল ঃ সেটা তোমার পেটে গেছে কিনা সেই খবরটাই তোমার কাছে জানতে চাই।

জোহান বলিল, আমার? আমার পেটে গেছে একথা তোমায় কে বললে?

ডি-সুজা সরোষে কহিল, তবে কার পেটে গেল শুনি। মুরগী তো আর নিজে নিজেই খোঁয়াড়ের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে পারে না।

এইবার জোহানের চটিবার পালা।

—তাই বলে আমিই চুরি করতে গেলাম! চোরের অভাব আছে দেশে? ছ্যাখো ঠাকুর্দা, তুমি বুড়ো মানুষ বলে কিছু বলছি না, নইলে—

ডি-সুজা ইহাতে ভয় তো পাইলই না, বরং আরো তিন পা আগাইয়া আসিল। বলিল, নইলে কী করতে, করতে কী সেটা শুনি? তুমি তো পারো কেবল—একটা নিতান্ত অশ্লীল মুখখিস্তি করিয়া সে তাহার বক্তব্যটা শেষ করিল।

গেঞ্জির আস্তিন নাই, তবু অভ্যাস বশে দুই হাতে খানিকটা কাল্পনিক আস্তিন গুটাইয়া জোহান সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল। বলিল, মুখ সামলে কথা কোয়ো ঠাকুর্দা। ভালো হবে না বলছি।

ডি-সুজা আগুন হইয়া উঠিল। দুঃসাহসী পিতৃপুরুষদের রক্ত তাহার শিরা উপশিরায় ফেনাইয়া উঠিয়াছে। অথবা জোহানের অপেক্ষা বয়সে খানিকটা বড় বলিয়াই হয়তো পূর্বগামীদিগের সহিত রক্ত সম্পর্কটা তাহার নিকটতর। সেই মুহূর্তে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, রফা করা অপেক্ষা মারামারিটা বেশ করিয়া বাধাইয়া তোলার ইচ্ছাটাই তাহার অধিকতর প্রবল।

ডি-সুজা শাসাইয়া কহিল, তুইও মুখ সাম্‌লে কথা বলবি ছোঁড়া। নইলে—

কুরুক্ষেত্র-জাতীয় কিছু একটা হয়তো বাধিয়াই বসিত, কিন্তু বাধিল না। পরিপাটি হইয়া-আসা আয়োজনটির মধ্যে চট্ করিয়া একটা ছন্দপতন ঘটিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই ডি-সুজার সাম্‌নে কোথা হইতে একটি তরুণী মেয়ে আসিয়া

দাঁড়াইল। সস্নেহে একটি ধমক দিয়া বলিল, কেন পাগ্‌লামি করছ ঠাকুর্দা, তোমার চা হয়েছে, এসো।

ডি-সুজার গলার স্বর চড়া-পর্দা হইতে সেই মুহূর্তেই একেবারে অতি কোমল নিখাদে নামিয়া গেল। বলিল, কিন্তু আমার বড় মোরগটা—

মেয়েটি বলিল, আবার!

ডি-সুজা করুণ স্বরে বলিল, তুই কিছু বুঝিস নে লিসি—

লিসি বলিল, সব বুঝি। তোমার বড় মোরগটা শেয়ালে খেয়েছে, এসো তুমি।

মাথাটি নত করিয়া ডি-সুজা আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

জোহান তখনও তেমনি করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার দিকে ফিরিয়া লিসি শাসনের স্বরে বলিল, ঠাকুর্দা না হয় বুড়ো মানুষ, কিন্তু তোমারও তো একটু মাথা ঠিক রেখে চলা উচিত ছিল।

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে কী একটা তো তো করিয়া উত্তর দিবার আগেই লিসি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, এবং খটাং করিয়া জোহানের নাকের সামনেই দরজাটা দিল বন্ধ করিয়া।

জোহান দাঁড়াইয়া রহিল তো দাঁড়াইয়া রহিলই।

খাসমহল কাছারীর নূতন তহশীলদার মণিমোহন পোস্টাপিসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখের ভঙ্গিতে অত্যন্ত প্রকট একটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছিল।

কাল রাত্রিতে টানা বৃষ্টি হইয়াছে এক পশলা। সেই বৃষ্টিতে সামনে খানিকটা গর্তের মতো জায়গায় এক হাঁটু জল এবং কাদা জমিয়াছে। মণিমোহন রবারের জুতা জোড়া খুলিয়া হাতে লইল, তারপর কোঁচার কাপড় হাঁটু অবধি তুলিয়া ছপ্‌ ছপ্‌ করিয়া সেই জল-কাদাটা ডিঙাইয়া সোজা পোস্টাপিসে আসিয়া উঠিল।

পোস্টমাস্টার হরিদাস সাহা তখন একহাতে হুঁকা লইয়া উবু হইয়া বসিয়া চিঠি সর্ট করিতেছিলেন। সকালের ডাক আসিয়াছে। মেজের উপর একরাশ চিঠিপত্র চারিদিকে ছড়ানো—পিয়ন কেরামদ্দি সেগুলি বাছিতেছিল আর পোস্টমাস্টার একটু দূরে বসিয়া রেজেষ্ট্রি, বেয়ারিং ও মনি-অর্ডারগুলি আলাদা করিয়া লইতেছিলেন।

মণিমোহন জানালা দিয়া উদ্‌গ্রীব ও উদ্বিগ্ন চোখে চিঠি বাছাই দেখিতে লাগিল। একরাশ লম্বা সরকারী খাম একপাশে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে—ওগুলি নিশ্চয়ই খাসমহল আফিসের চিঠি। মণিমোহন ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নামে কোন পার্সনাল চিঠি এসেছে, মাস্টারমশাই?

চোখ তুলিয়া চাহিয়া পোস্টমাস্টার বলিলেন, পার্সনাল চিঠি? আপনার নামে? কই, চোখে তো পড়ল না। একবার ভালো করে দেখে দাও দিকি কেরামদ্দি।

দু'হাতে চিঠির স্তূপগুলি ছড়াইয়া দিয়া কেরামদ্দি বলিল, না বাবু, নেই। যোগেশবাবুর নামে পোস্টকার্ড এসেছে খালি একখানা।

—নেই? মণিমোহন মুহূর্তে বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া গেল। আজ প্রায় সাতদিন ধরিয়া তাহার চিঠি আসিতেছে না। মাঝে একবার সে তিন চার দিনের মতো আদায়ে বাহির হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল আসিয়া অন্তত চিঠিখানা সে পাইবেই; কিন্তু আজও চিঠি আসিল না।

পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। ওপারে বর্ধমান মেদিনীপুর, আর এপারে রাণাঘাট—ইহার বাহিরে আর কোনদিন পা বাড়ায় নাই। চলিতে চলিতে দেখিয়াছে রেল লাইনের দু'পাশে মাঠে—ঘন সবুজ শস্যের ঐশ্বর্যে দিক দিগন্তে রঙের সমুদ্রের মতো দুলিয়া উঠিতেছে। উঁচু বাঁধের পাশে পাশে কল্‌মি শাকে ঢাকা টুক্‌রা টুক্‌রা চিক্‌চিকে জল—দু'দিকের প্রসারিত উদার সমতলের বুকে বিস্ময়ের মতো নিঃসঙ্গ বা শ্রেণীবদ্ধ তালের গাছ; আমের বাগানে ঘেরা বাঁশবনের ছায়ায় চাষাদের গ্রাম—পাকুড় প্যাসেঞ্জার, গয়া ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, বা নর্থ বিহার এক্সপ্রেসে বসিয়া সেগুলিকে নিতান্তই কাব্যময় ও স্বপ্নময় বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আরো অনেকের সঙ্গে এক ঝাঁকে বি এস্ সি, পাশ করিয়া মণিমোহন আদাজুন খাইয়া জীবন সংগ্রামে ভিড়িয়া গেল। অবশ্য বাঙালির জীবন সংগ্রাম বলিতে যা বুঝায় ঠিক তাই। সংগ্রামটা যে কাহার সঙ্গে করিতে হইবে আজ পর্যন্ত সেটা নিশ্চিত করিয়া বলা গেল না। এ সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই—সফলতার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই—বাঁচিয়া থাকার একান্ত শক্তিহীন প্রয়াস: নো ভ্যাকান্সি, অবিশ্রান্তভাবে জুতার তলা ক্ষয় করিয়া চলা, স্তূপাকার দরখাস্ত, ফুটপাথের পাশে খড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকা জ্যোতিষীদের দিয়া হাত দেখানো, নবগ্রহ-কবচ এবং কখনো কখনো এক একটা টাকা খরচ করিয়া এক একখানা রেঞ্জার্সের টিকেট্।

কিন্তু আর কিছু না যাক, অন্তত একটা ব্যবসা এখন পর্যন্ত খোলা আছেই। ব্যবসা না বলিয়া বরং লটারী বলিলে অর্থ টা পরিষ্কার হয়। ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী নয় বটে, কিন্তু লোভ, লাভ এবং লভ্ এইখানেই যা হোক খানিকটা সামঞ্জস্য রাখিয়া যায়।

অতএব চাকুরী জুটিবার আগেই মণিমোহন বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু শাস্ত্রে আছে, "স্ত্রী ভাগ্যে ধন"—এবং এই সার্থক উক্তিটি প্রমাণ করিবার জন্যই শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের এই সুদূরতম প্রান্তে মণিমোহনের চাকুরী লাভ ঘটিল।

এখানে আসিয়া মণিমোহন এই সত্যটা সকলের আগে অনুভব করিল যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের প্রশস্ত ধানক্ষেতের বাহিরে পৃথিবীর আর একটা রূপ আছে। সে-রূপ মানুষকে নিতান্ত মুগ্ধ করে না—দিকে দিকে রাক্ষসীর মতো করালজিহ্বা বিস্তৃত করিয়া সে ফুঁসিয়া ওঠে—গর্জন করিয়া ওঠে। সে মূর্তির দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা আতংকে থর থর করিয়া দুলিতে থাকে।

কিন্তু এই রাক্ষস-মূর্তির যে ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত সৌন্দর্য, তাহাকে উপভোগ বা অনুভব করিবার মত দৃষ্টি বা অনুভূতি আজও এই মণিমোহনদের আসে নাই। যেদিন আসিবে সেদিন হয়তো জীবন-সংগ্রাম কথাটার সমস্ত অর্থ টাই যাইবে বদলাইয়া। আগুন-মুখার ষোলো মাইল পাড়ির মুখে আকাশ ঘিরিয়া কালো মৃত্যুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হয়তো সত্যকারের জীবন সংগ্রামের ইঙ্গিতটাকে খুঁজিয়া পাইবে। হয়তো দেখা যাইবে কে আসিয়া বৈশাখী বিপ্লবের সর্বনাশী মুখোসটাকে এক টানে খুলিয়া ফেলিল ; তাহার পশ্চাতে এক নবীন রূপ আসিয়া উঁকি মারিতেছে—বজ্রের প্রখর আলোকে তাহার মাথার রত্ন-মুকুট জ্বলিতেছে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া।

পোস্টমাস্টার হরিদাস সাহা কিন্তু আতিথেয়তায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আসুন না ভেতরে, একটান তামাক খেয়ে যাবেন।

মণিমোহন আমন্ত্রণটা উপেক্ষা করিল না। ভিতরে ঢুকিয়া সে কাঠের একখানা টুল টানিয়া লইয়া বসিল ; তারপর পোস্টমাস্টারের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া কহিল, চিঠি কেন এল না বলুন দেখি ?

পোস্টমাস্টার রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, গিন্নীর চিঠি বুঝি ? তা ভয় নেই মশায়, আমরা লুকিয়ে রাখি নি। বয়েস গেছে, বুঝলেন না ?

মণিমোহন হাসিল, না হাসিটা এ ক্ষেত্রে অশোভন। তবুও হাসিটা তাহার তেমন দানা বাঁধিল না।

পোস্টমাস্টার মণিমোহনের মুখভাবটা লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ও গভীর হইয়া উঠিলেন। লোকটি হাঁপানির রোগী। বুকের হাড়গুলি কালো চামড়ার তলায় জিল্ জিল্ করে—সেই কারণে চামড়াটাকে মাঝে মাঝে অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখায়। গলায় কালো সুতার সঙ্গে শাদা একটা কড়ি বাঁধা, ডান হাতে রূপার তারের মধ্যে নানা আকারের একরাশ তামার কবচ।

যতক্ষণ তিনি হাসেন, কালো মুখটা তবু একরকম দেখায় ; কিন্তু গম্ভীর হইয়া গেলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মানুষের ভয় করে। মনে হয়, বহু দিনের কাল-সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়া বর্তমানের ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইয়াছে লোকটা।

এই সাগরের উপর দিয়া যে সব ঝড় বহিয়া গিয়াছে—তাহাদের ঝাপ্টা তাহাতে একেবারেই এড়াইয়া যায় নাই। কপালের কুঞ্চিত রেখা-সমষ্টিতে, বুকের জিরজিরে হাড়গুলিতে আর কাঁধের উপরকার প্রকাণ্ড একটা ক্ষতচিহ্নে অনেক ইতিহাস অব্যক্ত হইয়া আছে।

পোস্টামাস্টার বলিলেন, এখন তো তবু দু'তিন দিন অন্তর চিঠি-পত্তর আসে, আর একটা মাস গেলে হয়তো দশ বারো দিন, চাই কি পুরো এক মাসই ডাক বন্ধ থাকবে।

মণিমোহন ভীত হইয়া কহিল, কেন?

—ডাক আসবে কী করে বলুন? নদীর অবস্থা তো দেখছেন। একবার ক্ষেপে উঠলে কারও সাহস আছে, না সাধ্য আছে, এর ভেতর নৌকো ভাসায়? এক পারে কিছু কিছু মগেরা, কিন্তু ও ব্যাটাদের বিশ্বাস কী বলুন? গলা কেটে মাঝ নদীতে ভাসিয়া দিলে তো মা বলতেও নেই বাপ বলতেও নেই।

মণিমোহন হুঁকোটা নামাইয়া বলিল, কিন্তু আমি তো ভাবছিলুম চৈত্র মাসে একবার কিছুদিনের ছুটি নিয়ে—

—দেশে যাবেন, এই তো? কিন্তু সে গুড়ে বালি মশাই, সে গুড়ে বালি। এতো আর আপনার দেশ নয় যে মর্জিমাফিক এক সময় রেলগাড়িতে চেপে বসলেই গড়গড়িয়ে নিয়ে পৌঁছে দেবে। এ বড় কঠিন ঠাঁই, এখানে ভগবানের মর্জির ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হয়। তার উপর মাঝিই পাবেন না বোধ হয়। বেশ কিছু টাকা কবলিয়ে যদি বা একখানা নৌকো জোটাতে পারেন, কিন্তু তাতে চড়ে পাড়ি জমানো আপনাদের মতো মানুষের কাজ নয়।

মণিমোহন আরো বিবর্ণ হইয়া কহিল, কেন নৌকো ডুব্‌বে নাকি?

—তা কি আর সব সময়ে ডোবে? এ দেশের মাঝিরা এমন কাঁচা নয়। নৌকা ডুব্‌বার লক্ষণ দেখলে তারা পাড়িই ধরবে না।

—তা হলে আর ভয়টা কিসের?

—সেই তো বলছিলুম। জাহাজে চেপে সমদ্দুরে পাড়ি দিয়েছেন কখনো?

—না তো।

—ব্যাপারটা বুঝবেন না তবে। সমুদ্রের রোলিং জানেন তো? বেশি দূর যেতে হবে না, বরিশাল থেকে চাট্‌গার স্টিমারে একটিবার ঘুরে এলেই টের পাবেন। এ হচ্ছে সেই জিনিস—যার অনিবার্য ফল হচ্ছে সী-সিক্‌নেস্ এবং একমাত্র ওষুধ হচ্ছে লেবুর আরক; কিন্তু নোয়াখালির মাঝিদের নৌকোয় তো আর চামড়ার কৌচ কিংবা লেবুর আরক পাবেন না।

মণিমোহন বিস্ফারিত চোখে বলিল, নদীতেও কি সে-রকম রোলিং হয় নাকি?

—হয় না? আর নদীই বা আপনি কোথায় দেখছেন মশাই! নদী আর সমুদ্দুরে কি এখানে কি কোন তফাৎ আছে? জল একবার মুখে দিয়ে দেখবেন, মেসিনের সাহায্যে চেষ্টা করলে এ দিয়ে লবণ তৈরি করা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ আর চর ইস্মাইল, আসলে এরা পুরাপুরি এক জাতের—বুঝেছেন? শ্রাবণ-ভাদ্দরের আগে এ রোলিং আর থামবে না। এসেছেন তো ঠাণ্ডা সময়ে।

—আপনি এই রোলিঙের ভেতর পাড়ি দিয়েছেন কোনোবার?

পোস্টমাস্টার নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিলেন। তাঁহার মুখের উপর দিয়া মেঘের মতো কালো একটা ছায়া যেন বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার কোটরে-বসা চোখ দুইটা যেন অনেকদিনের ঘুমন্ত স্বপ্নাচ্ছন্নতা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। বহুদিনের মহাকাল-সমুদ্র পার হইয়া স্তূপাকার অভিজ্ঞতা লইয়া যেন মণিমোহনের সামনে অপরিচিতের মতো আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন।

—দিই নি আবার? বছর পনেরো আগে সে অভিজ্ঞতা একবার আমার হয়েছিল। তারপর থেকেই এইসব সীজ্‌নে নদী পাড়ি দেবার দুঃসাহস আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমিও ঢাকা জেলার ছেলে মশাই, পদ্মা নদীর সঙ্গে সঙ্গেই মিলে মিশে বেড়ে উঠেছি, জলের ভয়টাকে তেমন বিশেষ করিও না; কিন্তু সেবারের সে ব্যাপারে আমারও বুকটা দশ হাত দমে গেছে।

তা হলে ঘটনাটা বলি শুনুন। আমি তখন রণপুরায় ছিলুম। সে জায়গাটাও ঠিক এই রকম—একেবারে নির্বান্ধব পাণ্ডববর্জিত দেশ যাকে বলে। বাড়তির মধ্যে সেখানে একরকম কুকুর পাওয়া যায়—সমস্ত বাংলা দেশে সে কুকুরের জোড়া নেই। পর্তুগীজেরা এনেছিল। নেকড়ে আর বন-কুত্তোর ব্রিডিং, বাঘের চাইতেও ভয়ঙ্কর, গ্রেহাউণ্ডের চাইতেও বিশ্বাসী। এরই এক জোড়া কুকুর আমি সেবারে কিনেছিলুম।

চৈত্রের শেষ—বুঝতেই তো পারেন সময়টা কেমন। অর্থাৎ কথায় কথায় যখন কাল-বোশেখী ঘনিয়ে আসে, ঠিক সেই সব দিন। বহুকষ্টে একখানা নৌকা জোগাড় করে দুর্গা বলে এক সকালে ভেসে পড়লুম। সঙ্গে সেই কুকুর জোড়া।

পান্‌সী চলতে লাগল। নদীতে অল্প অল্প বাতাস—প্রথমটা তো ভালোই লাগছিল, ভাবলুম, এমনিই চলবে, "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।"

কিন্তু মশাই, কলির সন্ধ্যে তখনো আসে নি। এল যখন, আমরা ডাঙা ছাড়িয়ে তখন প্রায় মাইল চারেক এসে পড়েছি। নৌকো ঘন ঘন দুলতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল, গা বমি বমি করতে লাগল, তারপর চোখ বুজে নৌকোর খোলের ভেতর সোজা হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়লুম।

না, ঝড় আসে নি। আকাশের কোনো প্রান্তেও দেখা দেয় নি এক-টুকরো কালো কিংবা সোনামুখী মেঘ; কিন্তু অথই অন্তহীন নদীর বুক থেকে হু হু করে বাতাস উঠে এল—একটু মলয়-পবন বলা যেতে পারে। সে বাতাসের তালে ফুলে উঠল অসংখ্য ঢেউ - আর নৌকাটা একবার শাঁ করে ঠেলে আকাশে, আর একবার সোজা পাতালে নেমে যেতে লাগল।

দুদিনের পাড়ি; কিন্তু পুরো দেড়দিন আমার একরকম জ্ঞান ছিল না বললেই চলে। নৌকো ডুববে কি ডুববে না সে ভাবনা ভাববার সময় ছিল না, কেবল থেকে থেকে অস্পষ্টভাবে এই চেতনাটাই মাথার ভেতর ঘা মারছিল যে এই দুলুনির চোটেই আমার সোজা স্বর্গলাভ ঘটবে। বড় বড় জাহাজের ওপর চেপেও মানুষ যার ধাক্কায় হিমসিম খেয়ে যায় মশাই, একটুকু একখানা পান্সীর ভেতর তার অবস্থাটা কী রকম দাঁড়ায় না বললেও সেটা টের পাচ্ছেন আশা করি।

সেই বাঘা-কুকুরদের একটাকে তো নদীর মধ্যেই ফেলে দিতে হয়েছিল, আর একটাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ডাঙ্গায় এসে যখন পৌঁছুলুম, তখন তারও জীবনী-শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোনোমতে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে গেলুম, কিন্তু বাঁচল না, দু'তিন দিন পরেই মরে গেল। আর আমি? সে-ধকল সামলাতে পুরো দশটি দিন বিছানাসই হয়ে থাকতে হয়েছিল, বুঝেছেন!

পোস্টমাস্টার কাহিনী শেষ করিলেন।

মণিমোহন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া অবস্থাটা কল্পনা করিতে লাগিল। বলিবার ক্ষমতা আছে পোস্টমাস্টারের। চোখ মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলোড়ন পর্যন্ত তাঁহার বর্ণনাটাকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যে কোন ঘটনাকেই বিশ্বাস করাইয়া দেওয়ার একটা অদ্ভুত প্রতিভা তাঁহার আছে - তাই বহুক্ষণ ধরিয়া মণিমোহনের মনের সাম্‌নে দিগন্তব্যাপী বিরাট নদীর রোলিঙের দৃশ্যটা যেন ছবির মতো ভাসিতে লাগিল।

খানিক পরে বড় করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল সে। বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টিটা মেলিয়া দিয়া বলিল, কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আদায় করতে। ফিরতে বেশ কিছুদিন দেরী হবে। এর ভেতর পিয়ন পাঠিয়ে খবর নেব—চিঠি এলে তার হাতে দিয়ে দেবেন।

পোস্টমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা; কিন্তু এবার কোন দিকে বেরোবেন?

—ভাবছি, কালুপাড়ার দিকে নামব। অনেক টাকা বকেয়া পড়ে' রয়েছে—তা ছাড়া—টি-এ বিলটাও বেশ—বুঝলেন না?

পোস্টমাস্টার মৃদু হাসিলেন। তা আর বুঝি নে মশাই? ওই করেই তো ইংরেজ রাজত্ব চলছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ—মণিমোহন হাসিয়া বিদায় লইল।

২

নদীর ধার দিয়াই বেলে-মাটির পথ। পূর্ণিমার জোয়ারে জল তীরের অনেকখানি অবধি ছাপাইয়া গিয়াছিল, তাই পথের উপরে একরাশ এঁটেল মাটি জমিয়া গিয়াছে। রবারের জুতাটাকে অত্যন্ত চাপিয়া চাপিয়া মণিমোহন চলিতে লাগিল। বেশ ছাপ পড়িতেছে কাদায়। চরকা মার্কা জুতা। সস্তা, টেঁকেও অনেকদিন।

এপাশে নদী। বসন্তের ছোঁয়ায় জলের ঘোলাটে বর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে অনেকটা। পরপারহীন অসীম জলের বুকে যতটা চোখ যায় অসংখ্য জেলে-নৌকা ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিয়া উঠিতেছে। এ বৎসর ইলিশ-মাছ পড়িতেছে বেশ। দু'পয়সা করিয়া এক একটা বড় বড় মাছ বিক্রয় হয়। পশ্চিমবঙ্গের ছেলের কাছে ইহা পরম বিচিত্র ও বিস্ময়কর ব্যাপার।

ওই যে—শাদা বড় নৌকাটা আবার আসিয়াছে।

মাসে একবার করিয়া নৌকাখানা এই বন্দরে আসিয়া ভেড়ে। নৌকাখানা বর্মিদের। তাহারা এখানে নাকি ব্যবসা করিতে আসে। কখনো কিছু সুপারী কেনে, কখনো ধান, কখনো বা নারিকেল। আকিয়াবে নাকি তাহাদের কারবার আছে।

দুইজন বর্মি এ পাশে বসিয়া নিজেদের মধ্যে কী আলোচনা করিতেছে, একজন একটা স্টোভ ধরাইতেছে; আর একজন নৌকার ছৈয়ের উপর বসিয়া চোখ বুজিয়া একটা লম্বা চুরুট টানিতেছে। চরের উপর দুইটা মস্ত মস্ত লোহার নোঙর—জোয়ারের জল আসিয়া নৌকাটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে না পারে তাহারই ব্যবস্থা।

বেশ আছে ওরা। বাঁচিতে হয় তো ওদের মতো করিয়াই। সুদূর বর্মা—মেঘের মতো মাথা তুলিয়া পাহাড়, তাহার কারুকার্য-খচিত গুহাগর্ভে অপূর্ব ভাস্কর্য; উপত্যকা ভরিয়া নানা রঙের ফুল যেন সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। ধূপের ধোঁয়া—ফুলের গন্ধ, রেশমী ঘাগরা পরা চূড়া-বাঁধা মেয়ের দল। প্যাগোডার উদ্ধত শিরে সোনার দীপ্তি ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। সমুদ্রের নীল জল পান করিয়া ইরাবতী যেন নীলকণ্ঠ।

সেই দেশ হইতে ওরা আসিয়াছে। পাহাড়, নদী, সমুদ্র ডিঙাইয়া। ঘরের টান এই সাত সমুদ্র তের নদীর পারেও ওদের বিচলিত করিয়া তোলে না। আর এই ছয়টি মাস মাত্র সে পশ্চিমবঙ্গ হইতে নিম্নবঙ্গে আসিয়াছে, অথচ ইহারি মধ্যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের ধানক্ষেত থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

তা, যে যাই করুক, এখানে সব চাইতে ফলাও ব্যবসা লইয়া বসিয়াছেন, কবিরাজ বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন।

ভদ্রলোক বলিলে, বাংলাদেশের যে বিশেষ সম্প্রদায়টি বোঝায়, তাহাদের সংখ্যা এখানে নাই বলিলেই চলে। এক আছেন পোস্টমাস্টার—তিনি একাই বেশ আসর জমাইয়া লইতে পারেন। খাসমহলের কর্মচারীদের দু'একজন মাঝে মাঝে আসেন। তা ছাড়া সম্প্রতি মণিমোহন আসিয়াছে, কলেকসনের ফাঁকে ফাঁকে টাকা জমা দিতে আসিলে সেও কখনো কখনো এখানকার তাসের আড্ডায় আসিয়া যোগ দেয়।

আতিথেয়তার ব্যাপারে বলরামের তুলনা নাই।

খাটো চেহারার দোহারা গোছের লোকটি, মোটামুটি সুপুরুষ বলা চলে। ঠিক চাঁদির উপরে খানিকটা জায়গা লইয়া চুল পাত্‌লা হইয়া আসিয়াছে, কিছুদিনের মধ্যেই টাক পড়িবে বোধ হয়। মুখখানা গোলগাল—বেশ খানিকটা পরিতৃপ্ত আনন্দে যেন উদ্ভাসিত হইয়া আছে। তাসের সঙ্গী কোনো বন্ধু বান্ধবকে দেখিলেই সে পরিতৃপ্তিটা যেন বন্যার মত উচ্ছল হইয়া ওঠে, মাথার অপরিস্ফুট টাকটিও যেন আনন্দে জ্বল জ্বল করিতে থাকে।

ডাকিয়া বলেন, ওরে তামাক দে।

গড়গড়ায় করিয়া তামাক আসে। উগ্র মধুর গন্ধে ভরিয়া যায় ঘরটা। ফর্শীর নলটা আগন্তুকের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলরাম ময়লা বালিশটার তলা হইতে এক প্যাকেট তাস বাহির করেন। চটকদার তাস—উপরে অনাবৃতা বিদেশী নারীমূর্তি।

সজোরে তাস জোড়াকে ভাঁজিয়া বলরাম বলেন, আসুন, হয়ে যাক একবাজি। কি খেলবেন, ব্রীজ? ওঃ, আপনি তো আর ব্রীজ জানেন না, তা হলে ব্রে-ই হোক।

তিন বাজি ব্রে হইতে তিনবারই হয়তো তামাক আসিয়া যাইবে।

বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বিশেষ রকম আয়োজন হয়। যেদিন বেশি রাত্রে খেলাটা বেশ করিয়া জমিয়া যায়, সেদিন কবিরাজমশাই মদনানন্দ মোদকের কৌটাটি নামাইয়া আনেন। সে অমৃত এক এক দলা পেটে পড়িলে আর কাহাকেও কিছু

দেখিতে হয় না—এই চর ইস্‌মাইলকেও যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রলোক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কবিরাজের যে হাতযশ আছে সেটা মানিতেই হইবে।

এ হেন মানুষ বলরাম। এই পাণ্ডব-বর্জিত নদীর চরে তিনি একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন। রোগীর জন্য এমন উৎকণ্ঠার কিছু নাই। চরে যথেষ্ট জমি আছে, নোনা জলের পুকুর আছে, সুপারীর বাগান আছে, প্রায় পঞ্চাশটি মহিষ আছে—একরকম ছোটখাটো জমিদার বলিলেই চলে। সুতরাং কবিরাজীটা তাঁহার পেশা নয়—নেশাই বলিতে হয়।

নদীর ধার দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মণিমোহন ভিষক্‌রত্নের আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু অন্যদিনের মতো ভিষক্‌রত্নকে আজ বাহিরের ঘরে পাওয়া গেল না। ভিতর হইতে মাঝে মাঝে টুক্‌রো টুক্‌রো গলার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহাতে বোঝা গেল, কবিরাজ কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

মণিমোহন বিস্ময় বোধ করিল। কবিরাজ যে এখানে নারীসঙ্গহীন নিরাত্মীয় দিন কাটাইতেছে, এই কথাই সকলে জানে। সুদূর ফরিদপুর অঞ্চলে তাহার দেশ—আজ দশ বছর আগে বিপত্নীক হইয়াছে। সুতরাং কোথা হইতে আবার একটি স্ত্রীলোক জোটাইয়া আনিল সে?

ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়া মণিমোহন আশে-পাশে আরো কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিল। ওদিকে বারান্দায় তারের উপর দু'খানা শাড়ী শুকাইতেছে। অন্দর ও বাহিরের ঘরটির মাঝখানকার অবারিত দ্বারটির উপরে পর্দা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে একটা। তামাক-সরবরাহকারী সদাপ্রস্তুত ভৃত্য রাধানাথকেও দেখিতে পাওয়া গেল না—সম্ভবত তাহাকে কোনো কাজে পাঠানো হইয়াছে।

মণিমোহন একটা গলা খাঁকারি দিয়া ডাকিল, মণ্ডলমশাই!

ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলরাম বলিলেন, কে? বসুন, আসছি।

মণিমোহন ফরাসের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেওয়ালের গায়ে একটা ওয়াল-ক্লক অশ্রান্তভাবে টক্ টক্ করিতেছে, পেণ্ডুলামের উপরকার ফাটা-কাচের উপর এক খণ্ড কাগজ আঁটা—তাহাতে লেখা: "বুধবার"। অর্থাৎ, বুধবারে দম দিতে হইবে। তিন চারখানা ক্যালেণ্ডার—তাহাদের দুখানা গত বৎসরের। একখানা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ, কালের ছোঁয়াচ লাগিয়া প্রায় ফেড্ করিয়া আসিয়াছে। দু'খানা বড় বড় চীনা ছবি—কিছুদিন আগে সহর হইতে কিনিয়া আনা হইয়াছে। একখানা যুদ্ধের ছবি—ট্রেঞ্চ্‌ফাইটিং হইতেছে, এরোপ্লেন বোমা ফেলিতেছে,

ট্যাঙ্কগুলি পাহাড় বাহিয়া উঠিতেছে। আর একখানা আদিরসাশ্রিত—একটি মেয়ে বেশবাস অসম্বৃত করিয়া অশোভন-ভঙ্গিতে বসিয়া।

একটু দেরি করিয়াই কবিরাজ বাহিরে আসিলেন। সাধারণত, তাঁহার আতিথেয়তার পক্ষে ইহা ব্যতিক্রম। বন্ধু-বান্ধব আসিলে এত দেরী করিয়া তিনি কখনো তাহাদের অভ্যর্থনা করেন না।

বাহিরে আসিয়া কবিরাজ একগাল হাসিলেন।

—এই যে আপনি! কবে এলেন?

—কাল।

—বেশ, বেশ, ভালো ছিলেন তো? আজকাল আবার যে-রকম নোনার হিড়িক, প্রায়ই আমাশা-টামাশা হচ্ছে। পথে-ঘাটে ঘুরতে হয়, একটু সাবধান থাকবেন আর কি।

মণিমোহন মাথা নাড়িয়া বলিল, হুঁ। এবার ভাবছি আপনার কাছ থেকে কিছু ওষুধ-খুত্তর নিয়ে যাব।

—তা যাবেন। ভাস্কর-লবণ আর কৃষ্ণ-চতুর্মুখ, পেটের অবস্থা পরিষ্কার রাখতে ওর আর জুড়ি নেই—বুঝলেন না?

—বেশ তো, দেবেন ওষুধ দুটো।

কিন্তু ইহার ফাঁকে ফাঁকেই মণিমোহন লক্ষ্য করিতেছিল, কেমন যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ভিষকরত্ন। বন্ধু-বান্ধব আসিলে সাধারণত যে-ভাবে সে খুসি হইয়া উঠিত, আজ যেন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। যেন তাহার উপস্থিতিটা বলরামের কাছে তেমন প্রীতিকর ঠেকিতেছে না। আরো বিস্ময়ের সঙ্গে মণিমোহন দেখিল, ইহার মধ্যে বলরাম একবারও তামাক আনিতে আদেশ দিল না, অথবা তাকিয়ার তলা হইতে তাস জোড়া বাহির করিয়া একবারও বলিল না, হবে নাকি এক বাজি ব্রে! আসুন না।

প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত করিতে হইল মণিমোহনকেই।

—বাড়িতে কেউ এসেছে নাকি? কোনো আত্মীয়?

বলরাম খানিকটা হাসিলেন—তবে হাসিটা যেন একটু অপ্রতিভ ঠেকিল। বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ—অনেকটা তাই বই কি। হাত পুড়িয়ে আর রেঁধে খাওয়া যায় না, তাই গ্রামের একটি পরিচিত মেয়েকে নিয়ে এসেছি কিছুদিনের জন্যে—অন্তত দেখাশোনাটা তো করতে পারবে।

কোথা হইতে এক বোঝা পুঁই শাক আনিয়া রাধানাথ ঝুপ করিয়া ভিষকৃরত্বের সম্মুখে ফেলিল। ঘোষণা করিল, চিংড়ি মাছ পাওয়া গেল না বাবু।

পাওয়া গেল না? কেন পাওয়া গেল না শুনি? সকাল থেকে বারবার ক'রে বলছি, বাবুর আর বেরোতে সময়ই হয় না। চিংড়ি মাছ পাস নি তো ও জঙ্গলগুলো এনে হাজির করেছিস কী জন্য? দূর ক'রে টেনে ফেলে দে সব।

রাধানাথ কহিল, না পাওয়া গেলে কী করব বাবু? জেলেরাই পায় না, জল থেকে মাছগুলো কি আমার হাতে লাফিয়ে উঠে আসবে না কি?

—যা যা হয়েছে, আর তকরার করিস নি। এগুলো ভেতরে নিয়ে যা। এতটুকু উপকার নেই, তক্কের বেলায় চওড়া চওড়া কথা।

রাধানাথ বিড় বিড় করিতে করিতে শাকের বোঝাটা তুলিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণিমোহনের দিকে চোখ তুলিয়া বলরাম বলিলেন, দেখছেন তো ব্যাপারটা। মেয়েটা ভালোবাসে পুঁই চিংড়ি, কাল থেকে বলছি—তা আজ এসে বলছে মাছ পাওয়া গেল না। দূর ক'রে দেব হতভাগা অকর্মাকে।

মণিমোহন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বলিল, আচ্ছা, এখন উঠি কবিরাজমশাই।

কবিরাজ অসংকোচেই কহিলেন, আসুন, মাঝে মাঝে দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেবেন আর কি। তা ছাড়া কৃষ্ণ চতুর্মুখ আর ভাস্কর-লবণ—

—বিকেলে নিয়ে যাব'খন, বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

চলিতে চলিতে মণিমোহনের মনে বলরামের পরিবর্তনের কথাটা বিশেষ করিয়া বাজিতে লাগিল। এতদিন এই চরের নির্বাসনে বসিয়া যে নিঃসঙ্গ নিরাত্মীয় জীবন কবিরাজকে যাপন করিতে হইয়াছে, সে জীবনটাকে সে সামাজিকতা দিয়াই পূর্ণ করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। তাই তাম্রকূট বিতরণে তাহার কৃপণতা ছিল না, সুযোগ এবং সময় পাইলেই এক জোড়া তাস ভাঁজিয়া লইয়া খেলিতে বসিতে তাহার বাধে নাই। বাহিরের জগৎটাকেই সংসারে পরিবর্তিত করিয়া বেশ সুখী এবং পরিতৃপ্ত হইয়া ছিল সে।

কিন্তু সামাজিকতার একটা সীমা আছে মানুষের। প্রয়োজনের বাহিরে নিজেকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়া মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতে হয় তাহাকে। সেই মুহূর্তে নিজের বহুল প্রসারিত সত্তাটাকে তাহার সংকুচিত করিয়া আনিতে হয়, একটি কেন্দ্র-বিন্দুর চারিদিকে নিজেকে ঘন করিয়া সে আবদ্ধ রাখিতে চায়। বহুদিনের অতিরিক্ত আত্ম-প্রসারের ক্লান্তি তাই আজ নবাগতার সীমানাতে আসিয়াই বিশ্রাম খুঁজিতেছে। সেই কারণে মেয়েটির প্রতি তাঁর মনোযোগ যে একটু বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে বিস্ময়বোধ করিবার কিছু নাই।

আজ স্ত্রীর কথা খুব বেশি করিয়া তাহার মনে পড়িতেছে। ছয়মাস হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়া আছে—একবারও এমন একটু ছুটি পাইল না যে বাড়ি হইতে ঘুরিয়া আসে। তা ছাড়া একটু আগেই হরিদাসের কাছে যা শুনিয়াছে, তাহাতে আরো কিছুদিনের মধ্যেও যাওয়াটা ঘটিয়া উঠিবে কিনা অনুমান করা কঠিন।

চিঠি আসিতেছে না। বাড়িতে কি হইয়াছে কে জানে। এই দূর বিদেশে বসিয়া মনে উৎকণ্ঠা পোষণ ছাড়া কিছুই আর করিবার নাই। কয়েকটা টাকার জন্য এভাবে আত্মপীড়ন করার কোন অর্থ হয় না। আর একমাস দেখিয়া না হয় চাকরিই ছাড়িয়া দিবে সে। বি এস্-সি তো পাস করিয়াছে—কিছু না কিছু একটা জুটিয়া যাইবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু এই যে—সামনেই কাছারী। খাওয়া দাওয়া সারিয়া দুপুরের মধ্যে কাগজপত্র সব ঠিক করিয়া লইতে হইবে—না হইলে বিকালে রওনা হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। বসিয়া দুটি দিন বিশ্রাম করারও জো নাই—এ মাসের মধ্যে তাহাকে দশহাজার টাকার কলেক্‌শন দেখাইতে হইবেই।

মুরগী-চুরির ব্যাপারটা ডি-সুজা এত সহজেই ভুলিতে পারিতেছিল না। খাসা বড় মুরগীটা—অন্তত আড়াই সের মাংস যে হইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নধর পরিপূর্ণ শরীরে লালকালো পালকগুলি রোদ লাগিয়া যেন চিক চিক করিয়া দীপ্তি পাইত—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত ডি-সুজা। ধবধবে শাদা যে বড় মুরগীটা অন্যান্য মোরগদের একান্ত লোভের বস্তু ছিল, বিপুল বাহুবলে সেই সর্বজন-প্রিয়াকে সে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিল। নারী বীরভোগ্যা, তাহার গর্বিত আচরণে এ সত্যটা সব সময়ে প্রকাশ পাইত।

রুখিয়া যখন দাঁড়াইত—তখন একটা দেখিবার মতো বস্তু হইত সেটা। ময়ূর-কণ্ঠী রঙের দীর্ঘ লেজের গুচ্ছটি বিস্তৃত হইয়া জাপানী পাখার মতো ছড়াইয়া পড়িত—গলার পালকগুলি ফুলিয়া উঠিয়া বুকের সঙ্গে মিশিয়া যাইত, মাথায় চূড়ার লাল রঙ যেন আগুনের মতো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সকাল বেলায় যখন বাড়ির প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করিত, তখন কাহার সাধ্য ঘুমাইয়া থাকিবে! সে-তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকারে বাড়ি শুদ্ধ সবাই তো জাগিয়া উঠিতই—দু'মাইল দূর পর্যন্ত সে-শব্দ ভাসিয়া যাইত।

ডি-সুজা সুতরাং আক্ষেপ করিতেছিল।

লিসি বলিল, তোমার হ'ল কি ঠাকুর্দা? একটা মুরগীর শোকে কি আজ সারাদিন মুখ থুবড়ো ক'রে ব'সে থাকবে?

—একটা—একটা মুরগী! একে তুই এই ব'লে উড়িয়ে দিতে চাস? এ রকম মোরগ যে দশটার সমান। ক'জনের এমন মোরগ আছে খোঁজ ক'রে ছাখ্ দিকি। তা ছাড়া ক'দিন বাদে গঞ্জালেস্ আসবে, ভেবেছিলুম, তখন ওটাকে কাজে লাগাব তা আর—

রোষে অভিমানে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল ডি-সুজার।

লিসি কহিল, তাই বলে তুমি জোহানের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে কেন?

জ্বলিয়া উঠিল ডি-সুজা।

—জোহান! ওকে তুই বুঝি নিরীহ ভালো মানুষটি ভেবেছিস, তাই না? আমি ক'দিন থেকেই দেখেছি মোরগটার দিকে ও প্রায়ই আড়চোখে তাকায়। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

লিসি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ও মুরগীটার দিকে যে একবার তাকাত, তার ওপরেই তো তোমার সন্দেহ হ'ত ঠাকুর্দা! তার চেয়ে এ বরং ভালোই হয়েছে—এখন অন্তত রাত্রিতে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে।

ডি-সুজা বলিল, হয়েছে, থাম্ থাম্। আজকাল দেখছি, জোহান ছোঁড়াটার ওপর তোর মন ফিরেছে। খবর্দার বলছি, ওকে কক্ষনো আমার বাড়িতে ঢুকতে দিবি নে। ঢুকলে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেব—এই বলে রাখলুম।

মুহূর্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল লিসির মুখ। পর্তুগীজের মেয়ে—কিন্তু ভিতরে খানিকটা মগের রক্ত আছে বলিয়াই নাকটা একটু খর্বাকার এবং ভ্রূরেখা অপেক্ষাকৃত বিরল। সবটা মিলিয়া কেমন একটা অপরিচিত বৈশিষ্ট্য আছে সে মুখে। তাই সে রাগ করিলে কেন যেন ডি-সুজার মতো অসংযমী মানুষও ভয় পাইয়া যায়।

লিসি বড় বড় পা ফেলিয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল এবং ডি-সুজা খানিকক্ষণ রহিল একেবারে গুম্ হইয়া বসিয়া। বাস্তবিক, এ সত্যটা তাহার কাছে আর চাপা নাই যে লিসির আকর্ষণটা জোহানের দিকে ক্রমশই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। সময় অসময়ে জোহান এ বাড়িতে আসিয়া জাঁকাইয়া বসে, পান চিবায় এবং আরো কতটা যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ডি-সুজা অনুমান করিতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে বাহির হইতে সে যখন বাড়িতে আসে, হয়তো দেখে জোহান লিসির অত্যন্ত কাছে ঘেষিয়া বসিয়া অত্যন্ত বেশি পরিমাণে হাসিতেছে; দেখিয়া ডি-সুজার মনের শেষ প্রান্তটা অবধি জ্বলিয়া যায় যেন। তবু কিছু বলিবার জো নাই। জোহান ছোটবেলা হইতেই এ বাড়িতে আসে যায়, লিসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে। তা ছাড়া লিসির চ্যাপ্টা নাক এবং বিরল ভ্রূর উপর দিয়া যখন ক্রোধের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়ে, তখন ডি-সুজা কেন যেন অত্যন্ত অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত বোধ করিতে থাকে।

তবু নিতান্ত মনের জ্বালাতেই সে লিসির মুখের উপর এতবড় কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে। একেই তো মুরগীটা খোয়া যাইবার ফলে ক্ষোভে দুঃখে তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার উপর জোহানের প্রতি লিসির এই পক্ষপাতের মতো অসহ্য ব্যাপার আর কিছু নাই। পাত্র হিসাবে জোহান নিতান্ত অযোগ্য নয়, কিন্তু দিনের পর দিন যে সে অধিকার বিস্তার করিয়া ডি-সুজার মন হইতে লিসিকে ছিনাইয়া লইতেছে এ অপরাধ ক্ষমা করিবার নয়। বিশেষ করিয়া মুরগী চুরীর সন্দেহটা সেই জন্যই জোহানের উপর তাহার বেশী করিয়া পড়িয়াছে।

বাহিরের দরজায় কয়েকটা ঘা পড়িল।

ডি-সুজা বলিল, কে?

দরজার পথে একজন বর্মি মূর্তি দেখা দিল। ইহাদের বড় নৌকাটাই আজ সকালে আসিয়া ভিড়িয়াছে। ডি-সুজা সুপারীর কারবার করে, তাই সুপারীর সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাইবার জন্যই সে এখানে আসিয়াছে বোধ হয়।

চকিত হইয়া ডি-সুজা বলিল, তোমরা কখন এলে?

বর্মিটি হাসিল। পালিশ করা তামার উপর চিত্রকরা মুখ, সে মুখে এতটুকু ভাবের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করা যায় না। মনের অসংখ্য ওঠা-পড়া তাহার বাহিরের অবয়বে আসিয়া যেন একটি রেখাও আঁকিয়া দিতে পারে নাই। পাথরের একটা প্রতিমূর্তির উপর যেন একটুকরা যান্ত্রিক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সে বলিল, কাল সকালে।

ডি-সুজা চারিদিকে একবার তাকাইল। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়া বাহিরের কবাটটায় শক্ত করিয়া খিল আঁটিয়া দিয়া বলিল, ভিতরে এসো।

দুইজনে ঘরে ঢুকিল। অত্যন্ত সাবধানে ডি-সুজা ঘরের সমস্ত দরজা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল, আধা-অন্ধকারে ভরিয়া গেল ঘরটা। শুধু এককোণে স্তূপাকার রাশীকৃত রসুন হইতে উগ্র খানিকটা গন্ধ উঠিয়া নিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কেরোসিনের একটা ছোট ডিবা আনিয়া জ্বালিল ডি-সুজা। ঘরময় একটা বিচিত্র নীলাভ আলো ছড়াইয়া পড়িল এবং তাহার আভাতে বর্মির ঘষা তামায় তৈরী মুখখানাকে অস্বাভাবিক রকম নৃশংস দেখাইতে লাগিল।

গলা নীচু করিয়া ডি-সুজা কহিল, তারপর, কী খবর?

বর্মিটি পেটের দিকে হাত চালাইয়া রেশমি লুঙ্গির মধ্য হইতে ভাঁজ করা একখানা চিঠি বাহির করিয়া ডি-সুজার হাতে দিল।

চিঠিটা পড়িয়া ডি-সুজা সেটাকে ডিবার শিখার মুখে ধরিল। দেখিতে দেখিতে

পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল সেখানা। ছাইগুলিকে জুতা দিয়া বেশ করিয়া মাড়াইয়া ডি-সুজা কহিল, দশ সের ?

বর্মিটি বলিল, হাঁ।

ফুঁ দিয়া বাতিটা নিভাইয়া দিয়া ডি-সুজা বলিল, এবার আশে পাশের অবস্থা গরম। একটু সাবধান হয়ে চালাতে হবে। শুনেছি, গোলমাল হবার আশঙ্কা আছে।

বর্মিটি হাসিল। আধা-অন্ধকারে সে অনুভূতি-বর্জিত মুখখানা দেখা গেল না—কেবল সামনের সোনা বাঁধানো দাঁতটা যেন একবার ঝিলিক দিয়া গেল।

বলিল, হুঁ, সে ভয় খুব আছে। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে যে পুলিশ আসবে, এ প্রায় ধরে নেওয়া যায়। তবে আর দু'মাস মাত্র সময়—এর ভেতরে যদি না আসে তো সাত আট মাসের মধ্যে এ তল্লাটে আর ভিড়বে না।

ডি-সুজা কিন্তু বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

—কিছুদিনের মধ্যেই এখানে পুলিশ আসবে? তা হলে তো এখন থেকেই হুঁসিয়ার থাকতে হয়।

—তা বই কি। সেই জন্যেই এটা রেখে দাও। দরকার মতো কাজে লাগাতে হবে। অন্ধকারের মধ্যেই এবার সে যাহা বাহির করিয়া আনিল, অস্পষ্টভাবে সেটাকে দেখিয়াই ডি-সুজা চমকিয়া উঠিল। হিমশীতল তাহার স্পর্শ—অন্ধকারে সাদা ছোট নলটি চিক চিক করিতেছিল।

—হাঁ ভরাই আছে। একটু সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো, ছটা ঘরের একটাও খরচ হয় নি। ধরা যদি পড়তেই হয়, তা হলে খালি খালি ধরা দেওয়াটা কোনো কাজের কথা হয়। দু'একজনকে মেরে—তবে তো।

তাহার নীরব হাসিটা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিল। সংক্ষিপ্ত চাপা হাসি—কিন্তু মুখের কথার মতোই তাহা নিষ্ঠুর এবং অর্থপূর্ণ।

বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল ডি-সুজার। তবু হাত বাড়াইয়া সে অস্ত্রটা লইল, বলিল, আচ্ছা তাই হবে।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তা হলে আমি চলি।

তখন সন্ধ্যা বেশ ঘন হইয়া আসিতেছে। বাহিরে উঠানের উপরে একরাশ সুপারী ও নারিকেলের ছায়া নত হইয়া পড়িয়াছে—স্বাভাবিক অপেক্ষা আরো এক পোচ গভীর অন্ধকার। দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হওয়া মাত্র মনে হইল দরজার দিক হইতে কেউ যেন চট্ করিয়া সরিয়া গেল।

দুইজনেই দাঁড়াইল থম্‌কিয়া। নক্ষত্রবেগে দক্ষিণ হাতটাকে কোমরের কাছে লইয়া গিয়া বর্মিটি কঠিনস্বরে বলিল, কে গেল ?

দ্রুত গতিতে সাম্‌নে আগাইয়া গেল ডি-সুজা। সদর দরজাটা হাট করিয়া খোলা, বাহিরে হাল্‌কা অন্ধকারের বিস্তৃতি। তাহার মধ্যে কাহারও আভাস পাওয়া গেল না।

রান্নাঘরের মধ্য হইতে মাংস ভাজার গন্ধ আসিতেছে।

ডি-সুজা ডাকিল, লিসি!

একটা ঝাঁজরী হাতে করিয়া লিসি বাহির হইয়া আসিল, বলিল, ডাকছ?

—বাড়িতে কেউ এসেছিল?

—না তো।

—সদর দরজা কে খুলে রেখেছে?

লিসি অবিক্রিত স্বরে বলিল, আমি। কেন কী হয়েছে? তাহার জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি বারান্দার লণ্ঠনটার অপরিচ্ছন্ন আলোয় নবাগতের মুখের উপর ঘুরিতেছিল।

ডি-সুজা চাপা গলায় বলিল, না, কিছু হয় নি।

বর্মিটির পাথরের মতো ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ দৃষ্টিটা একবারের জন্য লিসির সঙ্গে মিলিল মাত্র। মনের অজ্ঞাত প্রান্ত হইতে একটা ভয়ের আকস্মিক চমক উঠিয়া লিসির সর্বাঙ্গে যেন শির্ শির্ করিয়া ছড়াইয়া গেল। মনে হইল, মুহূর্তের দৃষ্টিটাকেই একটা সন্ধানী আলোর মতো ফেলিয়া এই লোকটা তাহার ভিতরের অনেকখানিই দেখিয়া লইয়াছে।

বাহির হইয়া যাওয়ার সময় সে আর একবার ডি-সুজার কানের কাছে বলিয়া গেল, সাবধান থেকো, খুব সাবধান।

ডি-সুজার হাতের মধ্যে রিভলভারের কুঁদটা পাথরের মতো ভারী আর শীতল হইয়া উঠিতেছে। তাহার কপালে জমিয়াছে দুইটা বড় বড় ঘামের বিন্দু।

৩

পোস্টমাস্টার হরিদাস সাহাকেও এখানে সঙ্গীহীন জীবন কাটাইতে হয়।

তাই বলিয়া তিনি বিপত্নীক নন। রণচণ্ডী একটি স্ত্রী আছেন, আর আছে কাকের মত কালো, বকের মত শীর্ণ একপাল ছেলেমেয়ে। পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তাহারা যে চতুর্দশ পুরুষকে নরকস্থ করিতেই জন্মিয়াছে, ইহাতে পোস্টমাস্টারের কোন সন্দেহ নাই। ঢাকা শহরে মামার বাড়িতে তাহারা আছে এবং সম্ভবত কুশলেই আছে বলিয়া হরিদাস অনুমান করেন। রাগের মাথায় কুরূপা স্ত্রীর

গায়ে একদিন হাত তুলিয়াছিলেন বলিয়া ছেলেপিলে লইয়া স্ত্রী জন্মের মতো বাপের বাড়ি গিয়া উঠিয়াছেন। শ্বশুর ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি, ঢাকায় আর নারায়ণগঞ্জে তাঁহার মস্ত কারবার। তিনি নাকি গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন, হরিদাস তাঁহার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসিলেও তিনি হাড় মাংস একত্র রাখিবেন না।

শুনিয়া হরিদাস খুশিই হইয়াছিলেন। রাজসাহীতে থাকিবার সময়ে শনিগ্রহরূপী শয়তান পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মৃত্যু সংবাদেও তিনি এতটা খুশি হইয়া ওঠেন নাই। শ্বশুরবাড়ির ত্রিসীমানার কাছে আগানো তো দূরের কথা, তাহারা তাঁহার ছায়া না মাড়াইলেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সখের খাতিরে একদা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সখের সেই নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইয়া হরিদাস সাহা বহুকাল পরে ভগবানকে একটা নমস্কার করিয়া বসিলেন।

তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে। বিশ্বাস না থাকুক আরোগ্যের আশ্বাসে হাতে গলায় একরাশ মাহুলি ঝুলাইয়াছেন হরিদাস; কিন্তু চর ইস্‌মাইলের এই অনাত্মীয় প্রবাস-জীবনের কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় যখন সমস্ত মাহুলি আর তাবিজের অনুশাসনকে অস্বীকার করিয়া হাঁপানীর টান উঠিয়া আসে তখন হয়তো মাঝে মাঝে কুরূপা তীক্ষ্ণকণ্ঠী স্ত্রীর স্মৃতি সমস্ত বিতৃষ্ণার স্তূপ ভেদ করিয়া ঠেলিয়া ওঠে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া যখন মুমূর্ষু কাত্‌লা মাছের মতো হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে বাতাসের যোগাযোগ রাখিতে হয়, যখন রহিয়া রহিয়া কেবল এই কথাটাই মনে পড়ে যে মৃত্যুর রূপটা ইহার চাইতে অনেক বাঞ্ছনীয়, তখন চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভাসিয়া ওঠে স্ত্রীর মুখখানা। এখন কেউ একবার বুকের উপরে একখানা কোমল হাত বুলাইয়া দিলে যন্ত্রণার অনেকখানি লাঘব হইত হয়তো।

এপাশ ওপাশ করিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকেন, কেরামদ্দি?

পিয়ন কেরামদ্দি এ সময়টায় প্রায়ই তাঁহার পাশে আসিয়া বসে। পোস্টাপিসেরই এক পাশে সে-ও থাকে। এখানে তাহার বাড়ি নয়—বদ্‌লি হইয়া আসিয়াছে। দুইজনেই বৈদেশিক বলিয়া পোস্টমাস্টারের প্রতি কেমন একটা সস্নেহ সহানুভূতি আছে কেরামদ্দির।

জবাব দেয়, কী বলছেন?

—এ কষ্ট আর তো সয় না। বাড়ির ওদের আনাতেই হয়—না?

কেরামদ্দি তাঁহাকে চিনিয়াছে। তাই মনে মনে এতটুকুও উৎসাহিত বোধ করে না; কিন্তু প্রকাশ্যে সমর্থন করিয়া বলে, আজ্ঞে আনাই তো উচিত।

—শ্বশুরমশাই, গুরুজন। দুটো মন্দ যদি বলেই থাকেন, সেটা ঘাড় পেতে নেওয়াই সঙ্গত। তাঁহার কাছে ক্ষমা চাইলে লজ্জার কিছু নেই।

—আজ্ঞে তা তো নেই-ই।

পোস্টমাস্টার শ্বাস টানিতে টানিতে বলেন, তা হলে কালই একখানা দরখাস্ত দিয়ে দেব, কেমন? এক মাসের ছুটি, এর কমে দেশে গিয়ে ওদের আর নিয়ে আসা যায় না।

—আজ্ঞে, তা যায় না।

হরিদাসের কণ্ঠস্বর এবারে সন্দিগ্ধ ও বেদনার্ত হইয়া ওঠে।

—কিন্তু যদি ছুটি না দেয়?

কেরামদ্দি আশ্বাস দিয়া বলে, আজ্ঞে তা দেবে না কেন?

উত্তেজিত হইয়া ওঠেন হরিদাস। বুকের উপর হাত চাপিয়া তিনি প্রায় উঠিয়া বসেন: না-ও দিতে পারে—বিশ্বাস নেই ব্যাটাদের। মানুষ মরুক কিংবা বাঁচুক, তাতে ওদের কোনো নজর আছে নাকি? যেমন করে পারে খাটিয়ে নিলেই যেন হল।

উত্তেজনা বাড়িতে থাকে হরিদাসের। চোখ দুইটা বড় বড় হইয়া ওঠে—গলার আওয়াজটা পুরোপুরি বসিয়া যায়। শ্বাসের টানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাস্ ফ্যাস্ করিয়া বলিতে থাকেন. না দেয় ছুটি না দিলে! রিজাইন দেব এমন চাকরিতে। ঘরে কি খাওয়ার ভাবনা আছে যে জান প্রাণ দিয়ে এখানে পড়ে থাকব? ছুটি না পেলে আমি চাকরীতে রিজাইন্ দেব—নিশ্চয় দেব, এ আমি তোমাকে বলে রাখলাম।

কেরামদ্দি ব্যস্ত হইয়া ওঠে। একপাশে টি-পয়ের উপর হইতে মালিশের ওষুধটা লইয়া সে হরিদাসের বুকে ডলিতে থাকে। শান্তস্বরে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্যে ব্যস্ত হবেন না বাবু। যা দরকার তা করা যাবে কাল সকালে।

কিন্তু পরের দিন সকালে উঠিয়া এ সব কথা আর হরিদাসের স্মরণ থাকে না।

বিস্মৃতিই বলিতে হইবে এক রকম। হাঁপানির অসহ্য কষ্টের সময় মুখ দিয়া অবচেতনার যে কথাগুলি বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেগুলিকে অসুস্থতার প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। দিনের উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত রকমের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আসিয়া যেন অভিভূত করিয়া ফেলে হরিদাসকে। নিশীথের গৃহপ্রবণ পীড়াতুর মনটি দিবালোকের সংস্রবে আসিয়া বিদ্রোহী এবং যাযাবর হইয়া ওঠে। হরিদাসকে তখন সিনিক্ বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

কেরামদ্দি মাঝে মাঝে মনে করাইয়া দেয়।

—ছুটির দরখাস্ত করবেন নাকি বাবু?

সশব্দে হাসিয়া ওঠেন হরিদাস। হাসিতে কৌতুক এবং শ্লেষ মিশানো।

—ছুটি! ছুটি কিসের জন্যে? তুমি কি ভাবছ, ওই কাল্‌-প্যাঁচাদের ভাবনায় রাত্তিরে আমার ঘুম হচ্ছে না? বাপ—যে করে ওগুলোর হাত এড়িয়েছি, আমিই জানি।

—ছেলেপিলের মুখ একবারও দেখতে ইচ্ছে করে না বাবু?

আর একবার সশব্দ উচ্চ হাসিতে প্রশ্নটাকে উড়াইয়া দেন হরিদাস। মুখের সামনে হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া তিনি চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ ধূমপান করেন। তারপর বলেন, কখনো পাহাড় অঞ্চলে বেড়িয়েছ কেরামদ্দি?

—আজ্ঞে না।

—আমি বেড়িয়েছি। সুসঙ্গের পাহাড়ে—যেখানে হাতী ধরে। সে কী জঙ্গল আর কী দুর্গম! একটুর জন্যে বাঘের মুখে পড়ি নি সেবারে।

হুঁকা হইতে কল্‌কেটা নামাইয়া লয় কেরামদ্দি। পোস্টমাস্টারের চোখ-মুখ ধারালো হইয়া ওঠে। কালো মুখের উপর দিয়া একটা ইঙ্গিতপূর্ণ গাম্ভীর্য ঘনাইয়া আসে—সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া একটা প্রত্যাসন্ন গল্পের সংকেত। লোকটা সর্বাঙ্গ দিয়া গল্প বলিতে জানে।

—দু'দিকে দশ বারো হাত উঁচু পাহাড়, মাঝখান দিয়ে হাত তিন চারেক চওড়া একটুখানি জংলা পথ। পাহাড়ে শ্যাওলা আর নানারকম আগাছায় বুক সমান জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে চলেছি, হঠাৎ নাকে এল বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ। বাঘের গায়ের গন্ধ—একবার যে শুঁকেছে, সেই টের পায়। থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলুম। তারপর তাকিয়ে দেখি—

কেরামদ্দি কল্‌কেটা নামাইয়া রাখে। সাগ্রহ কৌতুহলে বলে, তারপর?

* * * * *

এমনি করিয়া দিন যায় হরিদাসের। স্তূপাকার অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি বিরাজ করিতেছেন—ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই সুযোগ ও সুবিধামতো তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। কত নতুন প্রকৃতির মানুষ, কত বিচিত্র রকমের রীতি-নীতি। নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, ছোট বড়ো অসংখ্য বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি করিতে হইয়াছে। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে একটা নিজস্ব চিন্তাধারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার।

এই নিজস্ব দর্শন-রীতিটি, ইহা হরিদাসকে জগৎ সম্বন্ধে একরকম অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে বলিলেই চলে।

বলরাম ভিষকরত্নের তাসের আড্ডায় বসিয়া মাঝে মাঝে হয়তো বলেন নাঃ মশাই, কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়।

শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করে, কিসের কথা বলছেন ?

—এই তাসটাস সব। একদিন সব কিছুই হাওয়ায় উড়ে যাবে মশাই—একেবারে ফাঁকা। ওই যে শাস্ত্রে বলছে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যে—ওইটেই একমাত্র খাঁটি কথা।

মদনানন্দ মোদকের আমেজে বলরাম ভিষক্‌রত্ন অতিরিক্ত প্রফুল্ল হইয়া ওঠেন।

—বলি মাস্টারের যে অতিরিক্ত বৈরাগ্য দেখছি। একেবারে সাক্ষাৎ হরিদাস স্বামী—অ্যাঁ!

কঠিনমুখে হরিদাস বলেন, বৈরাগ্য নয়। নর্থ বিহার ভূমিকম্পের সময় আমি জামালপুরে ছিলুম তো। সব অবস্থাটাই নিজের চোখে দেখেছি দাদা। বেশ গড়ে উঠেছিল—হঠাৎ একটা যেন হাতুড়ির ঘা খেয়ে ভেঙে চুরে ছত্রাকার হয়ে পড়ল। তাই মনে হয়, সমস্ত দুনিয়াটাই একদিন এরকম হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে—ধরে রাখবার এত যে চেষ্টা এদের কোনোটাতেই কিছু হবার নয়।

মদনানন্দ মোদকের নেশার দুইটা দিকই আছে সম্ভবত। বলরাম হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া যান। বলেন, যা বলেছ ভাই! ভগবানের মার দুনিয়ার বার—ও ঠেকাবার জো নেই।

হরিদাস যেন বিরক্ত বোধ করেন।

—দৌলতখাঁয় যেবার বান হয়েছিল, জানো সে কথা?

—জানি নে আবার! ওদিকটাকে ত একরকম মুছে নিয়েছিল বললেই চলে। আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই সে বানে মারা যায়—ওঃ, সে কী কাণ্ড!

—মনে করো, আবার যদি তেমন কিছু একটা হয়!

—বলরাম সভয়ে বলেন, বাপ রে!

হরিদাস হাসিয়া বলেন, মন্দ হয় না তা হলে। যদি বেঁচে থাকি তা হলে বেশ নতুন রকমের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে, কী বলো বলরাম?

—সর্বনাশ! অমন অভিজ্ঞতা দিয়ে দরকার নেই—বেশ সুখেই আছি মশাই। চরের জমিভরা ধান, সুপুরীর খন্দ—এমন সময় অমন কু-ডাক ডাকতে আছে! তার ওপর আসছে চৈত্র মাস—ও সব কথা ব'লে ভয় পাইয়ে দিয়ো না দাদা।

হরিদাসের মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই থাকে।

—ভয় পাও কেন অমন? স্ত্রী পুত্র তো কেউ নেই তোমার। একদিন যখন মরতেই হবে, একটা কিছু বিরাট্ ব্যাপারের মাঝখানে ঘটা করে মরাই ভালো নয়? মনে করো, এখানে লাগল এসিয়াটিক কলেরার মড়ক, আরও দশজনের সঙ্গে তুমিও শেষ হয়ে গেলে, তখন কে ভোগ করবে তোমার এই ক্ষেতভরা ধান আর গোলাভরা সুপুরী!

—হয়েছে, হয়েছে, থামো—রীতিমতো আতংকিত হইয়া ওঠেন বলরাম: এই সাত সকালে কী সব আরম্ভ করে দিলে? এসো, এসো এক বাজি ব্রে হয়ে যাক্—

তাসজোড়া ময়লা তাকিয়ার তলা হইতে বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু পৃথিবীটা এমন জায়গা যে সম্পর্ক না থাকিলেও এখানে নতুন করিয়া গড়িয়া নিতে কষ্ট হয় না।

অন্তত বলরামের হইল না। একা দিনগুলি কাটিতেছিল। রাধানাথ যা হোক করিয়া রাঁধিয়া নামাইত, রান্নার স্বাদগন্ধ যাই থাক দুধ ঘি এবং মাছের প্রাচুর্যে সেটা এমন মর্মান্তিক বোধ হইত না। কিন্তু "ভূমৈব সুখম্"—অতএব কোথা হইতে একটি মেয়ে আসিয়া জুটিয়া গেল।

দেখা গেল, বলরামের পৃথিবীটা হঠাৎ বিচিত্র রকমে বদলাইয়া গেছে।

তাসের পাটটা তুলিয়া দিতে পারিলেই বলরাম যেন শান্তি পান একরকম। তবে বহুদিনের অভ্যাস, একেবারে চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিলে ধাতে সহিবে না বলিয়াই মোটামুটি আঁকড়াইয়া আছেন এখনো কিন্তু ব্রীজের জোরালো ডাকের মুখেও একান্ত মনোযোগটা অন্তঃপুরের দিকে উৎকর্ণ হইয়া যায়। মাঝে মাঝে খেলার সময় তিনি এমন এক একটা ভুল করিয়া বসেন যে তাঁহার পার্টনার চটিয়া-মটিয়া আগুন হইয়া ওঠে।

তা—দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার প্রতি এতখানি মনোযোগ—আপাত-দৃষ্টিতে এটাকে একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে। কিন্তু ভালোবাসিবার ক্ষমতাটা তো আর সকলের সমান নয়। মানুষের চরিত্রগত তারতম্য বিচার করিয়াই ভালোবাসার পাত্রাপাত্র ও পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। যে বলরাম এতখানি বন্ধুবৎসল, যে তামাক এবং মোদক ব্যয়ের দিকে তাঁহাকে একেবারে অকুণ্ঠ বলিলেই হয়, তিনি যে আত্মীয়াকে একটু অতিরিক্তই ভালোবাসিবেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আত্মীয়াটির নাম মুক্তকেশী—সংক্ষেপে মুক্তো।

বয়স বাইশ তেইশ হইবে। আঁটো-সাঁটো গড়ন, কপালটা অতিরিক্ত চওড়া। কিন্তু প্রশস্ত কপালটির সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে অশোভন রকমের বড় একটা মেটে সিঁদুরের ফোঁটায়। গ্রামের মেয়ে হইলেও সে পাতা পাড়িয়া সিঁথি কাটে, পুরু ঠোঁট দু'খানি পানের রঙে সর্বদাই রাঙা হইয়া আছে।

সুন্দরী বলিলে যা বোঝায়—মুক্তো ঠিক তা নয়। তবু মুক্তোর শ্রী আছে। বিবাহ হইয়াছে ছোটবেলায়, কিন্তু বিবাহিত জীবনের কোনো ছাপ পড়ে নাই তাহার শরীরে; দেখিলে এখনো কুমারী বলিয়াই মনে হয় তাহাকে। চোদ্দ বৎসর বয়সে

গুড়ের মহাজন নবদ্বীপ সরকারের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সে স্বামীসেবা করিয়াছে। বিচিত্র ইহাই যে এই পরম নিষ্ঠার কোনো পুরস্কারই সে পায় নাই। পুরা ছয়টি বৎসর আসিল গেল, কিন্তু সরকার কুলধ্বজ কোনও বংশধর আসিয়া তাহার কোল উজ্জ্বল করিয়া বসিল না। শিকড় বাকড়, কালীর দুয়ারে ইঁট বাঁধা, এমন কি পঞ্জিকার পেটেন্ট ওষুধ, কিছুই কাজে আসিল না। সুতরাং পুত্রপিণ্ডলোভী নবদ্বীপ আর একবার হাতে মাকু লইয়া ছাঁদনাতলায় ভ্যাঁ করিতে গেল এবং সেই অবকাশে পিতা রাখোহরি সরকার একখানা গোরুর গাড়ি ডাকিয়া পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লিসহ মুক্তোকে তাহাতে চাপাইয়া দিল।

তারপর দুইটা বৎসর কাটিল বাপের বাড়িতেই।

কিন্তু পাড়ার দশটা বখাটে ছোক্‌রার অনুগ্রহদৃষ্টি এমনভাবে তাহাকে দিনরাত তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল যে, সে অস্থির হইয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইল। তাহার দায়িত্ব নিতে রাজী হইলেন বলরাম ভিষক্‌রত্ন স্বয়ং—চর ইস্‌মাইলের সভ্যতা-বিবর্জিত দুর্গম দুর্গে বসিয়া পৃথিবীর ফেনাইয়া-ওঠা কলরব ভুলিয়া থাকা যাঁহার পক্ষে সব চাইতে সহজ। শুধু ভার লওয়াই নয়—মুক্তোর প্রতি বলরামের স্নেহটা উদগ্র হইয়া উঠিল।

মিশিবার মতো লোক এখানে নাই। ভদ্রলোক যাহারা আছে তাহারা পত্নীসঙ্গহীন প্রবাস জীবন যাপন করে। অবশ্য তাই বলিয়া নারীসঙ্গহীন নয়। তিন শতাব্দী আগে পর্তুগীজদের সঙ্গে যে আরাকানীর দল এখানে আসিয়াছিল, বাংলা দেশের মাটির স্যাঁৎসেঁতে স্পর্শ লাগিয়া বংশক্রমে নোনা ধরিয়াছে তাহাদের। সামান্য কিছু ব্যয় করিলে তাহাদের মধ্য হইতে নৈশ-সঙ্গিনী সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

কিন্তু তাহাদের সহিত বনাইয়া লওয়া সম্ভব হইয়া ওঠে না। মুক্তোর দিন একাই কাটে একরকম। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া সে দড়ি পাকাইয়া শিকা তৈয়ারী করে, মনে মনে ভাবে সরঞ্জাম পাইলে ছোট ফাঁসের একখানা খেপ্‌লা জালও সে আরম্ভ করিয়া দিতে পারে।

অবসরও অবশ্য খুব বেশি সে পায় না। বলরামের জীবন-যাত্রার যেন বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া চলিতেছে একটা। বাহিরের জগৎকে এক সময় খুব বেশি প্রশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় আজ সে জগৎটার উপরে প্রতিশোধ লওয়া চলিতেছে। ওজন করিয়া ধানের বস্তা বড় বড় নৌকায় চাপাইয়া, সুপারীর দাদন লইয়া দর কষাকষি, ইহার ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ পাইলেই বলরাম আসিয়া মুক্তোর আঁচলে মাথা গুঁজিতে চান। প্রথম প্রথম মুক্তো খুশি হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল

একটু একটু করিয়া সন্দেহ আসিতেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, শুধু আঁচলের আশ্রয় পাইলেই হয়তো বলরাম খুশি হইবেন।

বাহিরে বন্ধুরা আজো আসিয়া জড়ো হয়, কিন্তু তামাক সরবরাহে রাধানাথের আজকাল উদাসীনতা দেখা গিয়াছে। গির্দা বালিশটার তলায় রাখা তাসজোড়াকে সব সময় জায়গা-মতো পাওয়া যায় না; আবার যখন যায়, তখন এদিকে ওদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া বায়ান্নখানার হদিশ মিলাইতে হয়।

সবচেয়ে বেশি করিয়া যিনি ব্যাপারটা উপভোগ করেন, তিনি হরিদাস।

হরিদাসের হাসির ভঙ্গিটা মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়া ওঠে। হাঁপানির টানের মতো সে হাসিটা বিচিত্রভাবে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। সরু গলা হইতে জিল্‌জিলে বুকখানার উপর ঝুলানো হাঁপানির চৌকোণা মাদুলিটা তাহারি সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া ওঠে, বয়োজীর্ণ কপালের ও গালের কতকগুলি বিশৃঙ্খল রেখা নানা আকারে যেন হাসির স্বরূপটা ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।

দেখিয়া, বলরামের সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া ওঠে।

হাসি থামিলে হরিদাস বলেন, বুড়ো বয়সে বুঝি রং লাগছে কবিরাজের?

বলরাম লজ্জিত হন; কিন্তু বর্ণদোষে মুখের উপর লজ্জার রক্তিম আভা না পড়িয়া কালো রংটির উপর যেন বার্নিশ লাগাইয়া দেয়। বলেন, যাঃ, কী বলছ।

হরিদাস অকস্মাৎ চোখ দুটি ছোট করিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে বলরামের সর্বাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে। ঘরে আর লোকজন না দেখিলে হঠাৎ তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়েন: বলি, সত্যি সত্যিই গ্রামের মেয়ে তো? সম্পর্কের মধ্যে ভেজাল নেই তো কোনোরকম?

বলরাম চমকিয়া বলেন, তার মানে?

হরিদাসের হাসি অশ্লীল হইয়া ওঠে। তারপর কানের কাছে মুখ লইয়া চাপা স্বরে কী যেন বলেন কবিরাজকে।

বলরামের চোখে মুখে স্পষ্ট কাতরতার ছাপ পড়ে।

—কী সব আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছ? তোমার মুখে কি কিছুই আটকায়না না কি? ছি—ছি—ছি—

ছি-ছি-র মাত্রাধিক্যে হরিদাস চুপ করিয়া যান। তবু মনে হয় ধিক্কারের মাত্রাটা যেন একটু অসমপরিমাণে অধিক। নিজের প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাটাকে অস্বীকার করিবার জন্যই যেন বলরাম এত বেশী পরিমাণে সশব্দ হইয়া ওঠেন; কিন্তু বুঝিতে পারিয়াও হরিদাস কিছুই বলেন না। প্রকৃতির আকস্মিক অসীম স্বতন্ত্রতার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম সামাজিকতার বন্ধনই এখানে ঢিলা হইয়া গিয়াছে। অনুকূল পৃথিবী ও

সমাজের সত্যিকার মাপকাঠি যেখানে প্রচুর আছে, চরিত্রহীনতার নিন্দা সেখানেই সম্ভব; কিন্তু স্থানকালপাত্র বিচারে সমাজের সাজাটাই এখানে বদলাইয়া গিয়াছে। মগ কিংবা আরাকানী অথবা পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি মেয়েদের সঙ্গিনী সঙ্গিটাই এমন কিছু বিবাহ করা চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের কোনো নির্দিষ্ট পরিধি যেখানে নাই, সেখানে মুক্তো বলরামের স্বামবাসিনী অথবা আর কিছু হয়ে লইয়া আলোচনা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।

*　　　*　　　*　　　*

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"বৃহস্পতিবার। শেষ রাত্রিতে বোট ছাড়িয়াছে। বুকের নীচে বালিশ দিয়া বাহিরে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি—সমস্ত পৃথিবীটাকেই চিত্রিত বলিয়া মনে হইতেছে।

অন্ধকারের গাঢ় রংটা ক্রমশ ফিকা নীল হইয়া আসিতেছে। আকাশটার চেহারা দেখিতে দেখিতে কী বিচিত্র ভাবেই বদলাইয়া গেল—যেন প্রকাণ্ড একখানা কার্বন পেপারকে কে উল্টাইয়া ধরিল। তারাগুলির রঙ লাল হইয়া গেছে, একটু পরেই ঘষা কাচের মতো ঘোলাটে হইয়া যাইবে। এই মুহূর্তে শুকতারার একটা তির্যক আলোর রশ্মি অদ্ভুতভাবে আমার চোখমুখে আসিয়া পড়িতেছে।

নিজেকে যেন চিনিতে পারিতেছি না। পিছনের হালের গোড়া হইতে ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিয়া গোঙানির মতো কাতর শব্দ উঠিতেছে, পালে বাতাস আর ভাঁটার টান পাইয়া বোট আগাইয়া চলিতেছে তর তর করিয়া। মাঝে মাঝে ভাসিয়া চলা কচুরির ঝাঁক হইতে পরিচিত এক ধরনের গন্ধ পচিয়া বাতাসে নাকে আসিয়া লাগিতেছে। মনে হইতেছে, আমার ভিতর হইতে কে আর একজন বাহির হইয়া আসিয়া এই জল-স্থল-নদী আর আকাশকে অদ্ভুত করিতেছে—একদিন সে আমার মনে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, তবু কোনো সুযোগে আমি তাহার পরিচয় পাই নাই।

পৃথিবীকে আমরা কতটুকু জানি! আদিমতম যুগে আমাদের যে বর্বর পূর্বপুরুষেরা গুহা-গহ্বরে বাস করিত, পাথরের অস্ত্র ঘষিয়া হিংস্র জন্তু বধ করিত, প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য হইতে শুকনা ডাল-পালা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইত, আর সেই চকমকির আগুনে পশুর মাংস আধপোড়া করিয়া ক্ষুধা মিটাইত—তাহারাই তো পৃথিবীকে জয় করিবার সাধনা শুরু করিয়াছে।

তারপরে কতযুগ পার হইয়া গেল। সেই বর্বর মানুষদের মধ্যে বাহুবলে যে বড় হইল, সে হইয়া দাঁড়াইল দলপতি। প্রকৃতির বিশাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চারিদিক হইতে তাহাদের ঘিরিয়া আছে—সে বাধাকে জয় করিবার জন্য সৃষ্টি হইল মন্ত্রতন্ত্র, যজ্ঞ

হইল দেবতার। আসিল পুরোহিত বা যাদুকর, তারপর কোন্ মুহূর্তে তাহার মাথায় সর্বশ্রেষ্ঠত্বের রাজমুকুট আর কপালে নবরক্তের রাজটীকা আসিয়া পড়িল, অলিখিত ইতিহাসের পাতা হইতে তাহা মুছিয়া গিয়াছে।

সেই হইতে সুরু হইয়াছে সংগ্রাম। সমাজের বুকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অগ্রগামী মানুষ পৃথিবী হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়াছে। কৌতূহলের আকর্ষণ খানিকটা আছে, কিন্তু দেহে-মনে তাহাকে পূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়া, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া যাইবার স্পৃহা তাহার নাই। তাহার জন্য আছে পার্লিয়ামেণ্ট, আছে আইন, আছে গীর্জা এবং ধর্মমন্দির, আছে বিবাহ, আর আছে যুদ্ধ।

ভোর হইয়া আসিতেছে। সামনে শুকতারাটা একখণ্ড শাদা মেঘের তলায় লুকাইয়া গেল। অস্তেই নামিল হয়তো। একটা হালকা কুয়াসা দূরের নদীর ওপর ধোঁয়ার মতো ভাসিতেছে, এপার ওপার দেখা যায় না, হঠাৎ চমকিয়া মনে হয়, আমার এ যাত্রা বুঝি কখনো কোনোদিন সমাপ্তির ঘাটে গিয়া পৌঁছিবে না।

কিন্তু পৃথিবী বিচিত্র। মনে হইতেছে, বাহিরের জল-বাতাস হইতে একটা অনাস্বাদিত গন্ধ, একটা অননুভূত স্পর্শ যেন যাদুমন্ত্রের ছোঁয়া বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতেছে; কিন্তু ঘুমাইয়া পড়িতে ভয় করিতেছে আমার। হয়তো জাগিয়া উঠিয়া আমি আমাকে খুঁজিয়া পাইব না—হয়তো দেখিব, আদিম পৃথিবীর আকাশে বাতাসে অসংখ্য জীবাণুর সঙ্গে আমি মিশিয়া গেছি, হয়তো দেখিব প্রথম সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া-বেড়ানো প্রোটোপ্লাজ্‌মের মতো আমি জীবকোষের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। অন্তরের অণু-পরমাণুতে আমি যেন এই মুহূর্তে প্রথম পৃথিবীর ডাক শুনিতে পাইলাম।

কিন্তু কালুপাড়া অনেক দূর। সন্ধ্যার আগে সেখানে গিয়া পৌঁছানো যাইবে না। সম্মুখে প্রসারিত নদীপথ সকালের আলোয় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—সৃষ্টির চিরন্তন রহস্যের মতো দিগন্ত-চক্রবালে তাহা প্রসারিত।

৪

ডি-সুজার বয়স হইয়াছে, কিন্তু রক্তের জোর মরিয়া যায় নাই। লোকটা অশ্রান্তভাবে খাটিতে পারে। ধান সুপারীর যে কারবার তাহার আছে, তাহা এমন প্রচুর নয় যে তাহাতে নিশ্চিন্তে সম্বৎসর খাইয়া থাকা যায়। সুতরাং ডি-সুজাকে অত্যন্ত খাটিতে হয়। এই বয়সেও তাহাকে নৌকা লইয়া প্রায়ই ঘুরিতে হয়, ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া সে শহরে যায়। দুইবার তাহার নৌকা ডুবিয়াছিল, কিন্তু সে মরে

নাই। প্রথম বারে রাতারাতি মাইল ত্রিশেক সাঁতরাইয়া সে পটুয়াখালির এক চড়ায় হোগলা বনে গিয়া উঠিয়াছিল, দ্বিতীয়বারের শ্যামের হাটের খেয়া ডুবিলে সে এক বোঝা পানের সহায়তায় তেঁতুলিয়ার ভৈরব রূপকে অস্বীকার করিয়াই পারে আসিয়া পেঁ ৗছিতে পারিয়াছিল।

সুতরাং ডি-সুজা দুঃসাহসী। এই সমস্ত অঞ্চলের সব রকম বাধার সঙ্গেই সে এক একবার লড়াই করিয়া দেখিয়াছে। ফলে, যে শুধু ভয়কেই জয় করিয়াছে তাহা নয়, ইহার পুরস্কারস্বরূপ ডি-সুজা প্রয়োজনের অনেক বেশিই রোজগার করে।

অবশ্য সেটার বাহিরে কোনো প্রমাণ নাই। লোকে সন্দেহ করে, মাটির নিচে কোথাও কোনো প্রচ্ছন্ন ধনভাণ্ডার আছে ডি-সুজার; অক্লান্ত ভাবে সে টাকা জমাইতেছে; কিন্তু এই টাকাটা কোথা হইতে, কী সূত্রে যে আসিতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

কোনো আভাস দিলে ডি-সুজা চটিয়া লাল হইয়া যায়।

লোকটার মুখ খারাপ। অশ্রাব্য একটা গালাগালি দিয়া বলে, একটু ভালো দেখেছে কিনা, তাই চোখ টাটায় সকলের। আমার টাকা থাক বা না থাক, আমার যা ইচ্ছে করি বা না করি, তাতে কার কী আসে যায়?

ডি-সুজার সম্পর্কে সমালোচনা করে কিন্তু প্রতিবেশী ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ই বেশি। ইহাদের মধ্যে আবার ডি-সিল্‌ভা অগ্রণী। ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণও আছে ডি-সিল্‌ভার।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়! লিসি বড় বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে তাহার সঙ্গে কোর্টশিপ্ করিবার ইচ্ছা অনেকেরই মনে মনে চাড়া দিতেছে। লিসির রংটা তামাটে আর নাকটা খাঁদা হইলেও মোটামুটি সুন্দরীই বলিতে হইবে তাহাকে। তাছাড়া নেপথ্য হইতে ডি-সুজার ধন-ভাণ্ডারের একটা দীপ্তি লিসির মুখে পড়িয়া তাহাকে আরো বেশী সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বলা প্রয়োজন, লিসি ছাড়া ত্রিসংসারে ডি-সুজার আর কেউ আছে বলিয়া কাহারো জানা নাই।

অতএব সাহসে বুকে বাঁধিয়া ডি-সিল্‌ভা একদা ডি-সুজার কাছে প্রস্তাবটা করিয়াই ফেলিল।

শুনিয়া ডি-সুজা প্রথমটা বিশ্বাস করিতে পারিল না একরকম। খানিকক্ষণ সে ডি-সিল্‌ভার মুখের দিকে মূঢ়ের মতো চাহিয়া রহিল, রাজহাঁসের পাখার মতো শাদায়-কালোয় মিশানো তাহার ভ্রূ দুইটা চোখের উপরে যেন দুইটা উল্টানো জিজ্ঞাসা-চিহ্নের সৃষ্টি করিল। তারপর সেই উল্টা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দুইটা একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। চোখ দুইটা রাগে পিট পিট করিয়া ডি-সুজা বলিল, বটে!

সাহস পাইয়া ডি-সিল্‌ভা কাছে ঘনাইয়া বসিল।

—ভেবে ছাখো; কথাটা নেহাৎ মন্দ বলছি না আমি। যা ভেবেছ, বয়সও আমার তেমন বেশি হয় নি। তাহা ছাড়া আমার যা কিছু আছে—

বৃদ্ধ ডি-সুজা হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো নাচিয়া উঠিল। আনন্দে নয়, অসহ্য ক্রোধে। দুই হাতের দুইটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডি-সিলভার নাকের সামনে দোলাইয়া বলিল, তোমার আছে এই কাঁচকলা! তা ছাড়া ওই নাদা পেট, আর চল্লিশ বছরের একটা টাক—কথাটা বলতে একবার লজ্জা করল না?

ডি-সিল্‌ভা চটিয়া গেল: আমার নাদা পেট, আর তোমার পেট বুঝি আমার চাইতে ছোট? নাত্নীর বয়সও তো পঁচিশ পেরোতে চলল তার হিসেব আছে?

—তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন ভালো মানুষের মতো সুড় সুড় করে বেরোও তো আমার বাড়ী থেকে।

—কী!—অপমানে ডি-সিল্‌ভার মোটা পেটটা একটা বেলুনের মতো ফুলিয়া উঠিল: আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে চাও!

—হাঁ! যাও—বেরোলে না? বটে, মতলব আমি যেন কিছু আর বুঝতে পারি না! প্রথম থেকেই দেখছি নজর আমার মুরগীর খোঁয়াড়ের দিকে। বড় মোরগটা নিয়ে কী ভাবে সটকে পড়বে তারই সুযোগ খুঁজছ! আর দ্বিতীয়বার লিসিকে বিয়ে করতে চেয়েছ কি—হয় টাক ফাটিয়ে দেব, নইলে ভুড়ি দেব ফাঁসিয়ে। মনে রেখো কথাটা।—ডি-সুজার মূর্তি প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছিল।

একপা একপা করিয়া খিড়্‌কির দিকে পিছাইতে লাগিল ডি-সিল্‌ভা। পেট এবং বুদ্ধি লোকটার একটু বেশী পরিমাণে স্থূল, সাহসের মাত্রাটাও সেই অনুপাতে কম। কেবল যাইবার সময় অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া গেল, মেরীর নাম করে বলছি, এর শোধ আমি নেবই।

ডি-সিল্‌ভা ভীরু মানুষ, সুতরাং অনেকটা হাল ছাড়িয়াই দিল সে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার রসনা মরিয়া গেল না। ডি-সুজা সম্বন্ধে নানারকম অলীক গাল-গল্প ছড়াইয়া বেড়ায় লোকটা। শুধু গাল-গল্পই নয়, গালাগালিও করে।

বলে, হতভাগা বুড়ো মরে জিন হয়ে থাকবে।

কিন্তু জোহানকে আঁটিবার জো নাই। ছেলেবেলা হইতেই সে ডি-সুজার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে, লিসির সঙ্গে একত্র হইয়া খেলা করিয়াছে। চট্ করিয়া তাহাকে কিছু একটা বলিয়া বসা যায় না। তা ছাড়া সে কোনো স্পষ্ট প্রস্তাব লইয়া কখনো সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু তা সত্ত্বেও ডি-সুজা অনুভব করে তাহার অজ্ঞতার

পশ্চাতে থাকিয়া একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে জোহান লিসিকে তাহার কাছ হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে, লিসির মনোজগতে ডি-সুজা এখন অনেকটা নেপথ্যে।

এই কারণেই জোহানকে দেখিলে তাহার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া যায়। ডি-সিল্‌ভাকে দেখিলেও বোধ হয় তাহার এজটা বিদ্বেষ বোধ হয় না। আর অনেকটা এই মনোভাবের জন্যই বড় মুরগীটা অপহরণের দায়িত্ব জোহানের কাঁধে চাপাইয়া দিয়া সে শান্ত হইতে চায়।

কিন্তু লিসির বিবাহ দিতে তাহার যে নিতান্ত অনিচ্ছা, তা নয়। আগে হইলে কী হইত বলা যায় না, হয়তো অসংকোচেই সে জোহানের হাতে লিসিকে সঁপিয়া দিতে পারিত; কিন্তু সুনিশ্চিত একটা আলোকে সেটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার আগেই নূতন রাহুর ছায়া পড়িল সেখানে। সেই হইতে পাত্র তাহার ঠিক হইয়াই আছে, এবং ডি-সুজার মতে এমন সুপাত্র দুর্লভ।

পাত্রটির নাম গঞ্জালেস্।

গঞ্জালেস্ দেখিতে সুপুরুষ। ছয় ফুট দীর্ঘ চেহারা, গায়ের তাম্রাভ বর্ণে এখনো আর্যামির খাদ আছে। চোখের তারা পুরোপুরি কালো নয়, চুলগুলিকে মোটামুটি কটা বলা যাইতে পারে। চোয়ালের প্রশস্ত দুখানি হাড়ের মাঝামাঝি দীর্ঘ নাসাটি খড়্গের মতো সমুন্নত হইয়া আছে।

চট্টগ্রামে তাহার শুঁটকি মাছের কারবার। নিম্ন বাংলা হইতে সুরু করিয়া "ডাম্পির" দেশ ব্রহ্ম এবং চীনের উপকূল পর্যন্ত তাহার ব্যবসা বিস্তৃত। আরাকানী রক্তের মিশাল থাকিলেও গঞ্জালেস্ মূলত এখনো পর্তুগীজ। পূর্বপুরুষদের দস্যুবৃত্তি কালক্রমে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধিটাকে গঞ্জালেস্ আজ পর্যন্ত জীয়াইয়া রাখিয়াছে। নানা ঘটনাচক্রে ডি-সুজার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে এবং সেই হইতেই ডি-সুজা তাহাকে নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছে। গঞ্জালেস্ প্রতিপত্তিশালী লোক! তাহার আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে কাজটা যে অনেক নিরাপদেই চালানো যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তা ছাড়া গঞ্জালেসের আর একটি বিশেষত্ব আছে। সেটাও ডি-সুজাকে আকর্ষণ করে কম নয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে নিম্ন বাংলায়, বিশেষ করিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের যে অত্যাচার সুরু হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ধর্ম প্রচারের উগ্র-গোঁড়ামির সহিত দস্যুতার অবাধ প্রেরণা মিশ্রিত হইয়া পর্তুগীজেরা প্রেত-তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কেন্দ্রীয় কোনো শাসন-শক্তি তাহা সংযত

করিতে পারিত না, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের একেবারে প্রত্যন্ত সীমায় আসিয়া সমুদ্রচারী এই দস্যুদলকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তখন বাঙালির বহির্বাণিজ্য ছিল। সিংহল, জাভা, বলী, সুমাত্রা, শ্যাম এবং সুদূর চীন জাপানেও বাঙালি সওদাগরেরা সপ্ত ডিঙা-মধুকর ভাসাইয়া বেসাতি করিতে যাইতেন; 'বস্তু-বদল' করিয়া হরিদ্রার পরিবর্তে আনিতেন স্বর্ণ, আর্দ্রকের পরিবর্তে মুক্তা এবং নারিকেলের বিনিময় গজমোতি। 'মঙ্গল-কাব্যে'র রূপকথার পৃষ্ঠাগুলিতে সে সমস্ত দিনের এক একটা স্বপ্নময় রূপ আজো দেখিতে পাওয়া যায়।

বড় বড় নদীর ধারে, সমুদ্রের মোহনায় তখন সমৃদ্ধ জনপদের অন্ত ছিল না। এখন যে সুন্দরবনের ছায়াগভীর অন্ধকারের মধ্যে রয়্যাল্ বেঙ্গল টাইগারের ক্ষুধার্ত চোখ জল্ জল্ করে, বড় বড় নলঘাস আর হিজল বনের আড়ালে আড়ালে শংখচূড়ের বিষাক্ত বিশাল ফণা দুলিয়া ওঠে, আর খাঁড়ির ধারে ধারে—জোয়ারের জল নামিয়া গেলে যেখানে ঝিনুকের অসংখ্য আঁকা-বাঁকা লেখা পড়ে—বড় বড় মানুষ-খেকো কুমীর শালগাছের গুঁড়ির মতো পড়িয়া রোদ পোহায়, ওখানে একদিন মানুষের বসতি ছিল। সুন্দরীগাছ আর লতাপাতার অজস্র জটিলতা ভেদ করিয়া আরো একটু ভিতরে ঢুকিয়া দেখো, চোখে পড়িবে ঘন জঙ্গলে-ঘেরা মস্ত মস্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, মজিয়া-আসা দীঘির শেষ চিহ্ন। কোথাও কোথাও এখন সাঁই ফকিরদের ধুনি জ্বলে, কোথাও বা বাঘিনী কাচ্চাবাচ্চা লইয়া সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে, আবার কোথাও বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর মানুষের দল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরী চুল দুলাইয়া খাঁড়া-সড়কিতে শান দিতেছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সমস্ত জায়গা এমনি ভয়ংকরের পীঠস্থান ছিল্ না। তখন এখানে মানুষ বাস করিত—উৎসব চলিত—বড় বড় নদীর মোহনায় নতুন নতুন উপনিবেশ বসিয়া বাঙালির ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল; কিন্তু এই ক্রম-বিবর্ধমান সমৃদ্ধি বেশিদিন রহিল না। ভাস্কো-ডা-গামার প্রদর্শিত পথ ধরিয়া হার্মাদেরা একদিন সর্বগ্রাসী পঙ্গপালের মতো বাংলার এই বাণিজ্য অঞ্চল-গুলিতে আসিয়া হানা দিল।

যুদ্ধবাদী দুঃসাহসিক জাতি এই পর্তুগীজরা। নিজেদের দেশ তাহাদের উষর ও অনুর্বর—দারিদ্র্য সেখানে লাগিয়াই আছে। এই দারিদ্র্যকে জয় করিবার জন্য একদল বেপরোয়া মানুষ সমুদ্রের উপর দিয়া অলক্ষ্যের পানে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তৃণতরুবিরল পর্তুগালের রুক্ষ উপকূল হইতে যখন তাহারা বাংলা দেশের উচ্ছল-শ্যামলতা-মণ্ডিত সমৃদ্ধ তীরতট দেখিতে পাইল, যখন দেখিল অনুকূল বাতাসে আকাশ-ছোঁয়া রাশি রাশি পাল উড়াইয়া ধনপতি, শংখপতি অথবা পুষ্পদত্ত সওদাগরের চৌদ্দ

ডিঙা দেশ-বিদেশের মণি-মুক্তা লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, তখন তাহাদের আর মাথা ঠিক রহিল না। রাত্রির ঘুমন্তশান্ত আকাশকে শিহরিত করিয়া তাহাদের রক্তরাঙা মশালগুলি জ্বলিয়া উঠিল, তাহাদের বন্দুকের গর্জনে নিদ্রিত পল্লীর তন্দ্রা টুটিয়া গেল। যুদ্ধবিমুখ, সচ্ছলতায় পরিতৃপ্ত ক্ষীণকায় বাঙালি এই নতুন শক্তির আক্রমণের মুখে শিশুর মতো অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল।

সে অত্যাচারের তুলনা নাই। ভারতবর্ষে শক আসিয়াছে, হূণ আসিয়াছে, তৈমুরলঙ্গ নাদির শাহের আবির্ভাবে রক্তবন্যা বহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু আরাকানী ও পর্তুগীজের দল তলোয়ারের মুখে সেদিন যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, নাদির শাহের রক্তলোলুপতাও তাহার কাছে হার মানিয়া যায়।

সে অত্যাচারের সীমা ছিল না—বিচার ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ কেহই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। চৌদ্দ-ডিঙা মধুকরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সেগুলি বঙ্গোপসাগরের নোনা জলে ডুবিয়া গেল, রাশি রাশি মৃতদেহ জোয়ারের জলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বরিশাল আর সুন্দরবনের কূলগুলিতে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল। বাঙালির বাণিজ্য-যাত্রা চিরদিনের মতো বন্ধ হইল, সমুদ্রযাত্রার উপরে শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন বসিয়া গেল।

উপদ্রব তাহাতেই থামিল না। নদী-সমুদ্র ছাড়িয়া পর্তুগীজেরা এবার গৃহস্থ পল্লীতে অভিযান আরম্ভ করিয়া দিল। হত্যা ও লুণ্ঠন তাহারা নির্বিচারে করিত। বয়োবৃদ্ধ ও অক্ষমদের হত্যা করিয়া সমর্থ যুবকদের বাঁধিয়া লইয়া যাইত—ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিবার জন্য। মেয়েদের উপরে তো অত্যাচার আর নৃশংসতার সীমাই ছিল না। পশুর মতো যথেচ্ছ উপভোগ করিয়া দেশ-বিদেশে তাহাদের বিক্রয় করা হইত। হাতের চেটোয় গর্ত করিয়া সরু বেতের সাহায্যে যেভাবে তাহারা এই সব বন্দীদের 'হালি' গাঁথিয়া রাখিত এবং পাখির আধারের মতো যে ভাবে মাটিতে আধসেদ্ধ ভাত ছড়াইয়া তাহাদের খাইতে দিত—বর্বরতার নিদর্শন হিসাবে সে-সমস্ত কাহিনী অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

সায়েস্তা খাঁ এবং বারো ভুঁইয়ার কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ মস্‌নদ আলী প্রভৃতির সাহায্যে ইহাদের দমন ঘটিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের অত্যাচার আবার প্রবল হইয়া ওঠে। এই সময় ইহাদের নেতা হইয়া দাঁড়ান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস্। এই সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস যে দুর্ধর্ষ জলদস্যুবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং নদীর মোহনায় ছোট ছোট চরে ইহাদের যে-সমস্ত দুর্গ ছিল, সেই দুর্জয় বাহিনী ও দুর্গগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে বাংলার নবাব

আলীবর্দীকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। চর ইস্‌মাইলও পর্তুগীজদের সেই গৌরবদিনগুলিরই ভগ্নাবশেষ মাত্র।

গঞ্জালেস্ এই সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্র না থাকিলেও সিবাষ্টিয়ানের রক্ত তাহাতে আছে।

শুধু সিবাষ্টিয়ানের নয়। গঞ্জালেস্ নিজের মধ্যে নাকি হিন্দুত্বের প্রভাবও কিছু কিছু অনুভব করে। সে সম্পর্কে তাহাদের পরিবারে ভারী চমৎকার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সেটা তাহারই কোনো ঊর্ধ্বতন পূর্ব-পুরুষের গৌরব কীর্তির কাহিনী।...

অবশ্য দেড় শত বৎসর আগেকার কথা। কোনো এক গঞ্জালেসের কাছে সংবাদ আসিল কয়েক মাইল দূরে এক জমিদার বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে। খবরটা পাইয়া গঞ্জালেসের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহাদের লাভ বেশি। অনেকগুলি মানুষ, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোককে একত্রে পাওয়া যায়, তা ছাড়া লুণ্ঠনেরও মন্দ সুবিধা হয় না।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জমিদার বাড়ীতে তোরণে নহবৎ বাজিতেছে, আলোয় চারিদিক আলোময়, কলরব কোলাহলে উৎসব রাত্রি মুখরিত। বর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লগ্নের দেরী নাই, অন্তঃপুরে মেয়েকে কনে-চন্দনে সাজানো হইতেছে।

কিন্তু মুহূর্তে সে উৎসবের সুর কাটিয়া গেল।

বন্দুকের শব্দ আর মশালের আলো—অর্থটা বুঝিতে কাহারো এক মুহূর্ত দেরী হইল না। দু'চারজন পাইক পেয়াদা যাহারা বাধা দিতে সম্মুখে দাঁড়াইল, বন্দুকের গুলিতে তাহারা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বাকী সকলে প্রাণ লইয়া কে যে কখন্ কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইল, তাহার আর ঠিকানাই মিলিল না। শশাঙ্ক-নরেন্দ্রের যুগের বাঙালি তাহারা নয়, কাশ্মীরের পরিহাসকেশব বিগ্রহ যাহারা চূর্ণ করিয়াছিল তাহারাও নয়; পালানোটাই তাহারা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিল।

বরযাত্রীরা পলাইল বটে, কিন্তু বর কোথা হইতে এক গাছা সড়কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, পরণে রক্ত চেলি, সুশ্রী মুখ চন্দন লেখায় চর্চিত। তাহার পেশল বাহুতে সড়কির উজ্জ্বল ফলকটি একবার থর থর করিয়া কাঁপিল, পরক্ষণেই সেটা সোজা নিক্ষিপ্ত হইল একেবারে গঞ্জালেসের বুক লক্ষ্য করিয়া। চট্ করিয়া সারিয়া গিয়া গঞ্জালেস্ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু তাহার পাশের লোকটি বিকট কণ্ঠে একটা আর্তনাদ করিয়া সোজা মাটিতে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল। চক্ষের পলকে বর সড়কিটা আবার হাতে তুলিয়া লইল এবং গঞ্জালেসের বাম-বাহুর পাশ দিয়া আর একজন পর্তুগীজের কণ্ঠ ভেদ করিল।

কিন্তু পর্তুগীজেরা আর নিশ্চেষ্ট রহিল না। এক সঙ্গে চার পাঁচটি বন্দুক গর্জিয়া উঠিল, বর রক্তাক্ত দেহে পৃথিবী গ্রহণ করিল। ভারী বুটজুতার তলায় তাহার দেহটাকে নির্মম ভাবে মাড়াইয়া গঞ্জালেস্ ও তাহার দল ঢুকিল অন্তঃপুরে।

অন্তঃপুরের রুদ্ধ দুয়ার তাহাদের আঘাতে ভাঙিয়া খান খান হইয়া গেল—ভীতা কাতর নারীসংঘের সামনে দাঁড়াইয়া গঞ্জালেস্ আনন্দধ্বনি করিল। তারপর মালায় চন্দনে সাজানো ক'নেটির দিকে তাকাইয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল—এত রূপ! বাঙালি মেয়ে যে এত সুন্দরী হইতে পারে সে তাহা কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। এক মুহূর্ত সে স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হাত বাড়াইয়া মেয়েটিকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।......

লুণ্ঠিত ধনসম্পদ এবং স্ত্রী-পুরুষের সঞ্চয় লইয়া পর্তুগীজদের জাহাজ আবার যখন নদীতে ভাসিয়া পড়িল, তখন সেই বিশাল জমিদারবাড়ী আগুনে ধুধু করিয়া জলিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া পৈশাচিক ভাবে একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি করিল গঞ্জালেস্। বলিল, সব ঘরে আটকে রেখে এসেছি, মর্ ব্যাটারা, এখন ওখানে ইঁদুরের মতো পুড়ে মর্।

...সেই কনেটিই বিংশ শতাব্দীর গঞ্জালেসের কোনো এক অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী। তাই গঞ্জালেস্ মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া বলে, আমি তো আধাআধি হিন্দু।

...অতীতের এই গৌরবময় ইতিহাসটা পেছনে আছে বলিয়াই ডি-সুজা গঞ্জালেস্‌কে এক হিসাবে শ্রদ্ধা করে। ডি-সুজা নিজে বাঙালি হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে বটে, কিন্তু পিতৃপুরুষের কীর্তি-কাহিনী স্মরণ করিয়া এখনও গর্বে ফুলিয়া ওঠে তাহার মন। এ জন্য গঞ্জালেস্ আসিলে সে যে কী ভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিবে তাহা যেন ভাবিয়াই পায় না।

কিন্তু লিসির মনোভাব এখনো কিছু স্পষ্ট করিয়া জানা যায় নাই। গঞ্জালেস সম্পর্কে তাহার ব্যবহারটা খুব পরিষ্কার নয়। তবে তাহাকে দেখিলে সে যে ডি-সুজার মতো অতিরিক্ত উল্লসিত হইয়া ওঠে না এ তো চোখের উপরেই দেখা যায়। অবশ্য তাই বলিয়া এখনো এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে লিসি গঞ্জালেসের পক্ষপাতী নয়।

ডি-সুজার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এর মূলে কোথায় যেন জোহানের প্রভাব আছে। কথাটা ভাবিতেও সে হিংস্র হইয়া ওঠে। বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে জোহান। আচ্ছা দাঁড়াও, বেশিদিন এসব আর চলিতেছে না। এবার গঞ্জালেস্ আসিলেই হয়।

শীতের গোড়া হইতেই চরের আনাচে-কানাচে বুনোহাঁস পড়িতে সুরু করে।

চরের দক্ষিণ-প্রান্তে সেই কবে একটা ছোটখাটো বিলের সৃষ্টি হইয়াছিল, আশ্বিন-কার্তিক হইতেই সেখানে শাপ্‌লা শালুকের ফুল ফুটিয়া ওঠে। এক জাতীয় ক্ষুদে কচুরীতে বেগুনে রঙের রাশি রাশি ফুল ফোটে, নীল্‌ শ্যাওলা আর জলজ-ঘাসের মধ্যে সেগুলি সূর্যের আলোয় জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে। তারপর কোনও এক রাত্রে আকাশ যখন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ধুইয়া গিয়াছে, বাতাস আচমকা থামিয়া গিয়া পর্তুগীজদের ভাঙা গির্জাটার নীচে জোয়ার ভাঁটার সন্ধিক্ষণে নোনা গাঙের জল থম থম করিতেছে—তখন অনেকগুলি পাখার দ্রুত-বিধু-ননে ঘুমন্ত রাত্রির যেন সুর কাটিয়া যায়। তেঁতুলিয়ার জল হঠাৎ কল্‌ কল্‌ করিয়া ওঠে, নানা রঙের পাখায় জ্যোৎস্নার গুঁড়া-আবির মাখাইয়া বুনো হাঁসের দল ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া বিলের জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

জিনিষটা লইয়া অবশ্য কবিতা লেখা চলে; কিন্তু প্রয়োজনের চাইতে কবিতার দাম বেশি নয়। তা ছাড়া চর ইস্‌মাইলের এই নিঃসঙ্গ বিশেষ পরিস্থিতিটির মধ্যে কবিতার অবকাশ কম। প্রকৃতির সব রকম বিরুদ্ধতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মানুষকে অপ্রাকৃতের ভাবনা ভাবিলে চলে না।

সুতরাং সকালের দিকেই জোহান একটা গাদা-বন্দুক লইয়া বিলে হাঁস শিকার করিতে আসিয়াছিল।

বিল নেহাৎ ছোট নয়। কল্‌মি আর বুনোঘাস এবং আল্‌গা-হোগলার বন পার হইয়া প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটুখানি দ্বীপের মতো উঁচু জায়গা। হাঁসের দলটা প্রধানত সেই দ্বীপটুকুর উপরেই বসিয়া আছে। সংখ্যায় যাট সত্তরটির কম হইবে না। কোনো কোনটা পালকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আছে, কয়েকটা এদিক ওদিক কাছাকাছি ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং দু' একটা কারণে অকারণে উড়িয়া উড়িয়া এদিক হইতে ওদিকে পড়িতেছে।

লোভে জোহানের চোখ জ্বলিতে লাগিল। সবে দু'তিনদিন হইল হাঁস পড়িয়াছে এখানে, এখনো 'ফায়ার' হয় নাই। নতুবা হাঁসগুলি আরো সতর্ক হইয়া যাইত।

সরু একটা বেতের সাহায্যে জোহান বারুদ এবং একরাশ চার নম্বরের ছর্‌রা বন্দুকে গাদাইয়া লইল; কিন্তু হাঁসগুলি 'রেঞ্জে'র বাহিরে। জোহান এক মুহূর্ত দ্বিধা করিল, গায়ের জামা এবং গেঞ্জী খুলিয়া হোগলা বনের মধ্যে রাখিল, তারপর জলে নামিয়া পড়িল।

জল খুব বেশি নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা নরম কাদা আর শ্যাওলায় তাহার বুক পর্যন্ত ডুবিয়া গেল। বন্দুকটাকে মাথার উপর তুলিয়া ক্ষুদে কচুরীর আড়ালে আড়ালে অত্যন্ত হুঁশিয়ার ভাবে আগাইতে লাগিল জোহান। ভাগ্যে বাতাসটা বহিতেছে অন্যদিকে। নতুবা হাঁসেরা এতক্ষণে ঠিক তাহার বন্দুকের গন্ধ পাইত—শিকারীদের চাইতে আত্মরক্ষার সহজ চেতনা এবং প্রচেষ্টা তাহাদের অনেক প্রবল।

এতক্ষণে জোহান হাঁসগুলির প্রায় চল্লিশ গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। ইহার চাইতে ভাল সুযোগ সচরাচর দেখা যায় না। একচোখ বুজিয়া ঘোড়ায় আঙুল ছোঁয়াইয়া জোহান লক্ষ্য ঠিক করিতে লাগিল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই কাছাকাছি আর কোথাও বন্দুকের শব্দ হইল 'দুম্' করিয়া জোহান অনুভব করিল, ঠিক তাহার মাথার এক ইঞ্চি উপর দিয়া শাঁ করিয়া একটা গুলি বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই মাথাটাকে জলের কাছাকাছি নত না করিলে আর একটা গুলি তাহার কপাল ভেদ করিয়া চলিয়া যাইত।

ভয়ে আতঙ্কে হাতের বন্দুকটা লইয়াই জোহান বিলের জলে ডুব মারিল এবং পঙ্কিল জল ও কল্‌মি দামের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে একটা ডুব সাঁতার কাটিয়া প্রায় দশবারো হাত দূরে একরাশ হোগলার মধ্যে গিয়া মাথা তুলিল। তারপর ব্যাপারটা আরো কতদূর ঘটে সেটা দেখিবার জন্যই ভীত চক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুই আর ঘটিল না। গুলি যে ছুড়িয়াছিল, আশ-পাশে জঙ্গলগুলির মধ্য দিয়া সে যেন মন্ত্রবলেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। শুধু তখনো সমস্ত বিল ভরিয়া গন্ধকের গন্ধ ভাসিতেছে আর একটা হালকা নীল ধোঁয়া রেখার মতো বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে। আর সমস্ত আকাশ ছাইয়া উড়ন্ত বুনো হাঁস, কাদাখোঁচা এবং বকের তীক্ষ্ণ চীৎকার ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জোহান জল হইতে উঠিয়া আসিল। আশে-পাশে কোথাও কোন মানুষের সাড়া নাই। শিকারের সময় বিলে সর্বদাই বন্দুকের শব্দ শোনা যায়, তাহাতে কাহারো কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। তীরে উঠিয়া জোহান দেখিল, হোগলা বনের মধ্যে যেখানে সে তাহার গায়ের জামা ও গেঞ্জি রাখিয়াছিল, তাহারই অনতিদূরে মাটিতে দুইটা রয়্যাল্ একস্‌প্রেসের খালি টোটা পড়িয়া আছে। আর তাহারই পাশে নরম কাদার উপর এক জোড়া জুতার চিহ্ন।

জোহান ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, জুতার চিহ্নটা যেন চেনা চেনা ঠেকিতেছে। সাধারণত এই ধরণের জুতা বর্মিরাই ব্যবহার করে।

বলরাম ভিষক্‌রত্ন কয়েকদিন ধরিয়াই অত্যন্ত চিন্তান্বিত বোধ করিতেছিলেন।

অসুবিধা বাধিয়াছে মুক্তোকে লইয়া। সে আর এখানে থাকিতে রাজী নয়—দেশে ফিরিতে চায়। ভূতের দেশ এবং মুক্তো নিশ্চয়ই সে ভূতের দলের একজন নয় যে এখানে মাটি আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবে।

বলরাম মহা সমস্যায় পড়িয়া কহিলেন, কেন, বেশ তো আছ। অসুবিধের এমন কী হয়েছে?

মুক্তো ঝাঁজিয়া বলিল, অসুবিধের কী হয় নি? মানুষ নেই, জন নেই, আছে কতকগুলো অদ্ভুত জীব। তাদের কথাই বোঝা যায় না। তুমিও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পড়ে থাকো, আমার দিন কাটে কী করে?

বলরামের কণ্ঠে করুণতার আমেজ আসিল; কী বলছ, বন্ধু-বান্ধব নিয়েই থাকি। তুমি আসবার পরে তো একরকম সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি মুক্তো। কাল পোস্টমাস্টার এসেছিল, তাকেও শুধু এক ছিলিম তামাক খাইয়েই বিদেয় দিয়েছি।

মুক্তো রুষ্ট হইয়া বলিল, তোমার ওই পোস্টমাস্টার মানুষটি বাপু সুবিধের নয়, ওকে দেখলেই কেন যেন আমার গায়ের মধ্যে শির শির করে। লোকটার চেহারা যেন ভূতুড়ে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু একটা অলক্ষুণে ঘটাবার চেষ্টায় আছে ও।

বলরাম দ্বিধা করিতে লাগিলেন। পোস্টমাস্টারের রসনা সব সময়ে প্রীতিকর নয়; তাঁহার কাহিনী এবং কল্পনাগুলি বলরামকে প্রায়ই আতঙ্কিত করিয়া তোলে। তা সত্ত্বেও তাঁহার সম্বন্ধে বলরামের যেন একটা স্নেহগত দুর্বলতাই আছে। এক কথায় বলিতে গেলে, মুক্তো ছাড়া এই চর ইস্‌মাইলে মাত্র হরিদাসকেই তাঁহার যাহোক কিছু ভালো লাগে।

বলরাম বলিলেন, না, তা ঠিক নয়—হরিদাস মানুষটা খুবই ভালো। তবে মাঝে মাঝে ওর একটু পাগলামি চাপে, তা—

মুক্তো বলিল, মরুক গে। তুমি কবে আমাকে দিয়ে আসবে সেটা ঠিক করে বলো। আমার আবার সব কিছু গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিক ক'রে নিতে হবে তো।

বলরামের স্বর প্রগাঢ় হইয়া আসিল: তুমি বুঝতে পারছ না মুক্তো, এখানে একরকম একলা দিন কাটাই। কেউ নেই যে একটু যত্ন করে, কেউ নেই যে দুটো জিনিস ভালোমন্দ রেঁধে দেয়। থাকবার মধ্যে আছে ওই রাধানাথ, তাও তো দেখছই—ও ব্যাটা ফাঁকি দেবার যম।

মুক্তোর করুণা হইল না। সে নির্দয় ভাবেই বলিল, তার আমি কী করব! আমি তো আর তোমার সংসার নিয়ে এই ভূতের দেশে পড়ে থাকতে পারব না।

বলরাম সাহসী হইয়া উঠিলেন, একটু একটু করিয়া মুক্তোর কাছে ঘনাইয়া বসিলেন।

—সত্যি বলছি মুক্তো, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আমি, আমি তোমাকে—বলরাম বার তিনেক ঢোঁক গিলিলেন, কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না।

বিদ্যুৎবেগে মুক্তো বলরামের কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল, তাহার দুই চোখের কোণে কোণে খানিকটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি প্রকাশ পাইল। কথার ভাবে মনে হইল যেন আতঙ্কে সে শিহরিয়া উঠিয়াছে।

—ছি, ছি—কী বলছ! দেখাশুনো করবার জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছ আর তোমার মুখে এই কথা!

বলরামের ব্যগ্রতায় বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

—তোমাকে নইলে আমি বাঁচতে পারব না মুক্তো। তা ছাড়া এ হচ্ছে পাণ্ডববর্জিত দেশ, পৃথিবীর বাইরে। এখানে কোনো আইন-কানুনের বাঁধাবাঁধি নেই—কেউ কিছু জানবে না। তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না।

উত্তরে মুক্তো শুধু উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ফলাফল যাই হোক, অনির্দিষ্ট কালের জন্য দেশে ফেরাটা স্থগিত রহিল, মুক্তোর। খারাপ দিনকাল আসিয়া পড়িতেছে—কিছুদিনের মধ্যেই নদীতে রোলিং সুরু হইবে। এমন সময় প্রাণ হাতে করিয়া ভাসিয়া পড়িলে যে লাভ কী—বলরাম তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

সুতরাং মুক্তো রহিয়া গেল। তারপর একদিন রাত্রে যখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে, বাতাসে চর ইস্মাইলের সুপারীর বন দুলিতেছে, আর বজ্রের আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে তেঁতুলিয়ার জল, তখন মুক্তো এই সৃষ্টি ছাড়া দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না।

ফসল

১

চর ইস্মাইলে বসন্ত আসিয়া গেল।

অবশ্য খুব সমরোহ করিয়া নয়। নোনা মাটিতে ফুল ফুটিতে চায় না। আশে পাশে গাঙের জলে টান ধরিয়া যায়, নদীর ঘন গৈরিকবর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিবার উপক্রম করে। নদীর ধারে নরম পলিমাটির উপর ত্রিশূলের মতো ছোট ছোট পদচিহ্ন আঁকিয়া স্নাইপের দল শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে বড় বড় পাখা দুলাইয়া

ফুট্‌ফুটে শাদা একরাশ পেঁজা তুলার মতো এক এক জোড়া চখা চখী আসিয়া এখানে ওখানে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আবার তেমনি করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে ঈথার-সমুদ্রে শব্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া হাঁসের দল অনির্দেশ অভিমুখে ফিরিয়া যায়—হয়তো কাশ্মীরে, হয়তো মানস সরোবরে, হয়তো বা আরো দূরে।

ঝড় বৃষ্টির দিন আসিয়া পড়িতেছে। কয়দিন হইতেই অত্যন্ত গুমোট গরম। দুপুরবেলা আকাশটা যেন একটা কাঁসার পাতের মতো জলে, সেদিকে তাকাইতেও চোখ ঝলসিয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া হু হু শব্দে দমকা বাতাস আসে, সুপারি নারিকেলের বন যেন পাগলের মতো মাথা কুটিতে থাকে।

পোস্টমাস্টারের মনটা খারাপ হইয়া যায়। আকাশে বাতাসে যেন একটা অসীম উদাসীনতা। দূর দিগন্ত হাত বাড়াইয়া আকুল অন্তরের যাযাবরটিকে ডাক পাঠাইতে থাকে। সম্মুখে অজ্ঞাত পৃথিবী একখানা খোলা পাতার মতো মেলা রহিয়াছে। অক্ষরগুলিকে পড়িতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয়, চর ইস্‌মাইলের প্রত্যন্ত ছাড়াইয়া এক একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ওই হাঁসের দলের মতো অলক্ষ্যের সন্ধানে ভাসিয়া পড়িতে! সুসঙ্গের পাহাড়, সাঁওতাল-পরগণার শালবন, জয়পুরের মরুভূমি, মাদুরার সমুদ্রতীর। হুঁকা হাতে করিয়া পোস্টমাস্টার বসিয়া থাকেন, গলার তাবিজটাকে পর্যন্ত অতিশয় ম্লান দেখায়।

কেরামদ্দি আসিয়া বলে, বাবু আমি বাজারে চললুম। ভাতটা চাপিয়ে দিয়েছি। ধরে না যায়, নামিয়ে রাখবেন।

পোস্টমাস্টার বলেন, হুঁ।

কেরামদ্দি চলিয়া যায়। ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরিতে থাকে। দু-একজন লোক আসে, কেউ একখানা পোস্টকার্ড, কেউ একটা মনি-অর্ডার। তারপরেই আবার সব নিঝুম হইয়া পড়ে। দূর হইতে বড় বড় নৌকার মাস্তুল দেখা যায়।

খানিক পরেই সচেতন হইয়া ওঠেন পোস্টমাস্টার। স্টোভের একটানা আওয়াজটা ওঘর হইতে কেমন যেন শোনা যাইতেছে। বাতাসে পোড়া ভাতের পরিষ্কার গন্ধ। কেরামদ্দি ভাতটা নামাইয়া রাখিবার কথা বলিয়া দিয়াছিল বটে।

পোস্টমাস্টার পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া আস্তে স্টোভটি নিভাইয়া দেন। ভাতগুলি পুড়িয়া একেবারে লাল হইয়া গিয়াছে। আবার না রাঁধিলে মুখে তোলা যাইবে না। অবশ্য এক বেলা না খাইলেও এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তা ছাড়া শরীরটা কেমন কেমন করিতেছে—হয়তো আজ আবার তেম্‌নি করিয়া হাঁপানির টান উঠিবে।

যাযাবর মনটাকে বিশ্বাস নাই। একদিন গভীর রাত্রিতে গীর্জার ঘাট হইতে

ছোট একখানা এক মাল্লাই নৌকা লইয়া সেখানাকে সুদূর দিগন্তে ভাসাইয়া দিলে কেমন হয় কে জানে। স্রোতের মুখে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইবে বঙ্গোপসাগরের মোহনায়—দৌলত-খাঁর বন্দরের আলো যেখানে চোখে দেখা যায় না—সেখানে দিগন্ত-মেখলায় চর কুকুরার শেষ নারিকেল বীথিও ছোট একটা বিন্দুর মতো অস্পষ্ট হইতে আরো অস্পষ্ট হইয়া ধূ ধূ আকাশের নীচে মিলাইয়া গিয়েছে।

—তারপর? তার পরের ইতিহাস কে জানে? এই সমুদ্রের কি শেষ আছে? এই পথের কি কোনোদিন সমাপ্তি ঘটিবে? এই লবণ-সমুদ্রে কোথাও যদি ফলে-পুষ্পে-ঘেরা একটা প্রবালের দ্বীপ চোখে পড়িয়া যায় তো সেখানে তিনটি দিন কাটাইয়া আবার নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। অবশেষে যখন এমন দিন আসিবে যে আকাশ আর সমুদ্রের কোনো কূল-কিনারা নাই, ফল নাই, জল নাই—তখন হয়তো অসহ্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এই জীবনটার উপর দিয়া নামিবে শেষের যবনিকা। ছোট নৌকাখানির উপরে শরীরের মাংস গলিয়া পচিয়া ঝরিয়া গিয়া একটা শুকনো হাড়ের পঞ্জর দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে শুকাইতে থাকিবে।…

—হুম্।

পোস্টমাস্টার চমকিয়া উঠিলেন। ঘরে ঢুকিয়াছেন বলরাম ভিষকরত্ন। একটা বিচিত্র প্রসন্নতায় চোখের তারা নাচিতেছে যেন। বলরামের এমন প্রসন্ন মুখভাব অনেক কাল দেখেন নাই হরিদাস।

—বলি, ব্যাপার কি দাদা! চোখ বুজে কি বৌদিকে ভাবছেন?

হরিদাস সাহা হাসিলেন। হাসিলে তাহার কালো মুখটায় এক ধরণের শ্রী দেখা যায়; বলরাম তাঁহার গম্ভীর মূর্তিটা সহ্য করিতে পারেন না—হরিদাসের গাম্ভীর্যের সঙ্গে কী একটা অনিবার্য কার্য-করণ-যোগে তাঁহার মনটাও যেন খচখচ করিয়া ওঠে। কেন বলা যায় না—মাঝে মাঝে বলরামের মনে হয় হরিদাস প্রেত-সিদ্ধ, ইচ্ছা করিলেই তাঁহার চোখের সাম্‌নে গোটাকয়েক ভূত নামাইয়া যা-তা কাণ্ড করিতে পারেন।

—হুঁ, বৌদিকেই বটে। হরিদাস বড় বড় চোখ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন: বিরহ-বেদনা আর কতকাল সহ্য করা যায়, বলো?

—তা সত্যি। বলরামের কণ্ঠে সহানুভূতির আমেজ লাগিল: এমন করে কদিন কাটাবে? আর শরীরের অবস্থা তোমার যা হয়েছে দাদা, তাতে সব সময়েই সেবা-শুশ্রূষা করবার একজন লোক দরকার। বুড়ো বয়সে বউ কাছে না থাকলে—

বটে? বলরামের মনে হইল, হরিদাস যেন তাঁহার দিকে এক রকম চোখ পাকাইয়াই চাহিলেন: হঠাৎ এ সব তত্ত্বকথা যে! স্পষ্ট করেই বলো তো কবিরাজ, দ্বিতীয় পক্ষের চেষ্টায় আছো নাকি?

বলরাম অকারণে চমকিয়া উঠিলেন :—যাও—যাও, দ্বিতীয় পক্ষ! বয়স গেল পঞ্চাশ ছাড়িয়ে, এই বুড়ো বয়সে আর—

—কেন উল্টো কথা বলছ ভায়া ? একটু আগেই না বলছিলে যে বুড়ো বয়সে বউ কাছে না থাকলে একেবারে অচল ? তা ছাড়া চেহারারও তো জৌলুষ ফিরছে দেখছি। মাথায় তো দিব্যি একটি টাক পড়বার জো হয়েছে—ওদিকে গন্ধ-তেলটুকু মাখতে কসুর করো নি। যাই বলো আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে—

—সন্দেহ ? কী সন্দেহ ?—বলরামের আগাগোড়া চেহারাটাই যেন গেল বদলাইয়া।

বলরাম জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, যাও, যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না। তোমার কথাবার্তা সত্যি ভারী অভদ্র।

অভদ্র! কেন শুনি ?—বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা অনুমান করিয়া লইয়াই হরিদাস অতিশয় সশব্দে হাসিতে স্বরু করিয়া দিলেন। অদ্ভুত অস্বাভাবিক হাসি, যেন কবিরাজের দুইটা কানের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া মগজের মধ্যে করাত চালাইতে আরম্ভ করিল। বলরামের ইচ্ছা হইতে লাগিল, দু'হাতে কান চাপিয়া ধরিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যান তিনি।

কিন্তু সমস্ত অবস্থাটাকে বাঁচাইয়া দিল কেরামদ্দি।

বাজার লইয়া সে ঘরে ঢুকিল, তারপর প্রশ্ন করিল, ভাতটা নামিয়েছিলেন বাবু ?

একবারটি হাসি থামাইয়া হরিদাস আবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন, ভাত ? সে অনেকক্ষণ পুড়ে ছাই হয়ে আছে।

—সে কি!

বাজারটা ফেলিয়া কেরামদ্দি ঘরে ঢুকিল। তারপর ভাতের হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার দেরী হইল না।

—ছি, ছি, এ যে একেবারে লাল হয়ে গেছে। আবার রাঁধতে হবে তো। আপনার কি কোনোদিকেই খেয়াল থাকে না বাবু ?

হরিদাস হাসিমুখেই বলিলেন, কী করে থাকবে! কবিরাজ এল যে। যাক, তোমার ভাতের থেকে দুটি আমাকে দিয়ো কেরামদ্দি, এ বেলা তাতেই আমার চলে যাবে!

—আমার ভাত ? জাত যাবে যে বাবু!

—ইঃ, জাত যাবে! জাত যাওয়া মুখের কথা কিনা। আমি তো আর বামুন নই যে আমার জাত কাচের মতো ঠুন্ করে ভেঙে পড়বে। এ ভারী শক্ত জিনিস—শাবল গাঁইতি ছাড়া ভাঙবার নয়।

বলরাম হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন, আমি এখন উঠলুম।

—উঠবে? নিতান্তই উঠবে! তা তুমিও তো একদিন নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন করলে পারতে কবিরাজে। তোমার উনি ইদানিং কেমন রাঁধছেন টাঁধছেন তা—

—যাও, যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না—এবার কিন্তু বলরাম জোর করিয়াও হাসিবার চেষ্টা করিলেন না। একখানা পাথরের মতো ভারী আর কালো মুখ লইয়া অত্যন্ত দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল, তিনি রাগ করিয়াছেন।

হরিদাস এক মুহূর্ত বিস্মিত চোখে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর সামনের টেবিলটার উপর স্বচ্ছন্দে দুখানি পা তুলিয়া দিয়া শিস দিতে সুরু করিলেন। সত্যি সত্যিই যেন বলরামের কী হইয়াছে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে তাহাকে এতখানি পরিহাস-বিমুখ কখনো দেখেন নাই হরিদাস। তাসের আড্ডাটাও কদিন ধরিয়া বন্ধ হইয়া আছে।

—ওয়ান মণি-অর্ডার বাবু!

হরিদাস তাকাইয়া দেখিলেন, জানালার বাহিরে একজন বর্মি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখোচোখি হইতেই সে মার্বেল-বাঁধানো কঠিন মুখের ভিতরে একটুখানি হাসিল, ওয়েল, বাবু?

—হাঁ, ওয়েল। তোমরা কবে এলে?

—কাল। তোমাকে একটু কষ্ট দিব বাবু, মণি-অর্ডার আছে একটা।

—কত টাকার?

—ফিপ্‌টি। যাবে পিনাঙে। কবে পৌঁছুবে?

পোস্টমাস্টার চিন্তা করিয়া বলিলেন, নো ক্লিয়ার আইডিয়া। আট দশ দিন দেরী হতে পারে।

—আট দশ দিন! তা কী আর করা যাবে!

পোস্টমাস্টার মণি-অর্ডার রাখিয়া একটা রসিদ দিতে বর্মি অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া গেল। গত পাঁচ বছর ধরিয়া ছয় মাস পর পর ইহারা এখানে ব্যবসা করিতে আসে। কিসের ব্যবসা যে করে তাহা তিনি ভালো করিয়া জানেন না—তবে ধান-চাউলের কী একটা কারবার আছে বলিয়াই তিনি শুনিয়াছেন; কিন্তু ইহা ভাবিয়া তাহার বিস্ময় লাগে যে যাহাদের নিজের দেশ শস্যের অকৃপণ ঐশ্বর্য লইয়া বসিয়া আছে এবং বাংলা দেশের ক্ষুধার্ত মানুষ যে দেশের মুখ চাহিয়া থাকে, সেই দেশ ছাড়িয়া ইহারা ভারতবর্ষে মরিতে আসে কী করিতে! এখানে আসিয়া ইহাদের এমন কী লাভটা হইবে! আর আসিলই যদি, তবে গোটা ভারতবর্ষের এত জায়গা

ছাড়িয়া একেবারে সমুদ্রের মুখের মধ্যে এই সৃষ্টিছাড়া চরে ব্যবসার এমন কোন্ সুবিধাটা হইতেছে। তা ছাড়া দাদন দিয়াই যখন এখান হইতে ধান-সুপারী কিনিতে হয়, তখন এখানে তো গাঁটের কড়িই খরচ করিবার কথা ; কিন্তু ইহাদের ব্যবহারটা ঠিক উল্টা—ইহারা এখান হইতে পিনাং, মালয়, সাংহাইতে মণি-অর্ডারের পর মণি-অর্ডার করিতেছে !

চুলোয় যাক ও সব। আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খোঁজে দরকার নাই। পোস্টমাস্টার একটা হাই তুলিলেন।

কেরামদ্দি নতুন করিয়া কতকগুলি চাউল ধুইয়া আনিয়াছিল। বলিল, ভাত চাপিয়ে দিন বাবু!

—হয়েছে, হয়েছে—ভ্রূভঙ্গি করিয়া হরিদাস বলিলেন, এখন বসে বসে ভাত রাঁধতে আমার বয়ে গেছে। কেন দিক করছিস বাবা, যা হয় চারটি তুই-ই রেঁধে দেনা।

—আমি রেঁধে দেব বাবু? কেরামদ্দি বিস্মিত হইয়া কহিল, আমার ছোঁয়া খাবেন আপনি !

—খাব না ? কেন খাব না শুনি ? আমার কালী পেত্নী বৌয়ের ছোঁয়াই যদি খেতে পেরেছি, তুমি আর কী দোষ করলে ? ভয় নেই—আমি সমস্ত জাতের ওপরে, ওতে কোনো ক্ষতি হবে না।

কেরামদ্দি হাসিয়া চলিয়া গেল।

২

কালুপাড়ায় আসিয়া মণিমোহনের বোট ভিড়িল, তখন দিক্‌দিগন্ত ঘিরিয়া কালো সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। যেখানে আসিয়া নৌকাটা প্রথম লাগিল সে জায়গা হইতে গ্রাম ঠিক কাছে নয়। সম্মুখে অনেকটা জুড়িয়া বিস্তীর্ণ পঙ্কতট—জোয়ার আসিলে ঘোলা জলে ভরিয়া যায়। তারপর যখন কোনো সময় নদীর জলে বাতাসের দোলা লাগে তখন ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পা-ওয়ালা ছোট ছোট মিহু মাছ কাদার উপরে লাফাইতে থাকে।

এখান হইতে সামনে চাহিলে দেখা যায় : দূরের রিক্ত মাঠের উপর দিয়া যেন অন্ধকারের একটা বেড়াজাল কে ঘিরিয়া দিয়াছে। সারি সারি নারিকেল সুপারীর মাঝখান দিয়া এক-একটি অলোর রশ্মি আলেয়ার মতো দেখা যাইতেছে। ওইটাই গ্রাম।

বর্ষার সময় অবশ্য নৌকা লইয়া বড় নদীতেই বসিয়া থাকিতে হয় না। বাঁ দিকে একটু দূরে যে ছোট খালটি শুকাইয়া একটা খাদের মতো পড়িয়া আছে, ওইটা তখন অজস্র জলে টই-টম্বুর হইয়া যায়। শুধু ডিঙি নৌকা কেন—সরকারের এত বড় বোটখানাকেও তখন একেবারে গ্রামের বুক পর্যন্ত লইয়া যাওয়া চলে।

সন্ধ্যার পর আর কোন কাজ হইবে না, অতএব চুপচাপ বোটে বসিয়াই কাটাইতে হইবে রাতটা। মাঝিরা ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত চাপাইয়া দিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে দশটার উপরে বাজিয়া গেল এবং সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত মাঝির দল যে-যেখানে পারিল পড়িয়া রহিল লম্বা হইয়া। কেবল সারাটা নির্জন রাত্রি ধরিয়া তেঁতুলিয়ার জল অশ্রান্তভাবে বোটটার চারি পাশে খেলা করিতে লাগিল—সম্মুখে পশ্চাতে অপর্যাপ্ত লোনার উপর ফস্‌ফরাস্ চিক্ চিক্ করিতে লাগিল এবং হুহু করা বাতাসে দ্বিপ্রহর অবধি মণিমোহনের ঘুম আসিল না। নিম্ন বাংলার রাক্ষসী নদীটা এই রাত্রে কেমন করিয়া যেন মায়াময়ী হইয়া উঠিয়াছে।

সকাল বেলা পঙ্কতীর পার হইয়া সামনের মাঠের মধ্যে মণিমোহন ছোট খাটো একটি কাছারি করিয়া বসিল। দেশটা প্রায় আগাগোড়া জেলে আর মুসলমানের—তবে মগও কিছু কিছু আছে! তাহারা এখানে ব্যবসা করে। বর্মা চুরুটের জন্য সুপারীর বাল্‌দোর কী দরকার আছে কে জানে, সেগুলি নাকি এখান হইতে সংগ্রহ করে তাহারা।

পেয়াদা গিয়া প্রজাদের খবর দিয়া ডাকিয়া আনিল। দুর্বৎসরে গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহাদের টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। এখন সেই টাকাটা আদায়ের সময়।

এই দূর দুর্গম দেশে প্রজারা অফিস-আদালত এবং সহরের আরো দশটা উপসর্গের চৌহদ্দি হইতে পুরাপুরি বাহিরেই আছে। এক ফৌজদারী জাতীয় আইন-ঘটিত বিশৃঙ্খলাই ইহাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে এবং তাহার মীমাংসা এরা নিজেরাই করিয়া লয়। সুতরাং সরকার-সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্র পেয়াদাও এখানে আসিয়া দর্শন দিলে ইহারা তাহাকে অতিরিক্ত সমীহ করিয়া থাকে। সেই কারণে, সরকার তহশীলদারের আবির্ভাব ইহাদের একটা বিরাট স্মরণীয় ঘটনা।

প্রথমে যে লোকটি আসিল, তাহার বয়স হইয়াছে। অস্বাভাবিক বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সের স্পর্শে বাঁধুনি ঢিলা হইয়া পড়ে নাই। একমুখ পাকা দাড়ী মেহেদী দিয়া রাঙানো, হইয়াছে, কিন্তু বার্ধক্যের পাশা-পাশি এই অঙ্গরাগটুকু যেন মানায় নাই। পরণের লুঙ্গিটার রঙ সাদাই ছিল—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ময়লার একটা পুরু আবরণ পড়ায় এখন তাহার জাতিগোত্র নির্ণয় করিবার জো নাই।

এতহাতে এক জোড়া মুরগী ঝুলাইয়া আনিয়াছিল। আসিয়াই সে একটা সশ্রদ্ধ সেলাম জানাইল, বলিল, হুজুরের শরীর ভালো আছে তো ?

যেন কতকালের চেনা। মণিমোহন হাসিয়া বলিল, হাঁ ভালোই আছে ; কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলুম না।

—চিনতে পারবেন কেমন করে ? আর কখনো এ তল্লাটে আসেন নি তো। আগে যিনি এই 'সারখেলে' ছিলেন তিনি আমায় ভালো করে চিনতেন। বান্দার নাম মজাঃফর মিঞা।

—ও, মজাঃফর মিঞা। কত টাকার লোন তোমার ?

—আজ্ঞে সে সামান্যই—হুজুরের চোখে পড়বার মতো নয়।

মজাঃফর মিঞা বিনয়ে জিভ্ কাটিল। তারপর মুরগী জোড়া মণিমোহনের পায়ের কাছে রাখিয়া বিনয়-গলিত স্বরে বলিল, হুজুর যদি কিছু মনে না করেন—

কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মণিমোহন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

—গোপীনাথ !

গোপীনাথ খাতা খুলিয়া বসিয়াই ছিল, আজ্ঞে ?

—দেখ তো মজাঃফর মিঞার কাছে কত টাকা পাওয়া যাবে ?

মজাঃফর বিব্রত হইয়া উঠিল। আর একবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ্ঞে সে কটা সামান্য টাকার জন্যে সরকার বাহাদুরের আর—

কর্তব্য পালনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে গোপীনাথ। ধমক দিয়া কহিল, বেশি কথা কোয়ো না বড় মিঞা। দেখছ তো স্বয়ং হুজুর সামনে বসে আছেন। বলো, তোমার বাপের নাম কি ?

—বাপের নাম, বাপের নাম ?

অধৈর্য স্বরে গোপীনাথ বলিল, হাঁ হাঁ বাপের নাম। ওকি মাথা চুলকোচ্ছ যে—বলি, সেটা কি ভুলে গেছ নাকি ?

মজাঃফর মিঞা মেহেদী রাঙানো দাড়ির ভিতর দিয়া বিনীত মৃদু হাস্য করিল। লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, আজ্ঞে ভুলে যাওয়াটা তো তাজ্জব নয়। আমার বয়েস যদি তিন কুড়ি সাত বছর হয়, তবে তিনি কতকাল আগে বেহেস্তে গেছেন ভেবে দেখুন দেখি ?

মণিমোহন অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিল।

গোপীনাথ তখন আঙুলে থুথু লাগাইয়া খস্ খস্ করিয়া একখানা মোটা খাতার পাতা উল্টাইতেছিল। মৌজে রঘুনাথপুর, মৌজে ভ্যাঘ্‌লাহাট, মৌজে কালুপাড়া, কালুপাড়া—

—চালাকি পেয়েছ নাকি ? এ জমিদারী সেরেস্তার তহশীলদার নয়—একেবারে সাক্ষাৎ হাকিম। বেশী ওস্তাদি করো, তো সদরে যেতে হবে খেয়াল থাকে যেন। বলো শিগগির, বাপের নাম কী ?

মজাঃফর মিঞা যেন মুষড়াইয়া গেল। সদর নামটা এমন প্রবীণ জোয়ান লোকটার মনের উপরেও অদ্ভুতভাবে ক্রিয়া করিয়াছে। কাতর কণ্ঠের উত্তর আসিল, আস্রাফ মিঞা।

—হুঁ। এই তো কথা ফুটেছে দেখছি। মণিরুদ্দিন মিঞা, করম গাজী—হাঁ, এই যে মজাঃফর মিঞা। সাং গোবালিয়া মৌজে কালুপাড়া—পিং মৃত আস্রাফ আলী হাওলাদার—ওরে বাপ্‌রে, ৫২৷৵৫ পয়সা !

গোপীনাথ মণিমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবু মুরগী দেওয়ার ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলেন তো ?

মণিমোহন হাসিয়া কহিল, সেটা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলুম !

দু'টি একটি করিয়া চারিপাশে তখন অনেক কয়টি প্রজা আসিয়া ভিড় করিয়াছে। খাসমহল কাছারীর তহশীলদারের এই আকস্মিক আবির্ভাবে তাদের মন যে আনন্দে উছলাইয়া ওঠে নাই, সেটা তাদের অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখের দিকে চাহিলেই অনুমান করিয়া লওয়া চলে। তবু একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল—মজাঃফর মিঞার দুর্গতিতে তাহারা অনেকেই খুশি হইয়া উঠিয়াছে।

গোপীনাথ মুখের উপর একটা ভীতিদায়ক গাম্ভীর্য টানিয়া আনিয়া বলে, হুঁ ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। হাসি বেরিয়ে যাচ্ছে সব—দাঁড়াও। তারপর বড় মিঞা টাকার কী হবে ?

বড় মিঞা ম্লান হইয়া বলিল, কী হবে তা তো আমিও ভাবছি। সব সুপুরী বাদুড়ে নষ্ট করে দিলে, ধানও এমন পায় নি যে—

মণিমোহন গম্ভীর হইয়া উঠিল : কেন মিথ্যে কথা বলে এই বুড়ো বয়েসে পাপের বোঝা বাড়াচ্ছ বল তো ? বাদুড়ে আর কটা সুপুরী খেয়ে নষ্ট করতে পারে। তা ছাড়া সবাই-ই তো বলছে, এবারের মতো ধান গত পাঁচ বছরেও হয় নি।

মজাঃফর কহিল, নসীব হুজুর, নসীব। যার বরাত ভালো সে পেয়েছে ; কিন্তু আমি—ক্ষোভে বড় মিঞার মেহেদী রঙীন্ দাড়িটি যেন কাতর হইয়া গালের দুই পাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

মণিমোহন কহিল, আচ্ছা বেশ, সব না পারো, অর্ধেক দাও। তোমরা টাকা না দিলে আমার চাকরী কী করে থাকবে। তিরিশটা টাকা ফেলে দাও, তা হলেই—

—তিরিশ টাকা! বড় মিঞার চোখ তুইটা প্রায় কপালে উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

গোপীনাথ মুখ বিকৃত করিয়া কী একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই ভীড়ের মধ্য হইতে আর একজন কথা কহিয়া উঠিল।

—তা এমন শক্তটা কী! এই পরশুই তো একজোড়া মোষ আশী টাকায় বিক্রী করেছ চাচা, তা থেকেই টাকা কটা ফেলে দাও না!

বিনা মেঘে কোথা হইতে বজ্রাঘাত হইয়া গেল যেন।

হাকিমের সামনে এতক্ষণ বিনয়াবনত হইয়া থাকিলেও এইবারে মজাঃফর মিঞার আর ধৈর্য রহিল না।—কে, কাশেম খাঁর ব্যাটা বুঝি? বেশ করেছি, বিক্রী করেছি আশী টাকায়, তোকে এখানে মোড়লী করতে কে ডেকেছে?

—কেউ ডাকে নি—হুজুরকে কেবল খবরটা দিয়ে দিলুম। অত্যন্ত নিরীহ স্বরে কাশেম খাঁর ব্যাটা জবাব দিল। কিছুদিন আগেও গায়ের জোরে গোরু নামাইয়া মজাঃফর মিঞা তাহার ক্ষেতের ধান খাওয়াইয়াছে, সে কথা সে ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যায় নাই।

—ইঃ, মস্ত খবর দেনে-ওয়ালা এসেছে রে! মজাঃফর মিঞা বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, ও ব্যাটাচ্ছেলের কথা বিশ্বাস করবেন না। শত্রুতা আছে বলে আমার নামে যা নয় তাই লাগাচ্ছে।

—আচ্ছা, সে আমি দেখছি। ও মিথ্যে বলছে কিনা তার বিচার পরে করব; কিন্তু অন্তত তিরিশটা টাকা না দিলে তো—

কথাটার মাঝখানেই বড় মিঞা সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তুই হাত জোড় করিল। গোপীনাথ চোখ পাকাইয়া কিছু একটা বলিবার উপক্রম করিতেই একটা বিশৃঙ্খল উগ্র কোলাহল আসিয়া সমস্তটারই স্থর কাটিয়া দিল।

সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা বিক্ষুব্ধ জনতা। সর্বাগ্রে আধাবয়সী একজন মগ, তাহার কপালে প্রকাণ্ড একটা ক্ষত হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত নামিয়া আসিতেছে। গালের তুটি পাশ দিয়া, গলার খাঁজ বাহিয়া ময়লা ফতুয়াটার উপর ফোঁটায় ফোঁটায় থকথকে গাঢ় রক্ত টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। নোংরা বুনো চেহারা গালে মুখে পাতলা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রক্ত মাখিয়া মা তুর্গার মহিষাস্থরের মতো দেখাইতেছে।

গোপীনাথ বলিল, কী সর্বনাশ!

মণিমোহন চমকিয়া বলিল, কী হয়েছে? এমন করে কে মারলে!

লোকটা কোনো জবাব দিল না, তুর্বোধ্য ভাষায় কেবল বিড়বিড় করিয়া কী

বকিল খানিকটা। সঙ্গে যে সমস্ত মুসলমান আসিয়াছিল, সমবেত চীৎকারে তাহারা জানাইয়া দিল, মেরেছে হুজুর, মেরেছে।

—মেরেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি; কিন্তু কে মারলে?

অপরাধী দূরে ছিল না—জনতার সঙ্গেই সে আসিয়াছিল। অথবা জোর করিয়াই আনা হইয়াছিল তাহাকে। মণিমোহন প্রশ্ন করিবামাত্র তিন চারজন লোক তাহাকে হিড় হিড় করিয়া সামনে টানিয়া আনিল। সে তো প্রাণপণে গালাগালি করিতে লাগিলই, তা ছাড়া যাহাকে সুবিধা পাইল, সাধ্যমত আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিতে ত্রুটি করিল না।

সেদিকে চাহিতেই মণিমোহন স্তব্ধ হইয়া গেল।

যেন চারিদিকের এই অমার্জিত, অন্ধকারের রাজ্যে এক খণ্ড অঙ্গার কোথা হইতে ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আঠারো উনিশ বছর বয়সের একটি মগের মেয়ে। সুশ্রী ছিপছিপে দেহ, গায়ের রঙ্‌টি এই সোনার দেশে আসিয়াও মলিন হইয়া যায় নাই। যৌবনশ্রী যেন তাহার পূর্ণায়ত দেহ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—সেদিকে তাকাইলেও নেশা ধরিয়া যায়। তাহার দুইটি নীল চোখ প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলিতেছে—যেন দুই খণ্ড হীরার মধ্য হইতে বিষের একটা নীলাভ দ্যুতি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

বোকার মতো শুধু প্রশ্ন করিতে পারিল: এ কে?

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন আহত লোকটিকে দেখাইয়া বলিল, এর স্ত্রী।

—এর স্ত্রী! এমন রাজকন্যার স্বামী হইয়া বসিয়াছে ভালুকের মতো এই কদাকার লোকটা! আত্ম-সংবরণ করিয়া মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল: কিন্তু স্বামীকে এমন করে মারলে কেন?

মগের মেয়েটি এতক্ষণ পরে মণিমোহনের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ, কিন্তু সরল। মেয়েদের চোখের দৃষ্টিতে কেবল যে বাঁকা বিদ্যুৎই ঝলকিয়া যায় না—এই দৃষ্টিটা দেখিয়া সে কথাই মণিমোহনের মনে পড়িল। এ তরবারির মতো সোজা এবং শাণিত, কেবল দেখিতে চায় না, বিঁধিয়া ফেলিতে চায়।

সহজ কণ্ঠে, স্পষ্ট প্রাদেশিক বাংলায় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সদরের সরকারী লোক?

—হাঁ।

—তা হলে তোমার কাছেই বিচার চাই।

—বিচার! মণিমোহন বিস্মিত হইয়া বলিল, বেশ তো বলো।

মেয়েটি কথা না বলিয়া চারিদিকের জনতার দিকে একবার তাকাইল।

মণিমোহন তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল। মজাঃফর মিঞাকে ডাকিয়া সে বলিল, বড় মিঞা, এখান থেকে সব ভিড় সরাও—পরে তোমাদের ব্যাপার বুঝবো।

কৌতূহলী জনতার মধ্যে অসন্তোষের একটা গুঞ্জন কঠিল। অনেক আশা করিয়া তাহারা আসিয়াছে, এত সহজেই তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে! তা ছাড়া মেয়েটা যখন গোপনে আরজী করিতে চাহিতেছে, তখন গুরুতর ব্যাপার একটা কিছু আছেই।

গোপীনাথ চোখ পাকাইয়া বলিল, যাও—এখান থেকে যাও সব।

অতএব যাইতেই হইল। সরকারী কর্মচারী তো নয় সাক্ষাৎ হাকিম। ইচ্ছা করিলে যখন তখন সদর ঘুরাইয়া আনিতে পারে। তাহারা দূরে দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু একেবারে চলিয়া গেল না।

মণিমোহন গম্ভীর হইয়া কহিল, কী তোমার নালিশ?

আহত লোকটা কথার মাঝখানে একবার হাউমাউ করিয়া উঠিল—যেন কী একটা কথা তাহার বলিবার আছে; কিন্তু একটা বজ্র ধমকেই মেয়েটি তাহাকে দিল থামাইয়া।

—নালিশ? নালিশ অনেক আছে। ও আমার স্বামী বটে, কিন্তু দিনরাত মদ খায়। আমাকে যখন তখন মারে। কী একটা মেয়েমানুষ আছে, তার ওখানে রাত কাটিয়ে আসে। তুমি সরকারী লোক এসেছ বাবু, তুমিই এর বিচার করো। আজ তো কেবল ইঁট মেরেছি, এতে যদি শায়েস্তা না হয় তো একদিন দা দিয়ে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলব—এই বলে রাখছি।

মেয়েটির কথার তোড়ে যেন ঝড় বহিয়া গেল।

গোপীনাথ শিহরিয়া বলিল, বাপ্‌স্‌, সাক্ষাৎ জাত-গোখরোর বাচ্ছা!

রসিকতাটা মেয়েটি বুঝিতে পারিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাহার চোখ দুইটি তেমনি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

—করবে তো বাবু বিচার?

—করব বই কি। মণিমোহন একবার কাশিয়া ফরিয়াদী এবং আসামী স্বামীটির দিকে চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, এ যা বলছে, তা কি সত্যি?

ধমক খাইয়া লোকটা সেই যে চুপটি মারিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার মুখ খুলিল। আউ আউ করিয়া ভাঙা বাংলায় সে বলিল, না—না হুজুর, এ যা বলছে সব—

মেয়েটি আকস্মিকভাবে আবার গর্জিয়া উঠিল। বেচারী স্বামী যে ধমক খাইয়া শুধু থামিয়াই গেল তা নয়, ধপ করিয়া একেবারে মাটির উপরেই বসিয়া পড়িল, করুণা হয় লোকটার অবস্থা দেখিলে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' মনে পড়িল, যেখানে মেয়েরা পুরুষকে ধরিয়া সদর রাস্তায় ঠ্যাঙ্গাইতেছে। এ তো তাদেরই স্বজাতি!

—আবার মিথ্যে কথা বলছ! চুপ করে থাকো, একে বারে চুপ।

একেবারে চুপ করিয়াই সে রহিল। কপালের ক্ষতটা তাহার এমন বেশি নয়, সাধারণভাবে একটু চামড়া কাটিয়া গেছে মাত্র। হয়তো পাঁচ সাত দিন পরে আপনিই শুকাইয়া ঠিক হইয়া যাইবে; কিন্তু আপাতত এই মুহূর্তে সে যে স্ত্রীর ভয়েই বেশি কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়া সেটা বুঝিয়া নেওয়া কঠিন ছিল না।

তাহার হইয়া জবাব মেয়েটিই দিল। বলিল, ও আর কী বলবে বাবু, ওর বলবার কী আছে। আজ ওকে ইট মেরেছি, বাড়াবাড়ি করলে দা বসাব, সেইটেই বুঝিয়ে দিন।

মণিমোহন হাসিল।

—দা বসাবে? দা বসালে ফাঁসি হবে, জানো?

—ইঃ, ফাঁসি! মেয়েটির ভ্রূভঙ্গি যেন অদ্ভুত একটা রূপের ছটা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিল। দেখিয়া মনে হইল বাস্তবিকই ইহাকে ফাঁসি দিবার মতো দড়ি আজো সৃষ্টি হয় নাই।

মণিমোহন স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, যাও, কখনো আর এমন কোরো না। স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে মার খেতে হবে, এ তো জানাই আছে।

স্বামীটি গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাথা নাড়িল। যেন পরম ব্রহ্ম সম্পর্কিত একটা দার্শনিক তত্ত্ব এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

মেয়েটি এইবার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আরক্ত ক্ষুদ্র দুইটি ঠোঁটের ভিতর হইতে উজ্জ্বল কয়েকটি তীক্ষ্ণ দাঁত বাহির হইয়া আসিল। দেখিতে মনোরম, কিন্তু তাহার সহিত শ্বাপদের দাঁতের কোথাও একটা সামঞ্জস্য আছে হয়তো।

—আর তুমিও কখনো এমন করে মেরো না। হাজার হোক, স্বামী তো। লোকে কী বলবে?

—নিজের দোষে মার খেলে আমি কী করব? মেয়েটির মুখে হাসিটুকু আল্‌গা-ভাবে লাগিয়াই রহিল: তুমি বড় ভালোমানুষ সরকারী বাবু, ঠিক বিচার করতে জানো; কিন্তু গাঁয়ের লোকেই কেবল বুঝতে চায় না।

তাহার নীল চোখ দুটি এতক্ষণে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। বিষাক্ত হীরা নয়—যেন দুই খণ্ড নীলকান্ত মণি। সেই চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে মণিমোহনের দিকে তাকাইল।

গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তোদের দেশ কোথায়?

—বর্মা দেশ, মৌলমিন।

—এখানে কী করো?

মেয়েটির ভ্রূভঙ্গিতে বিরক্তি প্রকাশ পাইল।

—এখানে থাকি আর কী করব। জমি আছে, খামার আছে। —তারপর মণিমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, গাঁয়ের ভেতর যদি যাও তবে আমার ওখানে একবার যেয়ো না বাবু! আমার নাম মা-ফুন।

আহত লোকটার রক্তাক্ত মুখখানা মণিমোহনকে পীড়িত করিতেছিল। সে বলিল, আচ্ছা যাব। কিন্তু তার আগে তোমার স্বামীর মাথাটা ভালো করে ধুইয়ে দাও। যে ইট মেরেছ, বেচারা প্রাণে বেঁচে আছে এ ওর জোর কপাল।

—ইঃ, মরবে! ওর মরা এত সস্তা কিনা! মরলে আমাকে এমন করে কে জ্বালাবে? আচ্ছা, চললুম বাবু।

অভিবাদন জানাইয়া আর একবার সহাস্য কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় স্বামীকে টানিয়াই লইয়া গেল একরকম। কসাইখানার পথে মৃত্যুভীত পশুকে যেমন হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যায়, ভাবটা সেই জাতীয়।

গোপীনাথ জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দেখলেন হুজুর, কী চীজ একখানা! সাক্ষাৎ মগের মেয়ে তো। বাঘিনীর চাইতে কম নয়।

অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ সামনে নদীর দিকে চাহিয়া রহিল মণিমোহন! তারপর বড়ো করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হুঁঃ, ডাকো ওদের। বসে থাকলে তো চলবে না, আদায়ের বন্দোবস্ত যাহোক একটা করতে হবেই।

৩

চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল।

কিন্তু বিলের বুকে দু'টি চারটি বুনো-কল্‌মি ফুল ছাড়া সে বসন্তকে বুঝিবার জো নাই। অবশ্য মানুষের মনের কথা আলাদা। প্রাকৃতিক নিয়মে সমস্ত জীব-জগতেই যখন বসন্তের চেতনা প্রসারিত হইয়া পড়ে—তখন এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নয়। স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে তাহার রূপ ও রঙ বদলায় মাত্র।

বসন্তের বাতাসে যে চিরন্তন ক্ষুধাটা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার কোনো আকার নাই। ক্ষুধা হিসাবে সে সর্বজনীন, কিন্তু কোন্ পটভূমিতে সে যে কী রূপান্তর লইবে সেটা কেউ বলিতে পারে না। মঞ্জরিত বনস্থলীতে কস্তুরী-মৃগের গন্ধে তাহার যে ছায়াছবি রূপ পাইয়া ওঠে, অথবা নাগরিক জগতের আলো-ঝলসিত রাজপথে চকিত কটাক্ষের মধ্য দিয়া যে ভাবে সে ধরা দেয়—এখানে সে ভাবে তাকে খুঁজিয়া পাইবার জো নাই।

এখানকার বসন্ত আসে ঝড়ের সঙ্কেত লইয়া। ফাল্গুনের বৈকাল এখানে ভাঁট ফুলের গন্ধে মদির হইয়া ওঠে না, কাল বৈশাখীর তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে দিগন্তে কালো মেঘ ফেনার মত ফাঁপিয়া ওঠে। চঞ্চল-কটাক্ষের মধ্য দিয়া এখানে যে প্রেমের সূচনা হয়, প্রখর কামনার বিপ্লবের আঘাতে তাহার নিশ্চিত পরিণতি ঘটে।

পৃথিবীর সমস্ত রীতি-নীতি, সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলার বাহিরে এই চর ইস্মাইল।

তাই এখানকার মাটিতে কখনো সোনার ফসল দেখা যায় না; সৃষ্টির বীজ এখানকার গর্ভকোষের সংস্রবে আসিয়া অনাসৃষ্টিতে পল্লবিত হইয়া ওঠে।

* * * *

জোহান ভয় পাইয়াছিল যেমন, উত্তেজিত হইয়াছিল তেমনই। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলি কে ছুঁড়িয়াছে, সে-সম্বন্ধে সে একটা মোটামুটি আন্দাজ যে না করিয়াছিল তা নয়। রাগটা তাহার নানা কারণে বেশি হইয়াছিল ডি-সুজার উপরেই। ডি-সুজা যা ভাবিয়াছে তাহার চাইতে সে-যে অনেক বেশি বিপজ্জনক, সে-কথাটা বুঝাইয়া দিবার সময় হইয়াছে।

সুযোগ করিয়া একদিন লিসিকে লইয়া সে ভাসিয়া পড়িবে চিদাম্বরমে। তাহার এক খুড়া সেখানে মান্দ্রাজ সাউথ্ মারাঠা রেলোয়েতে ড্রাইভারী করে, সে সেখানে যা হোক একটা কিছু চাকরী-বাকরী জুটাইয়া দিবেই।

জোহান আসিয়া যখন লিসির দেখা পাইল, লিসি তখন একরাশ পেঁয়াজ লইয়া ছাড়াইতে বসিয়াছে। ডি-সুজা বাড়ীতে নাই, সম্ভবত সহরে গিয়াছে। অথবা কোথায় গিয়াছে জোহানের পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

জোহানের মুখের দিকে বাঁকা কটাক্ষ করিয়া লিসি বলিল, আবার এলে যে!

লিসির পাশে একটা ভাঙা টুলের উপরে জোহান বসিয়া পড়িল ধপ্ করিয়া। কাতোরক্তি করিয়া কহিল, নাঃ, আর পারা যায় না!

বিরল ভ্রূ-রেখাটাকে লিসি বাঁকাইবার চেষ্টা করিল, বলিল, কেন, কী হয়েছে?

—হয়েছে অনেক কিছুই। চলো, এখানে আর নয়। আমরা পালাই।

লিসি সত্যি সত্যিই চমকিয়া উঠিল, পালাব! কী বলছ জোহান? কোথায় পালাব?

জোহানের কণ্ঠস্বরে মরিয়া ভাব প্রকাশ পাইল : চিদাম্বরম্—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী। আমার এক কাকা আছে এম্-এস্-এম্ এর ড্রাইভার। সেই চাকরী জুটিয়ে দেবে। তা ছাড়া গোয়াতেও যেতে পারি, সেখানেও—

—ক্ষেপেছ তুমি?

মুহূর্তের জন্য লিসিকে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মনে হইল। সে জোহানের মুখের অত্যন্ত

কাছে মুখটা আনিয়া কী একটা ঘ্রাণ লইবার চেষ্টা করিল। ভোঁতা ছোট নাকটিকে বার কয়েক সুন্দরভাবে কুঁচকাইয়া স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করিল, কী ব্যাপার? আজ বুঝি আবার খানিকটা তাড়ি খেয়ে এসেছ?

—না লিসি, তাড়ি খাই নি। সত্যি বলছি—

একটা ঝট্‌কা মারিয়া লিসি তিন পা সরিয়া গেল। আধখানা কাঁচা পেঁয়াজ কচমচ করিয়া চিবাইতে চিবাইতে কুঞ্চিত মুখে মন্তব্য করিল, সত্যি তো তুমি চিরকালই বলে আসছ! তাড়ি খেলেই তোমার মুখ দিয়ে ভালো ভালো গস্‌পেল বেরোতে থাকে। যাও যাও, বোকো না এখন। আমার বিস্তর কাজ রয়েছে!

জোহান বিব্রত হইয়া বলিল, তাড়ি একটু খেয়েছি বটে, কিন্তু মেরীর নাম করে বলছি লিসি, আমার একটুও নেশা হয় নি। বড্ড দরকারী একটা কথার জন্যে তোমার কাছে এসেছি, রাগ কোরো না।

লিসির অবিশ্বাস গেল না, তবু একটু কাছে আগাইয়া আসিল সে। বলিল, হুঁ। তা দরকারী কথাটা কী, শুনি?

জোহান গলাটা নামাইয়া আনিল, বলিল, কাল বিলে হাঁস মারতে গিয়েছিলুম। জলে নেমেছি, এমন সময় দূরের থেকে দুম্ দুম্ করে কে দুটো গুলি ছুঁড়লে। একটা তো কানের ওপর দিয়ে গেছে। বেঁচে গেছি কেবল মেরীর দয়ায়।

লিসির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—কে গুলি ছুঁড়লে দেখতে পাও নি?

কী করে পাবো! প্রাণের ভয়ে আধ ঘণ্টা তো বিলের কাদার ভিতরেই ডুবে ছিলুম। উঠে আর কারো পাত্তা পাই নি।

শঙ্কিত মুখে ত্রস্ত গলায় লিসি বলল, এ নিশ্চয় ও ব্যাটার কাজ। ও তোমাকে সন্দেহ করেছে। ভালো চাও তো আজই এখান থেকে পালাও জোহান!

পালাবই তো আর সে জন্যে তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।

—কিন্তু আমি! আমি কী করে যাব!

জোহান মিনতি করিয়া কহিল, তুমি না গেলে কী করে চলবে লিসি! তোমার আশাতেই কোনো রকমে বেঁচে আছি। চলো, আজ রাত্রেই নৌকো করে—

জোহান!

দুই জনেই চমকিয়া উঠিল। চোখ পড়িতেই দেখিল দরজার কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ডি-সুজা। রাগে তাহার চোখ দুটি বাঘের মতো দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

ডি-স্থজা বলিল, নিষেধ করে দিয়েছি, তবু আমার বাড়ীতে তুমি কেন এসেছ! বেল্লিক, উল্লুক, ভল্লুক, শয়তান কোথাকার!

জোহান গরম হইয়া কহিল, গালাগালি কোরো না ঠাকুর্দা!

ডি-স্থজা ভ্যাঙচাইয়া কহিল, না, গালাগালি করবে না, আদর করে' চুমু খাবে! যাও, বেরোও আমার বাড়ী থেকে, হতভাগা, পাজী, শূয়োর গাধা—

জোহানের মাথার মধ্যে পর্তুগীজ রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া উঠিল। দুই পা সাম্‌নে আসিয়া সে বলিল; আবার গালাগালি করছ ঠাকুর্দা!

—গালাগালি! খুন করে ফেলব তোকে। ব্যাটা—বাপ মা সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া ডি-স্থজা অত্যন্ত কদর্যভাবে একটা গালি-বর্ষণ করিল।

জোহানের চোখের তারায় একটা হিংসার আলো চিক্‌চিক্ করিতে লাগিল।

—বেশি কথা কোয়ো না ঠাকুর্দা। জানো তুমি, ইচ্ছে করলে তোমাকে দশ বছরের মতো ঘানি টানিয়ে আনতে পারি?

—কী, কী বল্‌লি! ভয় এবং ক্রোধে ডি-স্থজার সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল: কী বললি তুই!

—যা বলছি তা সোজা কথা। হাঁ, পুরো দশ বছর! এর কমে যদি মেয়াদ হয় তো আমার নাম বদলে রেখো।

লিসি চমকিয়া বলিল, জোহান!

কিন্তু জোহানকে শয়তানে পাইয়াছিল। ডি-স্থজার সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যে একটা ভয়ংকর সংকেত ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা দেখিয়াও সে এতটুকু ভয় পাইল না। কহিল, বলব না, বলবই তো? চোরাই আফিঙের ব্যবসা করে লাল হয়ে উঠেছ ঠাকুর্দা—

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল ডি-স্থজা। আরাকানী রক্তমিশ্রিত তাহার তামাটে মুখ যেন একখণ্ড সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। এতক্ষণ ধরিয়া যেটা দ্বিধার মতো সামনে ভাসিতেছিল, সেটা আর দ্বিধা নাই; রহস্যের পাতলা স্বচ্ছ আবরণটা সরিয়া গিয়া বহু আশঙ্কার সেই নিদারুণ সত্যটাই প্রকাশ পাইয়া বসিয়াছে।

লিসি আবার বলিতে চাহিল, জোহান! কিন্তু ভয় আসিয়া তাহার গলায় এম্‌নি জাঁকিয়া বসিয়াছে যে অস্ফুট একটা আর্তনাদ ছাড়া আর কথা বাহির হইল না।

ডি-স্থজার চোখের সামনে দপ্ করিয়া সর্বপ্রথম বর্মিটার মুখখানা আসিয়াই দেখা দিল। অন্ধকার পর্দার উপরে যেমন ভাবে ছবি ফুটিয়া ওঠে—তেম্‌নি করিয়াই তাহার সেই বিকারহীন পাথুরে মুখখানা তাহার মনের সম্মুখে উঁকি মারিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদে চোখ দুইটা দিয়া একটি মাত্র ইঙ্গিতই বাহির হইতেছিল এবং সে ইঙ্গিত—

ফস্ করিয়া ডি-সুজা পা-জামার মধ্যে হাত পুরিয়া দিল এবং পরক্ষণেই হাতে করিয়া যা বাহির করিয়া আনিল, সে দিকে চাহিয়া জোহানের চোখ টোম্যাটোর মতো বড় বড় হইয়া উঠিল।

ডি-সুজার হাতের মধ্যে রিভলভারটা তখন অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কাঁপিতেছে।

জোহান রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, পিস্তল!

—হাঁ, পিস্তল। তোকে খুন করব আমি! ডি-সুজার কম্পিত তর্জনীটা কাঁপিতে কাঁপিতে ট্রিগারটাকে খুঁজিতে লাগিল।

চট্ করিয়া যেন চমক ভাঙিয়া গেল লিসির। বাঘের মতো একটা থাবা দিয়া সে ডি-সুজার হাত হইতে অস্ত্রটা ছিনাইয়া লইল। বলিল, ঠাকুর্দা, করছ কী! সত্যিই কি তুমি খুন করতে যাচ্ছ নাকি!

অস্ত্রটা লিসির হাতে নিরাপদ জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছে দেখিয়া বীরদর্পে সামনে অগ্রসর হইয়া আসিল জোহান। তারপর চোখের পলক না ফেলিতে সে ধাঁ করিয়া প্রকাণ্ড একটা ঘুষি বসাইয়া দিল ডি-সুজার মুখে।

—খুন করবে! খুন করা এতই সস্তা!

ঘুষি খাইয়া তিন পা পিছাইয়া গেল ডি-সুজা। তারপর আঘাতটাকে সহ্য করিয়া যখন সে চোখ মেলিয়া চাহিল, তখন জোহান অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কিন্তু ডি-সুজার দিকে চাহিয়া লিসির আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

—ঠাকুর্দা! ঠাকুর্দা!

ঠাকুর্দার নাক দিয়া তখন ঝর্ ঝর্ করিয়া তাজা রক্ত ঝরিতেছিল। তাহার সাদা গোঁফ জোড়াকে ভিজাইয়া সে রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়িতেছিল।

লিসি কহিল তোমাকে মারলে ও! তাহার মঙ্গোলীয়ান মুখখানা ঘিরিয়া বন্য ব্যাঘ্রীর হিংস্রতা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

ডি-সুজা কী একটা বলার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। দুই হাতে রক্তাক্ত নাকটা চাপিয়া ধরিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

সপ্তাহে একটি দিন চর ইস্‌মাইলে খুব বড় করিয়া হাট বসে।

চরের উত্তরে যেখানে তিনটি সরু খাল আঁকাবাঁকা বিসর্পিল রেখায় তিনদিক হইতে ঢুকিয়া এক জায়গায় আসিয়া একত্রে মিলিয়াছে এবং প্রচুর পলিমাটি ও বালি জমিয়া একটা উঁচু ডাঙার সৃষ্টি করিয়াছে, সেইখানেই গ্রামের হাঠ।

সব জায়গাতেই গ্রামের হাটখোলায় একটি না একটি বরোয়ারী দেবতার স্থান

দেখা যায়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হাটের মাঝখানে বড় গাজী কায়েমী হইয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে শুক্রবার দিন তাঁহার 'শিরণী' হয়। গাজী, দক্ষিণরায়, কালুরায় ও বনবিবি, এই চারটি দেবতা বা অর্ধ-দেবতা মিলিয়া আজও অপ্রতিহত প্রতাপে নিম্ন-বঙ্গ শাসন করিতেছেন ; শিব, কালী, পীর সকলকে ছাড়াইয়াই ইহাদের সম্মান।

গাজীতলার চারপাশ ঘিরিয়া হাট বসিয়াছে। ছোট ছোট খালগুলি ডিঙি নৌকায় বোঝাই। যে সমস্ত বড় নৌকা খাল দিয়া আসিতে পারে না, ছোট ডিঙি নামাইয়া দিয়া তাহারা হাট করিতে আসিতেছে।

রাধানাথকে সঙ্গে করিয়া বলরাম হাটে আসিলেন।

কাজটা বলরামের নয়। তিনি সৌখীন মানুষ, এ সব ঝুঁকি পোয়ানো তাঁহার স্বভাবের বাহিরে। তবু আজ নিজেই আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাধানাথ ইহাতে খুশি হয় নাই, লাভের মধ্যে তাহার সাপ্তাহিক বরাদ্দটাই মারা পড়িল।

কাছাকাছি কোথাও তাঁতিদের গ্রাম আছে একটা। প্রত্যেক হাটবারে তাহারা নানারকমের শাড়ী-গামছা এই সব বিক্রী করিতে আনে। বলরাম সেগুলি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন।

রাধানাথ বলিল, বাবু, মাছটা আগে না কিনলে—

—হবে এখন দাঁড়া, দাঁড়া—

তাঁতিদের দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দড়ির উপর আটদশ খানা শাড়ী ঝুলিতেছিল। একখানা বলরামের ভারী পছন্দ হইয়া গেল। ময়ূরকণ্ঠী রঙ—চিকচিকে রোদ লাগিয়া তাহার জেল্লা যেন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। গৌরাঙ্গী মেয়ের গায়ে তাহা কী রকম মানাইবে ভাবিয়া বলরাম মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁতের কাপড় বলিয়াই ঠাস্-বুনানী নয়, সেই জন্য অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলিয়া মনে হয়। তনুদেহের লাবণ্য তাহাতে ঢাকা পড়ে না—বরং মাঝে মাঝে অঙ্গের অস্ফুট আভাস দিয়া আরো মাতাল করিয়া তোলে।

আচ্ছা, মুক্তোকে কেমন মানাইবে? অবশ্য মুক্তোকে খুব ফর্সা বলা চলে না, তা ছাড়া নোনার দেশে আসিয়া তাহার রঙ যেন ময়লাই হইয়াছে আর একটু। তবু ভালোই দেখাইবে তাহাকে। মুক্তোর সুগঠিত দেহটা বলরামের মনশ্চক্ষুর উপর দিয়া ভাসিয়া গেল।

বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, শাড়ীর দাম কত হে?

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই যে সন্ধ্যা হইয়া বসিবে, ইহা তো জানা কথা। সেটা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন কোথা হইতে হরিদাস আসিয়া জুটিলেন!

—কি হে, শাড়ী কেনা হচ্ছে নাকি ?

কবিরাজ চমকিয়া তাকাইলেন। তারপর হরিদাসের বাঁকা হাসি বিচ্ছুরিত মুখখানার দিকে চাহিয়া ঠোঁটটাকে একবার চাটিয়া লইলেন। তড়িতস্বরে কহিলেন, কে, কে বলছে আমি শাড়ী কিনছি ? একখানা গামছা কেনবার জন্যে—

ময়ূরকণ্ঠী-রঙ শাড়ীখানার ওপরে আঙুল রাখিয়া হরিদাস বলিলেন, গামছা ; কিন্তু এখানাকে ঠিক গামছা বলে তো মনে হচ্ছে না ভায়া। কি হে জোলার পো, এ তোমাদের কোন্ নতুন ফ্যাশানের গামছা আমদানি করেছ ?

রসিকতা উপভোগ করিয়া জোলার পো মৃদু হসিল। এক জোড়া কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁক হইতে তিনটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এঁজ্ঞে না, ওখানা গামছা নয় —শাড়ীই।

—বটে, বটে ? কবিরাজের চোখে তা হলে চাল্‌সে ধরেছে আজকাল। গামছা আর শাড়ীর তফাৎ বুঝতে পারো না ?

মনে মনে দাঁত খিঁচাইয়া প্রকাশ্যে কবিরাজ অসহায় স্বরে কহিলেন, যাও—যাও।

—যাও মানে ? এই গাজীতলায় দাঁড়িয়ে এম্‌নি মিথ্যে বলছ ভায়া, কাজটা কি ভালো হচ্ছে ? একটু সাজগোজ করানোর ইচ্ছে মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে—সেটাকে গোপন করে কী লাভ ?

বলরামের নির্বিরোধ শান্ত মূর্তিটির তলা হইতে যেন একটা আগ্নেয়গিরি ফুটিয়া বাহির হইল। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা থাকিতে আছে।

—থামো, থামো ঢের হয়েছে। তোমার মতো অসভ্য ছোটলোক আমি আর দুটো দেখি নি।

—ওরে বাস্ রে! থুৎনির নীচে হাত রাখিয়া হাঁ করিয়া হরিদাস বলরামের দিকে চাহিলেন।

—হাঁ—হাঁ। যেন ইয়ে একটা—

বলরাম কথাটা শেষ করিলেন না—বোধ হয় শেষ করিবার মতো কিছু একটা পাইলেন না বলিয়াই। শুধু রাধানাথের হাতটা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাধানাথ একটা হোঁচট খাইল, একটা বেগুনের ঝুড়ি উল্টাইয়া পড়িল এবং দোকানদার অশ্রাব্য গালাগালি সুরু করিল। পোস্টমাস্টার বাঁ হাতে একটা তুড়ি বাজাইয়া সজোরে কহিলেন, দুর্গা-দুর্গা।

রাধানাথকে টানিতে টানিতে বলরাম প্রায় খালের কাছে আনিয়া ফেলিলেন।

রাধানাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন বাবু! মাছ কিনতে হবে না ? আর দেরী হলে তো—

—মাছ—মাছ! ব্যাটার আছেই তো কেবল খাই খাই। হরিদাসের বেলায় যে দাঁত খিচুনিটা মনে মনে আত্মগোপন করিয়াছিল, রাধানাথের ক্ষেত্রে সেটা আর অপ্রকাশ রহিল না।

রাধানাথ সংকুচিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, আমার নিজের জন্যে নয়, দিদিমণি বলেছিলেন বোয়াল মাছের কথা—তা নিকটে অ্যাই রাক্ষুসে বোয়াল উঠেছে দেখলুম তাই—

—দিদিমণি! রাধানাথকে কথাটাও আর শেষ করিতে হইল না: তবে এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলি, শুনি? কাজে ফাঁকি দিতে পারলে আর কথা নেই। যা, যা, এক্ষুণি যা, দৌড়ে—

হরিদাস ততক্ষণে জোলার পোর সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছেন। —ঢাকায় গেছ কখনো, ঢাকায়?

বিনীত হাসির সঙ্গে বিনীততর প্রত্যুত্তর আসিল, আজ্ঞে না।

—তবে বুঝতে পারবে না। ঢাকাই মস্‌লিন্ সে যে-সে ব্যাপার নয়। আমি তখন মানিকগঞ্জে থাকি। সেখানকার একজিবিশনে এক তাঁতি একবার একটা আমের আঁটির ভেতর পুরো বিশ গজী এক থান মসলিন পুরে নিয়ে এসেছিল! সে কী সূক্ষ্ম কারবার। তাই দেখে লাট সাহেব নিজে তিন মিনিট ধরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন—হুঁ, হুঁ! একজিবিশন বোঝো তো!

—হেঁ—হেঁ তা আজ্ঞে বসুন না, একছিলিম তামাক সেজে দিই।

৪

[মনিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"বাড়ীর পত্র পাইলাম। পোস্টমাস্টার মশাই ভদ্রতা করিয়া নিজের লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। বেশ সৌজন্য আছে। তা ছাড়া ওঁর চরিত্রে কতকগুলি বিচিত্র অভিনবত্বের সমাবেশ দেখিতে পাই। সাধারণত্বের মধ্যে সেগুলিকে আসাধারণ বলা যাইতে পারে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যেন কুশ্রী চেহারার একটা অশোভন মলাট দিয়া ভিতরের অনেকখানি গভীর রহস্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন লোকটি। এক একদিন সেই রহস্যটাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিবার জন্য কৌতূহল জাগে।…

……কিন্তু আর কতদিন কালুপাড়ায় থাকিতে হইবে জানি না। আদায়ের দিক দিয়া কতকটা সুবিধা হইবে তা-ও বুঝিতেছি না। সবাই মজাঃফর মিঞার দলে ভিড়িয়াছে। দুর্বৎসর কিনা জানি না, কিন্তু দুর্বুদ্ধির পরিচয় পাইতেছি।…

বাড়ীর চিঠিতে রাণী অনেক করিয়া মিনতি করিয়াছে। এমন ভাবে বিদেশে পড়িয়া থাকার কী সার্থকতা আছে? দেশে যে জমিজমা আছে তাহার দেখাশুনা করিলেও তো মোটা ভাত-কাপড় একরকম চলিয়া যায় তবে এই সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য এমন একটা অনাত্মীয় সুদূর জগতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া কী লাভ?

একথা আমি অনেকবার ভাবিয়াছি। এখনও যে না ভাবি তা-ও নয়; কিন্তু জীবন সম্বন্ধে আর একটা যেন দার্শনিক দৃষ্টি খুলিতেছে। অনেকদিন পরে মনের মধ্যে এই সংশয়টাই মাথা চাড়া দিয়াছে যে, যেটাকে আমরা এতদিন পরিণতি বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেটাই ঠিক পরিণতি কি না। জীবনের যে সভ্য, মার্জিত পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে আমরা বাস করি, তাহার উল্টা পিঠে দেখিবার মতো কি কিছুই নাই!

কে বলিবে নাই। জীবন যে কতখানি নগ্ন ও অসংকোচ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, এখন তো তাহাই দেখিতেছি। এতদিন নগ্নতাকে অবিমিশ্র মন্দ বলিয়াই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আজ কিন্তু তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়।

আমাদের গ্রামের বাড়ীতে—যেখানে সন্ধ্যা আসিতে না আসিতে তুলসীতলায় প্রদীপ জলিয়া ওঠে—শংখের শব্দে আকাশ মুখর হয়, ভাঁট ফুলের গন্ধে গ্রামের বাঁশ-ঝাড়-ঢাকা নির্জন মেটে পথখানি মদির হইয়া যায়, সেখানে জীবনের পরিধি কতটুকু! ওই মেটে পথটা ধরিয়া হাঁটিতে সুরু করিলে গ্রামের ছোট বাজারটি—তারপর আরো একটু অগ্রসর হইলে কালো কাঁকর-পাতা প্ল্যাটফর্ম—টিনের শেড্ দেওয়া ছোট্ট স্টেশন—তারপর ডেলি-প্যাসেঞ্জারী। সন্ধ্যায় ওই পথটি দিয়া যে ফিরিয়া আসে, ধূপের গন্ধ-ভরা ছোট্ট একখানি ঘরে রাণীর মুখখানা ছাড়া সে আর কী কল্পনা করিতে পারে!

কিন্তু এখানকার প্রকৃতি অমার্জিত—এখানে মানুষ নদী আর সমুদ্রের সমস্ত রুদ্রতার সহিত মুখোমুখি সংগ্রাম করিয়াই টিকিয়া আছে। ছোট ঘরের সীমানায় ছোট এতটুকু প্রেম কি এখানে মানাইত? সমস্ত নীতি, সমস্ত শৃঙ্খলাকে ভাঙিয়া যে বর্বর যৌবন এখানে মুক্তি পাইয়াছে, স্বামীর মাথা ইটের ঘায়ে ভাঙিয়া দিয়াই তাহা পটভূমির মর্যাদা রাখে!

জীবনের কোন্ রূপটা যে ভালো, আজ যেন সেটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

* * * *

বর্মিটা হাসিতেছিল।

হাসিটা অবশ্য তাহার স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। তাই পাথরের মতো কঠিন মুখ হইতে যে হাসিটা বাহির হইতেছিল, তাহা কৌতুকে ক্রূর এবং অনেকটা নৃশংস বলিয়াই মনে হইতেছিল।

অবশ্য তাহার হাসির স্বরূপ বুঝিবার জন্য ডি-সুজার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। সে গঞ্জালেসের গুণ-গান করিতেছিল, লিসির জন্য এমনি সুপাত্র অন্যত্র দুর্লভ। তাহাদের পূর্ব পুরুষের গৌরব-কীর্তি কে-না জানে। বাহুবলে তাহা সমগ্র দেশ জয় করিয়াছে, আগুন লাগাইয়াছে, লুঠ-তরাজের সাহায্যে পৌরুষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। জোর করিয়া "জেন্টুর"—দের রূপসী মেয়েবউ ছিনাইয়া আনিয়া অঙ্কশায়িনী করিয়াছে। তাহারা যদি বীর না হয় তো, বীর কে? শুনিয়া বর্মিটার হাসি হঠাৎ থামিয়া গেল।

—তোমাদের ভেতর এটাই কী মস্ত বীরত্বের কথা নাকি?

কোনটা? বর্মির প্রশ্নটা ডি-সুজার কানে কেমন বিচিত্র রকমে অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল যেন। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন কিছু একটা আবিষ্কার করিতে চাহিল।

—এই মেয়েমানুষ চুরি করে নিয়ে যাওয়াটা?—পাথর বাঁধানো মুখের ভিতর হইতে সামান্য একটু ফাঁক দিয়া আবার এক ঝলক কৌতুকের হাসি পিছলাইয়া পড়িল।

ডি-সুজা অপ্রতিভ বোধ করিল একটু। মনে হইল কথা না কহিলেই বোধ হয় ভালো হইত। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কলাই-করা দুইটা এনামেলের কাপে লিসি চা লইয়া আসিল।

ডি-সুজার বাড়ীর ভিতরের আঙনটিকে বেশ ভালোই বলিতে হইবে। সুপারি আর নারিকেলের ছায়া নত হইয়া পড়িয়া সেখানে একটা কুঞ্জ রচনা করিয়াছে। এলোমেলো পাতার ফাঁকে খানিকটা রোদ আসিয়া লিসির মঙ্গোলিয়ান মুখের উপর পড়িল।

বর্মিটা সেইদিকে চাহিল। চাহিল স্থির বিকারহীন দৃষ্টিতেই। কিন্তু আজ যেন কী এক মন্ত্রবলে নতুন করিয়া চোখ খুলিয়া গেছে ডি-সুজার। তাহার মনে হইল বর্মির নীরব গাম্ভীর্যের তলা হইতে সাপের মতো প্রলোভনের একটা গুপ্ত ফণা মাথা তুলিতেছে। সে নিজে অনিন্দ্যচরিত্রের লোক নয়, মানব মনের অন্ধকার জগৎটার কোনো রহস্যই অপরিচিত নাই তাহার; বর্মির লোলুপ দৃষ্টিটার মধ্যে তাহার বিগত পাশব যৌবন যেন ছায়া ফেলিয়া গেল।

লিসি চায়ের বাটিটা রাখিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সে সেদিকে যে চাহিয়া রহিল, রহিলই। ডি-সুজার অত্যন্ত অস্বস্তি লাগিতে লাগিল।

—তোমরা এখান থেকে কবে যাচ্ছ?

বর্মি মুখ ফিরাইল। তাহার সমস্ত অবয়বে আবার সেই অবিচল কঠিনতা: তোমার কাছ থেকে হিসাবটা পেলেই চলে যাব। সব চালান হয়ে গেছে?

—না, তিন সের বাকী আছে এখনো। পুলিশের বড় কড়াকড়ি এবার। তা

ছাড়া জোহানের জন্যও বড্ড ভাবনায় পড়েছি। শহরে এখনো যায় নি বটে কিন্তু যখন-তখন খবর দিয়ে দিতে পারে। তা হলে তো সব শুদ্ধ—

—আচ্ছা, সে ভাবনা ভাবতে হবে না। যা বলেছি তা মনে আছে তো?

—তা আছে। কিন্তু—ডি-সুজা অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্তভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল, একটু বেশি হয়ে যাবে নাকি? একেবারে—

বর্মির মুখ হইতে সোনা-বাঁধানো দাঁত দুইটা যেন ছিট্‌কাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

—বেশি? বেশি কিছুতেই হয় না। সেদিনের টোটা দুটো নেহাৎই বাজে খরচ হয়েছে; নইলে আজ্‌কে আবার এই নতুন খাটুনির দরকার হত না।

—তা বটে।—ডি-সুজাকে অত্যন্ত ম্লান দেখাইল।

—তোমার নাত্‌নী রাজী হয়েছে তো?

এই লোকটার মুখে লিসির কথা শুনিয়া মনটা যেন প্রসন্ন হইয়া ওঠে না। তবু ডি-সুজা কহিল, হুঁ। রাজী না হয়ে কী করবে? তবে সবটা বলা হয় নি—এতখানি শুনলে হয়তো বা—

—যাই বলো, তোমার নাত্‌নীটি কিন্তু দেখতে ভালো। ওসব গঞ্জালেস্-টঞ্জালেসের চেয়ে—কথাটার মাঝখানেই কী ভাবিয়া সে থামিয়া গেল।

ডি-সুজার মুখ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল: গঞ্জালেসের চেয়ে কি?

—না কিছু নয়। কিন্তু তোমাদের পর্তুগীজদের বীরত্বটা কিন্তু ভারি চমৎকার। যে যত মেয়ে চুরি করে আনতে পারে, সে তত বড় বীর—বাঃ!

ডি-সুজা গম্ভীর হইয়া রহিল।

—আচ্ছা, আমি চললুম। পরশু দিনের কথা মনে থাকবে?

—থাকবে। তার আগে গাজী সাহেবের কাছে যেতে হবে।

—হুঁ।

অভিবাদন জানাইয়া সে বাহির হইবার উপক্রম করিল; কিন্তু দরজার মুখে একবারটি থামিয়া দাঁড়াইল। একরাশ পেঁয়াজ-কলি লইয়া লিসি ভিতরে আসিতেছে।

লিসির দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া সে মৃদুভাবে একটা শিস দিল, তারপর চুরুট ধরাইয়া বড় বড় পা ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

রোজকার মতো সকালের ডাক আসিয়াছিল।

কেরামদ্দি মেল ব্যাগগুলি কাটিতে প্রথমেই একখানা লম্বা খাম ঠক্‌ করিয়া একেবারে পোস্টমাস্টারের কোলের কাছে আসিয়া পড়িল।

অফিসের খাম। পোস্টমাস্টার ব্যগ্র হাতে খুলিয়া দেখিলেন, যা ভাবিয়াছেন—ঠিক তাই। পোস্ট্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মানুষটা তা হইলে নিতান্ত খারাপ নয়। বরিশাল হইয়া যাওয়ার পথে লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইতে হইবে।

—ছুটির অর্ডার এসেছে রে কেরামদ্দি।—পোস্টমাস্টারের মুখ চোখ হইতে আনন্দ উছলাইয়া পড়িতেছিল, কণ্ঠস্বরে সেটা আর চাপা রহিল না।

—ছুটি! দরখাস্ত করেছিলেন বাবু?

কেরামদ্দি যেমন বিস্ময়, তেমনই ব্যথা অনুভব করিল। এই কুশ্রী দর্শন বিগত-যৌবন ছন্নছাড়া লোকটার উপর তাহার যে কেন এতটাই মায়া বসিয়া গেছে কে জানে।

—হাঁ, হাঁ—দরখাস্ত করেছিলুম বই কি। নইলে আবার কোন্ সম্বন্ধীটা আছে যে আগ বাড়িয়ে ছুটি দিতে আসবে? হুঁ হুঁ—তিন মাসের—সোজা ব্যাপারটি তো নয়।

—তিন মাসের! বেদনায় অত্যন্ত ম্লান হইয়া কয়েক মুহূর্ত কেরামদ্দি চুপ করিয়া রহিল। এই চর ইস্‌মাইল তাহারও নিজের দেশ নয়, এখানকার কাহারো সঙ্গে সে যে নিজের ভাষা বা মনের ছন্দটাকে সমানভাবে মিলাইতে পারে তাহাও নয়। পোস্টমাস্টারের সাহচর্যেই এখানে একরকম তাহার দিন কাটিয়া যায়। সেই জন্য সে এত আহত বোধ করিল যে কিছুক্ষণ কোনো কথাই খুঁজিয়া পাইল না। বরং ক্ষণিকের জন্য মনে হইল, তাহার প্রতি মাস্টারবাবুর কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই, নতুবা তাহাকে আদৌ না জানাইয়া তিনি এমন একটা ছুটির দরখাস্ত করিয়া বসিলেন কী বলিয়া?

নত মস্তকে চিঠি সর্ট করিতে করিতে হঠাৎ সে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে—তা হলে—আফিসের কাজ কী করে চলবে বাবু?

বন্যার মতো অজস্র ধারায় পোস্টমাস্টার হাসিয়া উঠিলেন: শোনো কথা, কাজ কী করে চলবে? আরে, আমি ছুটি নিলুম বলেই কী সরকারী কাজ বন্ধ থাকবে? রিলিফ আসবে—রিলিফ। কাল পরশুর মধ্যেই এসে পড়বে।

—ওঃ। কেরামদ্দি আবার চিঠি পত্রের মধ্যে তলাইয়া গেল।

পোস্টমাস্টার একান্ত প্রসন্ন স্বরে কহিলেন, সত্যি ব্যাটারা এবারে ছুটি না দিলে রিজাইন্ দিতুম ঠিক। কাঁহাতক আর পারা যায়? কিছুদিন থেকেই মন চঞ্চল হয়ে উঠছে—কেবল ভাবছি ছুটে বেরিয়ে পড়ি। যাক্!

—তা হলে এখন বাড়ীই যাবেন তো বাবু?

—বাড়ী!—হরিদাস এমন ভাবে কথাটা কহিলেন যে এতবড় একটা অসম্ভব

ধারণা কাহারো কল্পনায় আসাটাই অসঙ্গত ব্যাপার: বাড়ী! বাড়ী কোথায় যে যাব?

—সে কি বাবু। তিন বছর বাদে একবার ছুটি নিলেন—ছেলেমেয়ে রয়েছে—

—ব্যাস্ ব্যাস্! ছেলেমেয়ে রয়েছে তো সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল আর কি! আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, ওই কাকের বাচ্ছাগুলো পিণ্ডি দেবে, এই আশংকায় আমার বাপ-ঠাকুরদা গয়ার প্রেত-শিলা থেকে মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে পালাচ্ছেন।

কথাটার অর্থ না বুঝিলেও ভাব গ্রহণ করিতে কেরামদ্দির অসুবিধা হইল না। সে বিস্ফারিত চোখে কহিল, আপনার মনটা কি পাথর দিয়ে তৈরী বাবু? গোরু ছাগলেও নিজের বাচ্ছাকাচ্ছাকে ভালবাসে, আর আপনি—

অসমাপ্ত কথাটাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া পোস্টমাস্টার বলিলেন, আর আমি গরু-ছাগল নই বলেই ওদের চাইতে আমার বুদ্ধি একটু বেশি। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—অ্যাঁ! যে রাস্কেল্টা লিখেছিল, তাকে একবার হাতের কাছে পেলে দেখে নিতুম।

—তা হলে কোথায় যাবেন, বাবু?

—কোথায়? হরিদাসকে চিন্তিত দেখাইল: এখনো ঠিক করি নি। হয়তো কাশ্মীর যেতে পারি—ভূ-স্বর্গ বলে তাকে। হাউস্ বোটে করে ডাল্ হ্রদে ঘুরে বেড়াব। উলার হ্রদ থেকে পদ্ম তুলে আনব। শ্রীনগর—the Venice of the East! আর নয়তো বা তিব্বতেও একবার ঘুরে আসা যায়। লামার দেশ—হাজার হাজার বছর ধ'রে এভারেস্টের ঠাণ্ডা ছায়ার নীচে মানুষ যেখানে মড়ার মতো ঘুমিয়ে আছে।...

পোস্টমাস্টারের আবিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া কেরামদ্দি চুপ করিয়া গেল।

পূর্ণিমার দিনে জোয়ারের জল একটু বেশি করিয়াই আসিয়াছে। অন্যান্য দিন ওই কাদা-মাখা তীরটাকে ডুবাইয়া দিয়াই সে খুশি থাকে, আজ কিন্তু পৌঁছিয়াছে সামনের মাঠটার একবারে উঁচু ডাঙাটা পর্যন্ত। বাঁ-পাশের খালটা অনেকখানি ভরিয়া উঠিয়াছে, চেষ্টা চরিত্র করিলে বজরাটাকে একেবারে গ্রামের মধ্য পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন নয়।

বজরাটা জলের সঙ্গে অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। নোঙরের পাকানো মস্ত নারিকেলের দড়িটাতে টান পড়িয়াছে। একটা কাঠের সিঁড়ি নামাইয়া দিতে সেইটা বাহিয়া মণিমোহন একেবারে তীরে আসিয়া পৌঁছিল। গ্রামের দিক হইতে একটু বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয় না।—আসবে নাকি গোপীনাথ?

গোপীনাথ ততক্ষণে বজরার সাম্‌নে একটা কাঠের চৌপাই টানিয়া লইয়া বসিয়াছিল। মাঝিরা মজাঃফর মিঞার উপহৃত মুরগী দুইটার পালক ছাড়াইতেছে। অমসৃণ লাল্‌চে চামড়ায় ঢাকা পাখী-দুটির পরিপুষ্ট নধর-শরীরের দিকে গোপীনাথের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ। একটুখানি ভালো দুধ কিংবা দই যোগাড় করিতে পারিলে ইহাদের একটাকে দিয়া কী চমৎকার স্টু্ তৈরী করা যাইবে—মনে মনে সে তাহারই গবেষণা করিতেছিল।

মণিমোহনের প্রশ্নের উত্তরে ব্যস্ত চোখ ফিরাইয়া একবার সে তাকাইল মাত্র। তারপর বড় মুরগীটার ঠ্যাঙ্ দিয়া বিশেষ কোন একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না, সে সম্পর্কে নিবিড় ভাবে চিন্তা করিতে করিতে উত্তর দিল, আপনি ঘুরে আসুন বাবু। আমি একটু এখানে দেখছি—মুরগীটা ভালো করে বানাতে হবে তো?

—ও, এখন থেকেই জিভে জল পড়ছে বুঝি? ছেড়ে উঠতে পারছো না? আচ্ছা থাকো—মণিমোহন হাসিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মাঠ—কিন্তু তৃণ রোমাঞ্চিত নয়। অগোছালো জঙ্গল, মাটিতে কোথাও কোথাও কাদার আভাস। এখানে ওখানে দুই চারিটা জোঁক লি-লি করে। পশ্চিমবঙ্গের শ্যামল প্রান্তর এই পলি মাটি আর নোনা-ধরা বালির দেশে আসিয়া রিক্ততার নগ্ন শ্রী ধরিয়াছে।

চলিতে চলিতে সে গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িল। যেমন হইয়া থাকে, পূর্ববঙ্গের গ্রামের কোনো ঘন-বিন্যস্ত রূপ নাই। বাড়ী, বাগান গোটা দুই তিন শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক পুকুর—সেগুলিতে প্রচুর পাতি হাঁস চরিতেছে। আশে পাশে দুটো একটা ছাড়া-ভিটা এবং সবটা মিলিয়া এক ধরণের ছায়াচ্ছন্ন স্বতন্ত্রতা অনেকটা জুড়িয়া বিরাজ করে। এ-বাড়ীর সঙ্গে ও বাড়ীর যোগসূত্রটা অনেকখানি গৌণ বলিয়াই বোধ হয়, যাতায়াতের পথটা তেমন অনুকূল নয়। আধভাঙা কাঠের বা বাঁশের 'চার' পার হইয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নালা ডিঙাইয়া চলিতে হয়। পরিচ্ছন্ন অঙ্গনে স্তূপাকারে ধান ও খড়ের পালা, দুটি একটি গোরু-মহিষ এবং চরিয়া বেড়ানো ছোট বড় অসংখ্য মুরগীই এ সমস্ত গ্রামের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

গ্রামের মধ্য দিয়া মণিমোহন চলিতে লাগিল। দেখিবার কিছুই নাই। বসিয়া খাইবার জো নাই, পুরুষেরা বেশির ভাগই সকাল বেলা নৌকা লইয়া "চরে" কাজ করিতে গিয়াছে, জেলেরা গিয়াছে বেড়াজালে মাছ মারিতে। গ্রাম জুড়িয়া এখন মেয়েদেরই আধিপত্য। সন্ধ্যার সময় পুরুষগুলি ফিরিবে, তাই সারাটা দিন তাহাদের ঢেঁকি চালানো, ধান গুছানো, আরো দশটি খুঁটিনাটি কাজ এবং অশ্রান্ত গাল-গল্পের মধ্য দিয়াই কাটিয়া যায়। কেহ ছেলেকে স্নান করায়—অপরিচিত লোক দেখিয়া

হঠাৎ গায়ে-বুকে কাপড় টানিয়া সংযত হইতে চায়। কেহ বা কালো শাড়ীর লম্বা ঘোমটার ভিতরে রূপার নথটার মধ্যে আঙুল পুরিয়া দিয়া কৌতুহলী চোখে চাহিয়া থাকে।

দু' একজন পুরুষের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হইয়া গেল তাহারা সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইল। কেউ কেউ বা একান্ত বিনীত হইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ বেড়াতে এসেছেন না কি হুজুর ?

মণিমোহন মাথা নাড়িয়া তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিল। তাহার মন তখন লক্ষ্যহারা হইয়া কোথা হইতে কোথায় যেন ভাসিয়া চলিতেছে। নদীর বুক হইতে জাগিয়া ওঠা নতুন মাটি—নতুন উপনিবেশ। ঠিক পুরানো পৃথিবীর মতো করিয়াই মানুষ এখানে ঘর বাঁধিয়াছে ; কিন্তু দেখিয়া যা মনে হয়, সত্যি সত্যিই তার সঙ্গে কত ব্যবধান রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রথম যুগের মতো গলিত ধাতুপাত্রের উপর শীতল একটা আস্তরণ পড়িয়াছে মাত্র, কিন্তু বুকের মাঝখানে অসংযমের তরল উত্তপ্ত বস্তুটা টগবগ করিয়া ক্রমাগতই ফুটিতেছে। যখন একটা বিশেষ উপলক্ষ বা ছিদ্র ধরিয়া তাহা বাহির হইয়া আসে তখনি বোঝা যায়—যা দেখা যাইতেছে সেইটাই সত্য নয়।

—এই যে সরকারীবাবু !

সরকারীবাবুটিকে চকিত হইয়া থামিয়া পড়িতে হইল। কোথা হইতে সেই বর্মী মেয়েটি সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা ছোট গামছায় বাঁধা একরাশ মুরগীর ডিম। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝক্‌মকে মুক্তার মতো দাঁতগুলিকে বিকশিত করিয়া সে কহিল, আমাকে চিনতে পারছ না ? সেই যে সেদিন তোমার দরবারে আসামী হয়েছিলুম—আমার নাম মা-ফুন।

চোখ দুটি বড়ো বড়ো করিয়া মণিমোহন সকৌতুকে বলিল, চিন্‌তে আবার পারব না ? যে ইঁট মেরেছিলে সেদিন—আর একটু হলেই—

—সত্যিই ?—ঝর্ণার মতো কলচ্ছন্দে মেয়েটা হাসিয়া উঠিল ঃ আস্তে মেরেছিলুম বলেই বেঁচে গেছে। ইচ্ছে করলে একেবারেই দিতে পার্‌তুম ঠাণ্ডা করে।

—তা অস্বীকার করছি না ; কিন্তু তোমার স্বামীর মাথার ঘা সেরেছে তো ?

—সারবে না ?—মা-ফুন ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, মাসের মধ্যে তিনবারই ও এরকম মার খায় যে। পড়ে থাকবার জো আছে নাকি ? তা হলে আর খেতে হবে না।

মাসের মধ্যে তিনবার ! লোকটির জায়গায় নিজেকে একবার কল্পনা করিয়াই আতঙ্কে মণিমোহন শিহরিয়া উঠিল।

—এদিকে কোথায় এসেছিলে বাবু ?

জাতে বর্মী বা যাহাই হউক এবং স্বামীকে নির্মমভাবে প্রহার করিতে যতই অভ্যস্ত হউক, ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের এই নিরিবিলি পটভূমিতে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব সুন্দরী বিদেশিনী যুবতীটির সঙ্গে গল্প করিতে মণিমোহনের নেহাৎ মন্দ লাগিতেছিল না। চাঁপার কুঁড়ির মতো সুঠাম কয়েকটি আঙুল গালে রাখিয়া আয়ত জিজ্ঞাসু চোখে সে চাহিয়া আছে, ওই চোখ, ওই আঙুল দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে যে কথায় কথায় একখান থান ইট তুলিয়া সে যখন তখন ধাঁই করিয়া মারিয়া দিতে পারে!

মণিমোহন বলিল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

—সত্যিই? মেয়েটা মৃদু হাসিল, কিন্তু অবিশ্বাস করিল না। বরং তাহার চমৎকার নীল চোখ দুটি হইতে জয়ের গর্ব যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সে জানে তাহার রূপ আছে এবং সেই রূপ-সম্পর্কে একেবারে অচেতন থাকিবে এতটা নিষ্প্রাণ কাহাকেও আশা করে না।

মণিমোহনের বয়স বেশি নয়। দেখিতে সে-ও সুশ্রী। হঠাৎ তাহার কাটখোট্টা স্বামীটির সঙ্গে একটা অদৃশ্য তুলনা-বোধ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া যেন তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে? তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলো না আমার বাড়ীতে।

—তোমার বাড়ী? কোথায় সে?

হাত দিয়া মেয়েটি অল্প দূরে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে একখানা টিনের ঘর দেখাইয়া দিল, বলিল, ওই যে। এলেই যখন, তখন একবার না হয় দেখেই যাও।

—আচ্ছা চলো। কিন্তু তোমার সঙ্গে যেতে ভয় করে।

—ভয় করে? কেন?—মেয়েটা হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল, তাহার স্নিগ্ধ চোখ দুটি যেন নীলার মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহনের মুখের দিকে তাকাইয়া যেন কিছু একটার প্রত্যাশা করিতেছে সে।

কিন্তু মণিমোহন সেটা বুঝিতে পারিল না।

সে সকৌতুকে বলিল, ভয় করবে না? তোমার হাত দুখানা যা চলে, তার থেকে যতটা দূরে সরে থাকা যায় ততই ভালো।

—ওঃ, বলিয়া মা-ফুন চুপ করিল।

এই নিরিবিলি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই বাড়ীটা যেন আরো-বেশি নিরিবিলি। প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায় ইহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলে। ইহারা বৌদ্ধ—আচারে-বিচারে মুসলমানদের সঙ্গে খুব যে বেশি তফাৎ আছে তা নয়—তবু নিজেদের

হিন্দু বলিয়াই মনে করে। তা ছাড়া বর্মা দেশ-সুলভ ইহাদের বিচিত্র ভাষা এবং বিচিত্রতর রীতি-নীতি প্রতিবেশীদের কাছে অনেকটা অপরিচিত বলিয়াই তাহাদের সংস্রব কম।

—এসো বাবু, মেয়েটি ডাকিয়া একেবারে ঘরের ভিতরেই তাহাকে লইয়া গেল।

সামনেই একটা বাঁশের মাচা। এক পাশে কতকগুলো কাপড়-চোপড় জড়ো করা। রংচঙে একটা মশারি ঝুলিতেছে। বেড়ার গায়ে প্যাগোডার একখানা বড় ছবি, দুর্বোধ্য বর্মী হরফে তাহার নীচে কিছু একটা লেখা রহিয়াছে।

মাচার উপর বসিয়া মণিমোহন বলিল, তোমার স্বামী কোথায়?

—স্বামী? সে তো এখানে নেই। সহরে গেছে—তিন চার দিন পরে আসবে।

—তাই নাকি? তা তো জানতাম না। মণিমোহন অস্বস্তি বোধ করিল, তাহার মনে হইল নির্জন ঘরে সুন্দরী তরুণীটির সঙ্গে বেশিক্ষণ না থাকিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

—আমার ঘরটা কেমন দেখছ সরকারীবাবু?

—মন্দ কী, বেশ তো?

মেয়েটা হাসিল: উঁহু, বেশ নয়। গরীবের ঘর যে। তোমাকে মৌলমিনে নিয়ে যেতে পারতুম তো দেখতে। আমার বাবার সেখানে কাঠের কারবার আছে— অনেক টাকা।

—তা হবে। এখন চলি তা হলে—মণিমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল।

—চলে যাবে মানে? এসেই চলে যাবে তাই কি হয়? মেয়েটির কণ্ঠস্বরে যেন বিস্ময় প্রকাশ পাইল: একটু চা করে দিতে পারি। তোমরা বাঙালিরা যা খাও তা-ও করে দেওয়া অসম্ভব নয়—আমি লুচি বানাতে জানি। ভয় নেই, তার সঙ্গে "ঙাপ্পি" মিশিয়ে দেব না।

মেয়েটির কথার ভঙ্গি হইতে এটা বেশ অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে হিন্দু-সমাজের সহিত তাহার নিছক অপরিচয় নাই। নিশ্চয়ই কখনো না কখনো ভদ্রলোকদের সঙ্গে সে মিশিয়াছে এবং তাহাদের নিয়ম-কানুন তাহার একেবারেই অজনা নয়।

মণিমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, আমরা যে লুচি খাই তা তুমি কেমন করে জানলে?

—এমন চমৎকার বাংলা বলতে শিখলুম কোথায় তাতো জিজ্ঞাসা করলে না! আমরা অনেকদিন ঢাকায় ছিলুম যে। তোমাদের বাঙালিদের সঙ্গে ঢের মিশেছি। আমার এক বোনেরই তো বিয়ে হয়েছে বাঙালির সঙ্গে।

—তা তুমি এখানে এসে পড়লে কী করে?

—কপাল, সব কপালের ফের। আমার স্বামীটিকে কি সোজা লোক দেখছ? ত্নিয়ার আর কোথাও জায়গা হয় না বলে এখানে এসে ঘর বেঁধেছে। ও না মরলে আমার আর শান্তি নেই।

পতিভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই; কিন্তু আর দেরী করা চলে না। উঠিয়া পড়িয়া সে বলিল, কিন্তু আমার কাজ রয়েছে; এখন আর বসতে পারব না।

—কাজ থাকলে কী হবে? তোমাকে চা খেয়ে যেতে হবে যে। এখানে এই সৃষ্টিছাড়া দেশে পড়ে আছি বটে, কিন্তু চায়ের সব বন্দোবস্তই আছে আমাদের। বাঙালিদের চাইতে আমরা নেহাৎ খারাপ চা করতে জানি না।

মণিমোহন হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, কিন্তু দশটা বাজে। সত্যিই আর বসতে পারব না। আচ্ছা, আর একদিন এসে তোমার চা খেয়ে যাব।

—সত্যি খেয়ে যাবে তো! কবে আসবে?

মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া মণিমোহন চমকিয়া উঠিল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্নটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেটা যেমন আন্তরিক, তেমনই বিচিত্র। নিতান্ত পরিচয়ের সূত্র হইতে যতটুকু আশা করা চলে, তাহার চাইতে অনেক বেশি গভীর।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, প্রশ্নটাকে একেবারে এড়াইয়া যাওয়া চলে না। তাই নিতান্ত সাধারণভাবে হইলেও তাহার গলায় একটা প্রতিশ্রুতির সুর আসিয়া গেল।

—পরশু, বিকেল বেলা।

—ঠিক আসবে, ঠিক তো?—মা-ফুনের জিজ্ঞাসা এবার অনেকটা দাবীর মতোই শুনাইল।

—ঠিক আসব।

—না এলে—মেয়েটা হাসিয়া উঠিল: আমাকে তো জানোই। বোট থেকে তোমাকে সোজা টেনে নিয়ে আসব। আর নইলে আমার হাতের থান ইট কেমন চলে তার তো প্রমাণ পেয়েছই।

কথাটা ঠাট্টা বটে, কিন্তু একেবারে ঠাট্টা বলিয়াও মনে হইল না। বুকের ভিতরটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল মণিমোহনের। এই অভিনব মেয়েটির নীল চোখ ত্নইটিকে বিশ্বাস নাই—যখন-তখন নীলকান্তমণির মতো তাহার দ্যুতি বদ্‌লায়।

হাসিয়া সে-ও উত্তর দিল, আচ্ছা মনে থাকবে।

ঘর হইতে সে ত্নই পা বাহির হইতে না হইতেই মা-ফুন চট্ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল: হাঁ, আর একটা কথা, তুমি কিন্তু একাই আসবে সরকারীবাবু, তোমার সঙ্গের ওই খাতা লেখা বাবুটিকে আবার জুটিয়ে এনো না।

সন্দিগ্ধ বিস্মিত কণ্ঠে মণিমোহন কহিল, কেন?

—এম্‌নি। আমার স্বামী বেশি লোক-জনের গোলমাল সইতে পারে না। ওর আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা?—মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিল।

—মাথার ব্যারাম! তা হলে সেটা তোমার জন্যেই হয়েছে, বলো?

মেয়েটির মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই রহিল, তা হবে। কিন্তু পরশু বিকেলে তুমি সত্যিই আসবে তো?

—আসব।—আর একবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মণিমোহন বাহির হইয়া গেল।

রিলিফ্ আসিয়া পড়িল।

যে ভদ্রলোক আসিলেন, তিনি মুসলমান—বরিশাল জেলাতেই বাড়ী। এই চর ইস্‌মাইল হইতে একখানা ডিঙি করিলে আট ঘণ্টায় তাঁহার বাড়ী গিয়া পৌঁছানো যায়। সুতরাং এমন সময়ে এহেন নির্জন চরের দেশে বদ্‌লি হইয়া আসিতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না। বরং এখানে স্থায়ী হইয়া থাকার জন্য পোস্ট্যাল্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে একটা দরখাস্ত করিবেন বলিয়াই তিনি স্থির করিয়াছেন।

খুব খুশি হইয়াই অভ্যর্থনা করিলেন হরিদাস সাহা।

—এসো, দাদা এসো, তোমাদেরই দেশঘর, দেখে শুনে নাও। আমাদের আর কি, যাওয়ার জন্যে তো পা বাড়িয়েই আছি।

নতুন পোস্টমাস্টার আপ্যায়িত হইয়া কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করিলেন:

—যান—বাড়ীর থেকে ঘুরে-টুরে আসুন। এ যা দেশ মশাই—এখানে এলে তো দুনিয়ার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই থাকে না। কিছুদিনের জন্যে বাড়ীর থেকে মুখ বদলে আসুন।

—বাড়ী!—হরিদাস হাসিয়া উঠিলেন: আমাদের তো 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভায়া—কোন্‌টা যে বাড়ী আর কোন্‌টা নয়, তাই এ পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারলুম না। আরে কবিরাজ যে! কী মনে করে—শুনি?

সে কথার জবাব না দিয়াই কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সব কী ব্যাপার?

—কী সব?

—তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

—অগত্যা। থাকতে যখন পারছি না তখন তো যেতেই হবে। ভায়া হে, পৃথিবীটা অনেক বড়ো, আয়ুও তো প্রায় ফুরিয়ে এল। কাজেই সুযোগ থাকতে বেরিয়ে পড়া যাক্—যতটা দেখে নেওয়া যায়, ততটুকু ভালো।

—হুঁ:—বলরাম যেমন ক্লিষ্ট, তেমনই বিষণ্ণ হইয়া গেলেন।

কিন্তু তাঁহার বিষণ্ণতা হরিদাসকে স্পর্শ করিল না! স্পর্শ করিবার মতো মনই তাঁহার নয়। পরিবারের বন্ধন যাকে আঁকড়াইতে পারে নাই, পৃথিবীর ঘাট হইতে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ানোই যাহার স্বভাব, তাহার মনের স্পর্শাতুরতা বেশি হইবে কোথা হইতে।

হুঁ ঃ মানে? ভাবছ কি এত খালি খালি? এই চর ইস্‌মাইলের ছোট্ট ডাঙাটুকুতে একটা মেয়েকে মুখে করে নিয়ে বসে থাকলেই কি চলবে? জানো না রামপ্রসাদ বলছেন—

'এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা—'

—তা হবে। সংক্ষেপে কথাটা বলিয়াই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বলরাম চলিয়া গেলেন! কেন কে জানে হঠাৎ তাঁহার সম্বন্ধে কেমন একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল হরিদাসের মনে।

কেরামদ্দি আসিয়া উপস্থিত হইল।

—নৌকা ঠিক হয়ে গেছে বাবু। জোয়ারটা পেলেই রওনা হতে পারবে।

—পারবে তো? যাক্ বাঁচলুম। তা হলে চট্ করে মোট ঘাটগুলো বেঁধে ফেলো কেরামদ্দি, আর মায়া বাড়ানোটা কাজের কথা নয়।

একটুখানি ইতস্তত করিল কেরামদ্দি।

—আজকেই যাবেন বাবু? তা ছাড়া এই অবেলায় নৌকো ছাড়াটা কি সুবিধে হবে? দিনকাল তো ভালো নয়,—যখন—তখন—

—কী হবে? বাতাস উঠবে. রোলিং হবে, নৌকো ডুববে? তা যা হবার হবে, শুভদিনটা ছাড়তে পারি না। একে বেরোস্পতির বারবেলা, তার ওপর অশ্লেষা, নৌকো যাত্রার পক্ষে এর চেয়ে প্রশস্ত দিন আর কী হতে পারে?

মৃদু হাসির সঙ্গে একটা তুড়ী দিয়া হরিদাস চলিয়া গেলেন।

বেলা দুইটার সময় হরিদাসের নৌকা তেঁতুলিয়ায় পাল তুলিয়া দিল।

৫

চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল।

সমস্ত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া একটির পর একটি ঋতু-বিবর্তন চলিতেছে। যেন কালের অক্ষমালা হাতে লইয়া জীবধাত্রী পৃথিবী ধ্যানে বসিয়াছে—এই ধ্যানের মধ্য দিয়া বৎসরের শেষে সে পূর্ণতার সিদ্ধিলাভ করিবে। বসন্তের রূপ

ধরিয়া সেই পূর্ণতা আসিয়া মানুষের কাছে দেখা দেয়। দিকে দিকে ফুল ফুটিয়া ওঠে—প্রজাপতি উড়িয়া যায়, পিয়াল-বনে কৃষ্ণসার মৃগ শৃঙ্গ দিয়া মৃগীকে কণ্ডূয়ন করিতে থাকে। বসন্তের বাতাসে পুষ্পশরের পাঁপড়িগুলি স্বপ্ন ছড়াইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। কাব্যে-সাহিত্যে-শিল্পে এই মধু-ঋতুটা অমর হইয়া আছে।

কিন্তু যেখানে বাঁও মিলাইয়া বাঁশ পুতিতে হয়—বছরের পর বছর বালির নোনা ক্ষয় করিয়া নতুন মানুষের উপনিবেশ রচনা করিতে হয়—আদি-জননী সিন্ধুর কোল হইতে হামাগুড়ি দিয়া সেখানকার মাটি বেশি দূর উঠিয়া আসিতে পারে নাই, সেখানে ফাল্গুনী বাতাস আলাদা রূপ লইয়া আসে। পর্তুগীজদের ভাঙা-গীর্জার পাশ দিয়া যেখানে নদীর জল ঘূর্ণি রচিয়া খরস্রোতে বহিতেছে, সেখানে বালির মধ্যে পুঁতিয়া থাকা মরচে-পরা ভাঙা লোহার কামানটা আর এক অভিনব বসন্তের স্বপ্ন দেখে। দক্ষিণা বাতাসে গঞ্জালেসের বোম্বেটে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের মোহনা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—সুরভি-চঞ্চল ফাল্গুন রাত্রিতে বাসরের মিলন-মায়াকে চূর্ণ করিয়া পর্তুগীজদের বন্দুক আর মশাল সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়ায়।

আর তখনই চর ইস্‌মাইল নিজের সত্যিকারের স্বরূপটাকে চিনিতে পারে: তাহার ঈশান-দিগন্তে খানিকটা সুতীব্র হিংসা মেঘে মেঘে ঘন-কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, নদীর জল শ্লেটের মতো কালো হইয়া যায় এবং তারপর—

* * * *

বিকালের দিকেই মণিমোহনের মনে হইল যে মা-ফুন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছে। এই দুইদিন হইতেই বর্মী মেয়েটির স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে নানাভাবে আন্দোলন তুলিয়া ফিরিয়াছে; খানিকটা অনির্বাণ আগুনের মতো মেয়েটির রূপ—মনটাও সে আগুনের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। আর তাহার পাতিব্রত্যের আদর্শটাও যেমন বিচিত্র, তেমনই উপভোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের একটি শান্ত গ্রামে, একতলা বাড়ীর একখানি কুঠরীতে বসিয়া সেটা কল্পনাই করিতে পারে না।

কিন্তু বেলা পড়িয়া আসিতেছে এবং থান-ইটের কথাটাও সে ইহার মধ্যেই ভুলিয়া যাইতে পারে নাই। তা ছাড়া মনের অজ্ঞাত-প্রান্ত হইতে একটা আকর্ষণও যেন সে অনুভব করিতেছিল। সমুদ্রের একেবারে মোহনায়—পৃথিবীর উপান্তে এমন একটি বিস্ময়কর বস্তু যে সে আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে এটাও নিতান্ত কম কথা নয়।

সুতরাং বাহির হইয়া পড়িতেই হইল।

বর্মী মেয়ে বোধ হয় তাহার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ সে বেশ করিয়া সাজিয়াছে। সিল্কের ঘাগরার উপর চমৎকার একটি রঙিন জ্যাকেট পরিয়াছে—মাথার চুলগুলি বেণী করিয়া চমৎকার ভাবে চূড়ার উপরে বাঁধা। কি একটা সুগন্ধিও

বোধ হয় সে মাখিয়াছে, গন্ধে বাতাসটা মদির হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হইল অরণ্যের কালো অন্ধকার হইতে রহস্যময়ী কোনো রাজকন্যা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা-ফুন হাসিয়া বলিল, মনে আছে তো ?

—মনে না থেকে উপায় আছে নাকি ?

—সত্যি তুমি না এলে আমি বড্ড রাগ করতুম সরকারীবাবু। সারা দুপুর বসে খাবার তৈরী করেছি তোমার জন্যে, অবশ্য তোমাদের বাঙালিরা যা খায়।

বাঁশের মাচাটির উপর ভালো করিয়া বসিয়া মণিমোহন প্রশ্ন করিল, কিন্তু কেন এ সব তুমি করতে গেলে ?

—কেন করতে গেলুম ?—মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিতেই লাগিল : তোমার বড্ড সুবিচার আছে সরকারীবাবু, তাই তোমাকে আমার মনে ধরেছে।

—মনে ধরেছে! কথাটা মণিমোহনের খ্যাঁচ করিয়া বাজিল। এমন করিয়া ভালো লাগাটা প্রকাশ করা ইহাদের পক্ষেই সম্ভব। আচ্ছা রাণী এমন করিয়া কথাটা কি কখনও বলিতে পারিত ? মণিমোহন ভালো করিয়া মা-ফুনের দিকে চাহিল। অপূর্ব রূপসী দেখাইতেছে তাহাকে। প্রসাধনের ফলে তাহার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রূপ তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিয়াছে—হঠাৎ মনে হইতে পারে তাহার চোখ দুটি যেন নীল সুরার পরিপূর্ণ দুটি মদের মাত্র। তাহার তীব্র-যৌবনশ্রী দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়া যেন দিক্ দিগন্তকে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিতে চায়!

মেয়েটি ততক্ষণে একটা চীনা মাটির রাইস্-প্লেটে করিয়া একরাশ খাবার আনিয়া হাজির করিয়াছে। বেশির ভাগই ডিমের তৈরী। মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তোমার স্বামী ?

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কৌতুকের কণ্ঠে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল—হাসিটা ধারালো লোহার ফলার মতো নিষ্ঠুর এবং ঋজু। যেন এমন হাসির কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না।

—আমার স্বামী! ও হতভাগাটার কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না দেখছি। তা সে তো মরেছে।

—মরেছে! চমকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল : সে কী!

মেয়েটি হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল : মরবে! আমার হাতে ছাড়া কি তার মরণ আছে। সে আজও সহর থেকে ফেরে নি।

—কিন্তু তার তো ফেরবার কথা ছিল। এই নির্জন বাড়ীতে বিচিত্র সুন্দরী এই তরুণী মেয়েটির স্বামী অনুপস্থিত—ন্যায়শাস্ত্রের দিক হইতে জিনিসটা মনোরম নয়; কিন্তু মণিমোহনের আজ কী হইল কে জানে—তাহার অবচেতন সত্তাটা

এই সংবাদে যেন খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল : ঠিক এমনটিই সে আশা করিয়াছিল বটে।

—তা হলে তো—

—তা হলে—তা হলে কী? ভয় করছে আমাকে? কিন্তু যা ভাবছ আমি তত খারাপ লোক নই সরকারীবাবু। সকলকে ইট মারা আমার স্বভাব নয়।

—কিন্তু তাই দেখছি—মণিমোহন খাবারের দিকে মন দিল।

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে—নদীর উপর রক্ত ছড়াইয়া সূর্য বোধ হয় এতক্ষণে অস্তে নামিয়াছে। বাঁশ বনের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার এখানে একটু আগে হইতেই ডানা মেলিয়া দিল। মা-ফুন একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিল। সেই আলোয় তাহার মুখখানা রহস্যে যেন কোমল ও মধুর হইয়া উঠিতেছে।

মা-ফুন মণিমোহনের কাছে ঘেঁসিয়াই বসিল একরকম। তাহার বেশ বাস হইতে একটা অপরিচিত সুগন্ধি অত্যন্ত উগ্র হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে—যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় বহিয়া সে গন্ধটা সমস্ত শিরা-উপশিরাকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতেছে। অত্যন্ত কাছে ঘেঁসিয়া অতিরিক্ত কোমল কণ্ঠে মেয়েটি বলিল, খাচ্ছ না কেন? বাঙালীদের মতো তৈরী করতে পারি নি বলে?

মণিমোহন ভয়ানক ভাবে চমকিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত চেতনায় যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া অস্বাভাবিক একটা কোলাহল বাজিয়া উঠিতেছে। আর একটু দেরী হইলে হয়তো বা সে ধরা পড়িয়া যাইবে। রক্ত যেন অস্বাভাবিক খরস্রোতে সর্বাঙ্গ দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

কিছু একটা তাহার বলা উচিত, কিন্তু কোনো কথাই এই মুহূর্তে সে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল ইতস্তত করিয়া বলিতে পারিল, না বেশ হয়েছে, খুব খেয়েছি। তারপরে সে উঠিয়া পড়িল : আচ্ছা, অন্ধকার হয়ে গেল, আমি এখন চললুম।

মা-ফুন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কিন্তু যাবে কী করে?

—ওঃ—অন্ধকারের জন্যে ঠেকবে না। আমার সঙ্গে টর্চ আছে।

—অন্ধকারের কথা বলছি না—ঝড় আসছে যে।

—ঝড়! বাহিরে মুখ বাড়াইয়া সে দেখিল সত্যই ঝড় আসিতেছে। এতক্ষণ যেটাকে সে সন্ধ্যা বলিয়া মনে করিতেছিল, সেটা কাল-বৈশাখীর অকাল ছায়া মাত্র। নিঃশব্দে এবং অগোচরে আকাশ একেবারে কষ্টি পাথরের রঙ্ ধরিয়াছে, তাহার উপর কয়লার জমাট ধোঁয়ার মতো রাশ রাশ কালো মেঘ আসিয়া আরো বেশি করিয়া জমা হইতেছে। একদল শাদা বক সেই কালো পটভূমিটার তলা দিয়া শন্ শন্ করিয়া

উড়িয়া গেল—পলকের জন্য বিদ্যুতের একটা দীর্ঘ সরীসৃপ ধূসর দিগন্তটাকে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া জলিয়া গেল যেন। মনে হইল তেঁতুলিয়ার মোহনা ছাড়াইয়া, চর কুকুরার দীর্ঘ নারিকেল বীথিকে ডিঙাইয়া কোন্ একটা রহস্যময় দেশ আছে—সেখানকার সভা-প্রাঙ্গনে কী একটা বিরাট্ উৎসবের আয়োজন হইল। সেই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে কে মহা মেঘের একটা প্রকাণ্ড মৃদঙ্গে ঘা দিয়াছে; কালো অকোশে তাহার হাতের সোনার বলয়টা ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা গম্ভীর নির্ঘোষ সমস্ত অনুষ্ঠানটাই সূচনা করিয়া দিল।

মণিমোহন বলিল, তাই তো! তা হলে আর দেরী করা যায় না। আমি চললুম।

মেয়েটি কিন্তু তাহার পথ ছাড়িল না: কী করে যাবে? পোঁছবার আগেই তুমি ঝড়ের মুখে পড়ে যাবে যে।

—তা পড়লেও উপায় নেই। বোটে আমাকে যেতেই হবে—মনিমোহনের কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস লাগিল।

বর্মী মেয়েটির সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যেন একটা সংকেত ঘনাইয়া আসিতেছিল: এ দেশের ঝড় যে কী তুমি তো তার খবর রাখো না সরকারীবাবু, নইলে—

কথাটা শেষ হইল না। সমুদ্রের ওপারে সেই যে বিরাট জলসাটা বসিয়াছিল, সেখানে যাহাদের নাচিবার কথা ছিল তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। একটা দম্‌কা ঝাপ্টায় পিছনের সমস্ত বাগানটা তারস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল—অনেকগুলি পায়ের নুপুরের ঝঙ্কার আকাশকাঁপানো একটা শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া সম্মুখে বহিয়া গেল। একরাশ ধুলা-বালি ও শুক্‌না পাতা আসিয়া চোখে-মুখে উড়িয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য ধুলার একটা ঘূর্ণ্যমান আবরণ ছাড়া সামনে আর কিছুই রইল না।

মা-ফুন মণিমোহনের হাত ধরিয়া ঘরের ভিতরে টানিয়া আনিল। খোলা জানালা দিয়া ঝাপ্টায় বাঁশের শাতা আসিয়া পড়িতেছে, পাল্লা দুইটাকে ক্রমাগত আছড়াইতেছে। মা-ফুন জানলাটাকে বন্ধ করিয়া দিতে না দিতেই বার কয়েক দপ্ দপ্ করিয়া ঘরের লণ্ঠনটা নিবিয়া গেল।

এমনি করে ঝড় আসাটা পশ্চিমবঙ্গের ছেলের জীবনে অভিনব, তাই মণিমোহন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল—মুখ দিয়া তাহার অস্পষ্ট আর্তনাদ বাহির হইল শুধু।

পরক্ষণেই সে অনুভব করিল, তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া কোমল-দেহের একটা অত্যন্ত কঠিন বন্ধন আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অপরিচিত সুগন্ধিটার গন্ধ যেন ক্লোরোফর্মে রূপান্তরিত হইয়া তাহার স্নায়ুগুলির উপরে কাজ করিতে চায়।

চকিত হইয়া সে নিজেকে সেই বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিতে চাহিল—তাহার মনের সামনে রাণীর মুখখানা সিনেমার ছবির মতো আসিয়া দেখা দিতেছে। শরীরের প্রত্যেকটি লোমকূপে যেন অসহ্য অনুভূতি উগ্র হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ছাড়াইতে চাহিলেও সে ছাড়াইতে পারিল না। বাহিরের সমস্ত গর্জনের মধ্য দিয়াও সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল: এখন তুমি আমার—আমার। জোর করে আমাকে ছাড়াতে পারবে, কিন্তু আমার কোমরের ছোরাখানাকে ছাড়াতে পারবে না।

ভয়ে তাহার সমস্ত দেহ হিম হইয়া গেল।

ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়। উপনিবেশের বন্য ও উদ্দাম কামনার আগুন জ্বলিয়াছে। এ আগুনে জ্বলিয়া সুখ আছে কিনা কে জানে; কিন্তু অন্ধকারে মণিমোহন স্পষ্ট একখানা জলজলে ছোরা যেন চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছিল।

বাহিরে তখন প্রবল ঝড়ের গর্জন চলিতেছিল। সেই ঝড়ের তাণ্ডব ঘরের মধ্যেও ভাঙিয়া পড়িল।

* * *

দরজাটা এমন ভাবে প্রবল একটা শব্দ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল যে, তাহার আঘাতে সমস্ত ঘরখানাই কাঁপিয়া উঠিল। গড়গড়াটা হইতে খানিকটা ছাই উড়িয়া আসিয়া বলরামের মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল এবং দেওয়ালের গায়ে চীনামেয়েটির সেই ছবি খট্ খট্ করিয়া ঘরের ওপাশে উড়িয়া চলিয়া গেল। গ্রুপ ফটোগ্রাফ্খানা হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় ঝন্ ঝন্ করিয়া দেওয়াল ঘড়িটার উপরে গিয়া পড়িল এবং পরক্ষণে চারিদিকে রাশি রাশি কাচ ছাড়া কিছু আর দেখিবার রহিল না।

বলরাম চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রচণ্ড ঝড় সুরু হইয়াছে। চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, রাধানাথ—রাধানাথ?

কিন্তু কোথায় রাধানাথ? বিকালে সে আড্ডা দিতে গিয়াছিল, ইহার মধ্যে সেখান হইতে ফিরিতে পারে নাই নিশ্চয়ই। ফিরিলে অন্তত দু একবার তাহার চেহারাটা চোখে পড়িত।

দরজা জানালাগুলি শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিয়া বলরাম বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। ঝড়ের গতিটা আজ ভালো নয়—বছরে প্রথম কাল-বৈশাখী উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তাহার সংঘাতটা এমন প্রমত্ত!

—মুক্তো, মুক্তো?

মুক্তোর সাড়া আসিল না।

তিন চারিদিন হইতেই মুক্তোর যেন কী হইয়াছে। ভালো করিয়া কথা বলে না সে। এমন কি ময়ূর-কণ্ঠী রঙের সাড়ীখানা দেখিয়াও সে খুশি হইয়াছে কিনা বোঝা

কঠিন। এম্‌নিতেই বলরাম তাহাকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন না, তার উপর কয়দিন হইতেই ব্যবহারটা তাহার পুরোপুরি দুর্বোধ্য ঠেকিতেছে। মেয়েদের ব্যাধির খবর কবিরাজ জানেন, কিন্তু তাহাদের আধির সংবাদ লইবার পেশা তাঁহার নয়। সুতরাং বলরাম ভারী দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন।

কিছু একটা অসুখ-বিসুখও করিতে পারে। সেদিন তাহার এত সাধের বোয়াল মাছ কিনিয়া আনা হইয়াছিল কিন্তু সে খায় নাই। পাতে ফেলিয়াই উঠিয়া গেছে; কিন্তু অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও বলরাম কোনো উত্তর পান নাই—মুক্তো যেন তাঁহাকে এড়াইয়া চলে আজকাল।

ঝড়ের গতিটা ক্রমেই বাড়িতেছে—মুক্তোর খবরটা একবার লওয়া দরকার। হয়তো জানালাটা খুলিয়াই বসিয়া আছে সে। ঝড়ের মুখে জোরালো বৃষ্টির ছাট আসিতেছে—সব ভিজিয়া যাইবে যে।

—মুক্তো, মুক্তো?

বলরাম মুক্তোর ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

অনুমান মিথ্যা নয়। জানালাটা খোলাই আছে বটে। বাহিরে অন্ধকার দুর্যোগের দিকে সে চোখ মেলিয়া বসিয়া আছে—থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের একটা প্রখর আলোয় তাহার বিষণ্ণ মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

বলরাম ডাকিলেন, মুক্তো?

মুক্তো উত্তর দিল না।

—মুক্তো, মুক্তো, তোমার কি হয়েছে?

মুক্তো এইবার তাঁহার দিকে চাহিল। অজস্র জল আসিয়া তাহার সমস্ত মুখটা ভাসিয়া গিয়াছে, চুলগুলি গালের দুই পাশে আসিয়া লেপটাইয়া আছে। তাহার মুখ বাহিয়া যে জল পাড়িতেছে, মনে হইল তাহার সঙ্গে চোখের জলও এখন মিশিয়া রহিয়াছে।

বলরাম চকিত কণ্ঠে কহিলেন, কেন, এখন তুমি এমনভাবে জানালা খুলে বসে আছো? বাইরে সাংঘাতিক ঝড় চলেছে—তা ছাড়া এ ভাবে ভিজলে অসুখ করবে। জানালাটা বন্ধ করে দাও শিগ্‌গির।

কিন্তু মুক্তো জানালা বন্ধ করিল না—কোনও উত্তরও দিল না। যেন কথাটা সে কানে শুনিতে পায় নাই। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অদ্ভুত ও অপরিচিত ভয়ের অনুভূতি আসিয়া তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়া দিল।

দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলরাম মুক্তোকে স্পর্শ করিলেন।

—কী হয়েছে তোমার? কথা বলছ না যে মুক্তো?

একটা ঝট্‌কা মারিয়া মুক্তো সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ দুইটি জল টলমল করিতেছে, এবার সে-দুইটি হইতে যেন আগুন ছিট্‌কাইয়া বাহির হইতে লাগিল।

অস্বাভাবিক একটা চীৎকার করিয়া উঠিল সে। শুনিয়া বলরাম যেন কাঠ হইয়া গেলেন।—কেন, কেন তুমি এমন করলে? এমন করার কী দরকার ছিল তোমার?

জড়িত স্বরে বলরাম আবার নির্বোধের মতো শুধাইলেন, কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? এখনো তুমি জানতে চাও? তুমি না কবিরাজ? আমার দিকে চেয়েও কি বুঝতে পারছ না কী হয়েছে? এখন আমি কী করব—কোথায় যাব?

ইহার পরেও না বুঝিবার মতো নির্বুদ্ধিতা বলরামের ছিল না।

তিনি তো কাঠ হইয়াই ছিলেন, এইবার যেন পাথর হইয়া গেলেন।

জানালা দিয়া বিদ্যুতের আর এক ঝলক আলো আসিয়া মুক্তোর সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া গেল। বলরাম স্পষ্ট দেখিলেন, আসন্ন মাতৃত্বের স্নিগ্ধ কোমল একটা শ্রী-সম্পাতে সে যেন অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিশীর্ণ মুখ, তাহার মলিন চক্ষু এবং পূর্বের ব্যবহারগুলি—সব কিছু মিলাইয়া বলরামের যেন কোথাও সন্দেহের আভাসমাত্র আর অবশিষ্ট রহিল না। বিস্ময়ে ভয়ে যেন মূঢ় হইয়া গেলেন তিনি।

চর ইস্‌মাইলের নোনা-মাটিতে ফসল ফলিতে সুরু হইয়াছে। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপাদাপির সঙ্গে সে সত্যটা বলরামের হৃৎপিণ্ডের রক্তধারায় তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে লাগিল।

*　　*　　*　　*

সন্ধ্যার আগে হইতেই জোহান এই জায়গাটিতে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। চরের দক্ষিণ-দিকে যেখানে পর্তুগীজদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষটা একটু একটু করিয়া তেঁতুলিয়ার জলে লোপ পাইবার উপক্রম করিতেছে, আর খানিকটা খাড়া পাড়ের ভাঙা গা বাহিয়া রাশি রাশি ঘাসের শিকড় দুলিতেছে, সেইখানে একটা গাছের ছায়াতেই সে অপেক্ষা করিতেছিল। লিসি এখানে আসিবে। সন্ধ্যাটা আর একটু ঘন হইয়া পড়িলে নিশ্চয় আসিয়া পড়িবে সে—এই রকমই কথা আছে।

জায়গাটা পুরোপুরি নিরিবিলি এবং নির্জন। নীচে একটা গাছের সঙ্গে একখানা এক দাঁড়ের ছোট ডিঙি সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেইখানা তাড়াতাড়ি বাহিয়া গেলে তিন চার ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমের চরে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে তাহারা। সেখানে বন্দোবস্ত করাই আছে, তার পর একখানা বড় নৌকা লইয়া সোজা চাঁদপুরের পথে! ওখান হইতে রেলে চাপিয়া চিদম্বরম্ তিনদিনের পথ।

ডি-সুজা অবশ্য টের পাইবে রাতারাতিই। কিন্তু সে টের পাইল তো বড় বহিয়া গেল। হৈ চৈ সে করিবে না, করিয়া লাভও নাই। জোহানের হাতেই ডি-সুজার মারণাস্ত্র রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে যে কোন সময়েই তাহাকে শায়েস্তা করিতে পারে।

জোহান স্বপ্ন দেখিতেছিল। লিসিকে লইয়া ঘর বাঁধিবে সে। রেলে যদি চাকরী পায়, তবে তো কথাই নাই। লাল-ইটের ছোট্ট একটি কোয়ার্টার। বাইরে একফালি সব্জীর বাগান, একটা ছোট মুরগীর খোঁয়াড়। সারাদিন এঞ্জিন চালাইয়া সে যখন কালি-ঝুলি মাথা দেহ লইয়া ঘরে ফিরিবে, সঙ্গে সঙ্গে লিসি হয়তো গরম জল আনিয়া হাজির করিয়া দিবে। চায়ের সরঞ্জাম লইয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে। দুইজনের হাসিতে আনন্দে চমৎকার কাটিয়া যাইবে দিনগুলি।

কিন্তু গঞ্জালেস ?

গঞ্জালেসের কথা ভাবিতেই মাথা গরম হইয়া গেল জোহানের। চেহারা একটু বেশি কটা বলিয়াই কি সে এত প্রিয়পাত্র নাকি ? গঞ্জালেসের চাইতে সেই বা এমন কমটা কিসের ? তাহার দেহেও তো পর্তুগীজের রক্তই বহিতেছে।

কিন্তু লিসি এখনো আসিতেছে না কেন ? জোহান চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, এই তো তাহার আসিবার সময়। তা ছাড়া—চকিতে তাহার চোখে পড়িল—কিসের একটা প্রত্যাশায় তেঁতুলিয়ার জল যেন থম থম করিতেছে। এত ধীরে ধীরে স্রোত বহিয়া চলিতেছে যে হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে নদীর বুঝি কোনো গতি নাই। দুই পাশের গাছ-পালাগুলি যেন উর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।

ঝড় আসিতেছে।

লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে—এ সাধারণ ঝড় নয়। মেঘের কালো স্তূপটাকে ছিঁড়িয়া বিদ্যুতের শিখাটা আত্যন্ত লক লক করিয়া উঠিতেছে। সংকেতটা অশুভ।

কিন্তু লিসি ?

লিসি কি প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে ঠকাইলই শুধু, আসিল না ?

—জোহান !

ঠিক সেই মুহূর্তেই লিসি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জোহান আগ্রহভরে তাহাকে কাছে টানিয়া লইতে চাহিল, তুমি এসেছ ?

—হাঁ এসেছি। কিন্তু যাবে কী করে ! ঝড় আসছে যে !

—আর তো দেরী করা যায় না লিসি। এখানে এমন ভাবে আর পড়ে থাকা যায় না। চলো ডিঙি ছেড়ে দিই—তারপর—

কিন্তু তারপরে যে কী হইবে সেটা জোহান আর শেষ করিতে পারিল না।

পিছন হইতে ধারালো একটা দায়ের কোপ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জোহানের ঘাড়ের ওপর আসিয়া পড়িল এবং টের পাইতে না পাইতেই তাহার মাথাটা ছিট্‌কিয়া তিনহাত দূরে চলিয়া গেল।

লিসি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানা রক্তহীন শাদা হইয়া গেছে। অস্বাভাবিকভাবে চীৎকার করিয়া সে বলিল, একি হল?

বর্মীটা হাসিতেই ছিল।

লিসি বলিল, কিন্তু এমন তো কথা ছিল না।

সে বলিল, না! কিন্তু দরকার ছিল!

লিসি জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ডি-সুজাকে অপমান করার জন্য সে জোহানকে শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায় ভাবিয়াছিল ঘা কতক মার খাইয়াই শায়েস্তা হইয়া যাক লোকটা। কিন্তু যা ঘটিল তা প্রলয়—আকাশ-পাতাল অরণ্যকে ঝড়ের হুঙ্কারের সহিত একাকার করিয়া তাহারও পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল।

তখন চারদিক কাঁপাইয়া উপনিবেশের ঝড় সুরু হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার ফণা তুলিয়া তেঁতুলিয়ার জল ভাঙা পাড়ের উপর আসিয়া ছোবল্ মারিতেছে—চর ইস্‌মাইলের নারিকেল আর সুপারীর বন দিক দিগন্তব্যাপী এই উৎসবের বিরাট আয়োজনে যোগ দিয়াছে। দক্ষিণ হইতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ঝোড়ো বাতাসকে থর্ থর্ করিয়া কাঁপাইয়া দিয়া ভাসিয়া গেল—বরিশাল গান গর্জন করিতেছে!

* * * *

লিসি যখন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল—তখন কালো অন্ধকারে ঝোড়ো নদীর উপর পাল তুলিয়া বর্মীদের বজরা উড়িয়া চলিয়াছে!

মাথার উপর একটা কালো লণ্ঠনের আলো বজরার সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। লিসি চোখ মেলিয়া ডাকিল, ঠাকুর্দা!

বর্মীটা হাসিল।

—তোমার ঠাকুর্দাকে জোহানের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছি। সে বেঁচে থাকলে আমরা সবাই ধরা পড়তুম। চর ইস্‌মাইলের ব্যবসা আমরা তুলে দিলুম।

—আর আমি? আমি?

লিসি প্রাণপণে উঠিয়া বসার চেষ্টা করিল।

—গঞ্জালেস্ যা করত তাই করেছি। আমরাও তো বীরপুরুষ—কাজেই তোমাকে বোটে তুলে নিয়ে এলুম। ভালো করি নি?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লিসির জগৎ ক্রমশ বিন্দুবৎ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ফুলিয়া উঠিয়াছে বজরার পাল। নদীর কালো জল বিদ্যুতের আলোয় যেন সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ দাঁত মেলিয়া নিষ্ঠুরভাবে অট্টহাসি করিতেছে। তিন শতাব্দী আগে বড় বড় কামান লইয়া হার্মাদদের বোম্বেটে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের নোনা-মোহনায় যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, তাহার জের আজও মিটিয়া যায় নাই। দেশ-দেশান্তর কাল-কালান্তর পার হইয়া তাহারি নিঃশব্দ ধারা বহিয়া চলিতেছে। বর্বরতা দিয়া যে জীবনের গোড়াপত্তন হইয়াছে, বর্বরতাতেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে আর একদিন!

কেবল পোস্ট অফিসের কাঁচের দরজাটার ফাঁক দিয়া কেরামদ্দী বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। হরিদাস সাহার নৌকা এখন তেঁতুলিয়ায় পাড়ি জমাইতেছে। এত বাতাসের ঝাপ্টায় সে নৌকা ও পারে গিয়া পৌঁছিবে কিনা কে জানে।

হয়তো পৌঁছিবে না। কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়! বসন্ত যেখানে সুন্দরের তপস্যায় ধ্যান করিতে বসে নাই—যেখানে সে মুক্ত-জটা উড়াইয়া তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে; যেখানে কস্তুরীর মৃদু সুগন্ধিকে ভীরু প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে আহুতি দিয়া প্রখর বহ্নি-শিখায় কামনার যজ্ঞ চলিতেছে—সেখানে সামঞ্জস্যই সব চেয়ে বড় কথা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বপ্ন লইয়া পৃথিবী যেখানে নতুন করিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিতে চায়—সেখানে পাওয়া কিংবা হারাণো সব সমান হইয়া গিয়াছে।

উপনিবেশের বর্বর যৌবন এমনি করিয়াই পূর্ণতার, প্রবীণতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

উৎসর্গ

জটিল অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা যাঁর পেশা, দুরূহ রাজনীতি যাঁর নেশা এবং পরম সাহিত্যরসগ্রাহী যাঁর মন, সেই

সুহৃদ্‌বর বীরেন্দ্রলাল লাহিড়ীকে—

দ্বিতীয় পর্ব

বিভ্রান্ত বসন্ত

১

মানুষই কি কেবল রচনা করে ইতিহাসকে? ইতিহাস মানুষকে রচনা করে না কোনোদিন?

ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। দুশো বছর ধরিয়া পর্তুগীজেরা কী না করিয়াছে ভারতবর্ষের উপরে। ঝড়ের রাত্রে বাসুকীর ফণার মতো নীল সমুদ্র যখন দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, বোম্বেটে জাহাজের পালগুলি তখন ঝড়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডানার মতো তাহারি উপর দিয়া উড়িয়া গিয়েছে। অন্ধকার—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল হইতে অন্ধকার ঠেলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্র অর্তনাদ করিতেছে পিঁজরায় বাঁধা বন্য-জন্তুর মতো। আর সেই সমুদ্র আছড়াইয়া পড়িতেছে পৌরাণিক যুগের অতিকায় দৈত্যের মতো গ্র্যাণাইট পাথরের খাড়া পাহাড়ের গায়ে। মৃত্যুর প্রতীক কালো অ্যাল্‌বাট্রসের কান্না ছাপাইয়া উঠিতেছে সমুদ্রের মত্ত হুংকারকে।

আর তাহারই নীচে এই ঝড়ের মধ্যেও অনেকগুলি আলো মিট্ মিট্ করিতেছে—সুরাটের—বন্দর। অকস্মাৎ মশালের আলো—আর্তনাদ—বন্দুকের শব্দ। পর্তুগীজেরা বন্দর লুঠ করিতেছে। অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়িয়া ছবির মতো দেখা দেয় আর একটি দৃশ্য। বঙ্গোপসাগর। সপ্তগ্রামের বণিকদের বহর চলিয়াছে সিংহলে বাণিজ্য করিতে। হার্মাদদের জাহাজ হইতে কামান গর্জন করিয়া উঠিল। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত নির্মল নীল সমুদ্র লাল হইয়া গেল মানুষের রক্তে……

সময়ের চাকা ঘুরিয়া চলে অবিশ্রান্ত। স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব চলে। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার। নবাবের রত্নসিংহাসন চূর্ণ হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ড হইয়া। পলাশীর জনশূন্য প্রান্তরে, ঘন নিবিড় আমের বনের বিষণ্ণ ছায়ায়, গঙ্গার পরপারে যখন মলিন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, তখন সমুদ্রের ওপারের সাম্রাজ্যবাদের নতুন সূর্য দেখা দেয়।

ভাস্কো-ডা-গামার জাতি। ভারতবর্ষকে প্রথম যাহারা অপরিচিত প্রাচীর নির্ণিরীক্ষ্য অন্ধকার হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, আজ ভারতবর্ষের কয়েক ইঞ্চি জমিতে তাহাদের অধিকার আছে মাত্র। তাহাদের দিগ্বিজয়ী নৌবহর আজ

ইতিহাসের পাতা আশ্রয় নিয়া আত্মগোপন করিয়াছে, ইংরেজের ম্যান্-অফ্-ওয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে এমন সাধ্য কি! চক্রবর্তী ইংরেজের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইয়া সেই দুর্ধর্ষ হার্মাদেরা আজ পায়জামা গুটাইয়া জমিতে লাঙল ঠেলিতেছে, বিড়ি টানিতেছে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে চোখ-মুখ বুজিয়া কুইনাইন গিলিয়া চলিয়াছে।

ইতিহাস রচনা করিয়াছে মানুষকে। ঘুমের দেশ এই ভারতবর্ষ। কোথায় ককেসাস্ পাহাড়ের তলা হইতে প্রথম আসিয়াছিল যাযাবর মানুষের দল। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যের মধ্যে তাহাদের সমস্ত পশুশৌর্য গেল তলাইয়া। শক আসিল, হূণ আসিল, গ্রীক্ আসিল, মুসলমান আসিল—কুম্ভকর্ণের মাটিতে পা দিয়া তিনদিনের বেশি কেউ তাহাদের জাগিয়া থাকিতে পারিল না। পর্তুগীজেরাই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে কি করিয়া? বর্তমানের সূর্যও তো একদিন অস্তে নামিবে, সেদিন ইতিহাসের এই ক্ষুধা যে তাহাকেও গ্রাস করিবে না—এমন ভবিষ্যদ্বাণী আজ কে করিতে পারে?

*   *   *   *

সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর স্তামুয়েল গঞ্জালেস্। শুঁটকী মাছের ব্যবসা করে সে। সন্দীপ হইতে ষ্টিমারে করিয়া সে চট্টগ্রাম ফিরিতেছিল। বাংলা দেশের একেবারে তলার দিকে নদী আর সমুদ্র একাকার হইয়া আছে একেবারে—শাদা আর নীলের একটা বিচিত্র সৌন্দর্য। বহুদূরে বাতাসে সবুজ বন মাথা নাড়িতেছে—জলের প্রান্ত-রেখার সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গেছে বিচিত্রভাবে। মাথার উপর দিয়া পাখী উড়িয়া চলিয়াছে—ষ্টিমারের চোঙা হইতে ধোঁয়া উড়িতেছে, আর জলের উপর তাহার ছায়া কাঁপিতেছে আঁকাবাঁকা ছবির মতো।

রেলিং ধরিয়া গঞ্জালেস্ দাঁড়াইয়াছিল। সামনে পিছনে নৌকা নাচিতেছে, ওপারে তীরের গায়ে ষ্টিমারের ঢেউ যে একরাশ ফেনা লইয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে, এতদূর হইতেও সেটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নদীর দিকে চাহিয়া নানা রকমের অর্থহীন অলস ভাবনা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে পাক খাইয়া চলিয়াছিল। ভাবনার সুর কাটিয়া দিল এমন সময় ডি-সুজা আসিয়া।

সে-ও এই ষ্টিমারের যাত্রী। অনেকক্ষণ হইতে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া স্তামুয়েলকে লক্ষ্য করিতেছিল সে—মানুষে মানুষে এত সাদৃশ্যও সম্ভব! যেন ডেভিড গঞ্জালেস্ এতদিন পরে যৌবন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিল।

—কোথায় যাওয়া হবে?

প্রশ্ন শুনিয়া গঞ্জালেস্ বিরক্ত হইয়া তাকাইল, কিন্তু স্বজাতি। কহিল, চিটাগাং। তুমি কোথায় যাবে?

ডি-সুজা দন্তহীন মুখে হাসিল, একই পথের পথিক। তুমি বুঝি ওখানেই থাকো? কী করো?

—মাছের ব্যবসা।

মেরীর নাম করিয়া ডি-সুজা শপথ করিল একটা।

—চিনেছি তোমাকে। তুমি স্তামুয়েল গঞ্জালেস্ তো?

স্বীকার করিয়া স্তামুয়েল বিস্মিত চোখে তাকাইয়া রহিল।

—তোমার বাপের সঙ্গে আমার খাতির ছিল খুব। একসঙ্গে দুজনে গোয়াতে হোটেল খুলেছিলুম, তারপর সেখান থেকে ম্যাড্রাসে। কিন্তু বেশিদিন চলল না—পুলিশ পিছে লাগল কি না।

বাচন-ভঙ্গির অন্তরঙ্গতায় উত্তরোত্তর বিস্ময় বোধ করিতেছিল গঞ্জালেস্। কিন্তু পিতৃবন্ধু, সুতরাং সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, হোটেল খুললে কিন্তু তাতে পুলিশ পেছন লাগল কেন?

—বাঃ, লাগবে না? মদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু লাইসেন্স তো ছিল না। পুলিশ অবশ্য সবই জানত, ভাগ-বাঁটোয়ারাও ছিল—কিন্তু ওই টাকাপয়সার ব্যাপারেই শেষ পর্যন্ত আর বনল না। ব্যাটাদের পেট তো আর সহজে ভরাবার নয়। কাজেই—বাকীটা যে সম্পূর্ণ বলা বাহুল্য, এমনি একটা ভাব দেখাইয়া খানিকটা দন্ত-বিকাশ করিল সে।

গঞ্জালেসের লোকটাকে নেহাৎ মন্দ লাগিল না। মুখের দিকে চাহিলেই বোঝা যায়, খালি বাতাসেই তাহার বয়স বাড়ে নাই; বহু ঝড় পাড়ি-দিয়া-আসা নৌকার ছেঁড়া পাল আর ভাঙা-দাঁড়ের সঙ্গে কোথায় কী যেন সামঞ্জস্য আছে তাহার। সর্বাঙ্গে যুদ্ধের চিহ্ন। নিরুত্তাপ নিস্তেজ জীবনে দুঃসাহসী যে পর্তুগীজের রক্ত গঞ্জালেসের ধমনীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডি-সুজার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়াই সে রক্তে যেন দোলা লাগিয়া গেল। আর তা ছাড়া -পিতৃবন্ধু। নিজের বাপকে অবশ্য সে খুব ভালো করিয়া মনে করিতে পারে না, মনে করিবার মতো কোনো স্মৃতি কখনো সে রাখিয়াও যায় নাই। অতি শিশুকালে গঞ্জালেস্ দু-একবার দেখিয়াছে লোকটাকে। কোথায় কোথায় থাকিত কী যে করিত, কেউ বলিতে পারিত না। গঞ্জালেসের মা এক মিশনারীর বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করিত, সেই অন্নেই বহু দুঃখে তাহারা মানুষ। বাপের মাঝে মাঝে দেখা পাইত—তবে তাহার আবির্ভাব ঘটিত মূর্তিমান একটা দুর্যোগ বা দুঃস্বপ্নের মতো। এক মুখ দাড়ি, ছেঁড়া পায়জামা, মুখে অশ্রাব্য শপথ এবং কদর্য গালাগালি। যে কয়েকটা দিন থাকিত তাহাদের মাকে ধরিয়া বেধড়ক প্রহার করিত, শিশুদের ধরিয়া আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিত। আর

সমস্ত দিন মদ গিলিত অশ্রান্তভাবে। যেন তাহার পেটের মধ্যে সাহারা মরুভূমির মতো কী একটা বিরাট ব্যাপার রহিয়াছে; পৃথিবীতে যত মদ আছে, একটানে চোঁ চোঁ করিয়া শুষিয়া লইতে পারে।

এই তো বাপের সম্পর্কে তাহার স্মৃতি। শুধু এইটুকুই অবশ্য নয়, চুলের তলায় অনেকখানি কাটা চিহ্নও পিতারই সস্নেহ অবদান। তবু বড় হইয়া গঞ্জালেস্ তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। দুঃসাহস ছিল তাহার রক্তে, ছিল বিদ্রোহ। সব ভাঙিয়া চুরিয়া বেপরোয়া ছন্দে জীবনটা বহিয়া গিয়াছে তাহার, প্রয়োজনের গণ্ডীতে নিজের দুর্দান্ত মনটাকে সে মারিয়া ফেলে নাই। ইংরেজের আইন তাহাকে ধরিবার বহু চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই—ছুঁইয়া গেছে মাত্র। নবাব আলীবর্দী খাঁর কামানের পাল্টা জবাব দিয়াছিল সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের দুরন্ত বাহিনী। ডেভিডের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেছে পুলিশের রাইফেলের গুলি, কিন্তু তাহার পিস্তলের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই।

আর গঞ্জালেসের মুখের দিকে চাহিয়া ডি-সুজাও এমনি কিছু একটাই ভাবিতেছিল বোধ হয়। সন্ধ্যা আসিতেছে। নদীর খাদ-মিশানো সমুদ্রের জল ধূসর হইয়া আসিতেছে। তাহারি উপর ঝল্মল্ করিতেছে দিনান্তের লাল আলো। দূরের সবুজ বনরেখা সে আলোয় রঙীন হইয়া উঠিয়াছে—সমুদ্রের শাড়ীতে কেউ যেন জরীর পাড় বসাইয়া দিয়াছে। আর সেই আলো জলিতেছে গঞ্জালেসের বড় বড় দুটি পিঙ্গল চোখের ওপর—একটা উগ্র দীপ্তি তাহা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে যেন। সুগঠিত দীর্ঘ দেহ—সেদিকে চাহিলেই তাহার বাপকে মনে পড়িয়া যায়। আম্বালা স্টেশনের সেই শিখ ষ্টেশন মাষ্টারটা। গঞ্জালেসের সেই ঘাতক-মূর্তিটা ডি-সুজা আজো ভুলিতে পারে নাই। গঞ্জালেস্ই তো তাহার মাথায় ঠাসিয়া কুড়ালের কোপ বসাইয়া দিয়াছিল—আর সেই সুযোগে সে ভাঙিয়া নিয়াছিল অফিসের ক্যাসবাক্স। কুড়ালের শাদা পুরু ফলাটা রক্তে রাঙা—সেই সঙ্গে চূর্ণ মস্তিষ্কের খানিকটা ঘিলু ছিটকাইয়া আসিয়া কপালে লাগিয়াছে গঞ্জালেসের। পকেট হইতে একটা রুমাল বাহির করিয়া সেগুলি মুছিতে মুছিতে কী একটা রসিকতা করিয়াছিল সে।

হাসিলে কী উজ্জ্বল যে দেখাইত ডেভিডের দাঁতগুলি।

স্যামুয়েলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আজ আবার তাহার বাপকে মনে পড়িল। সেই প্রশস্ত কপাল, সেই তীক্ষ্ণ উদ্ধত চোয়াল, ভুল হইবার কারণ নাই কোনোখানে। কেবল মুখে সে বিদ্রোহ নাই—আছে শান্ত খানিকটা দুর্বলতা মাত্র।

কয়েক মিনিট দুজনেই দুজনের দিকে চাহিয়া রহিল নীরবে। পায়ের নীচে এঞ্জিনের ছন্দে ছন্দে কাঠের মেজেটা দ্রুত লয়ে কাঁপিতেছে, প্যাডেলের গায়ে জলের

হু হু শব্দ। মাঝে মাঝে শাদা ফেনা বিকালের রোদে জাপানী বলের মতো রঙীন হইয়া ছিট্‌কাইয়া উঠিতেছিল আকাশের দিকে।

প্রশ্নটা গঞ্জালেস্‌ই করিল প্রথম।

—চিটাগাংয়ে কেন চলেছ তুমি?

ডি-সুজা বকের পাখার মতো শাদা ভুরু দুইটাকে দুই দিকে প্রসারিত করিয়া একটু হাসিল মাত্র—জবাব দিল না।

—ব্যবসা-ট্যাবসা আছে বুঝি?

—ব্যবসা? সতর্কভাবে ডি-সুজা চারিদিকে তাকাইল একবার। ডেকের একদিকটা একেবারে নির্জন—একটু দূরে কতকগুলি মুসলমান চিড়া আর আম লইয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ফলারে বসিয়াছে। নীচে প্যাডেলের আঘাতে বিচূর্ণ বিক্ষুব্ধ জল হইতে একটানা গর্জন উঠিতেছে। এঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ বাড়িতেছে; ক্রমাগত বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ তাহাদের চারিদিকে একটা ধ্বনির যবনিকা টাঙাইয়া দিয়াছে।

—ব্যবসা? দন্তহীন মুখে হাসিটাকে প্রকটিত করিয়া ডি-সুজা বললি, হাঁ, ব্যবসা আছে বটে। তবে সেটা নিতান্ত আইনসঙ্গত নয়—এই যা।

—তার মানে? গঞ্জালেস চমকিয়া উঠিল। ডি-সুজার সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যে বিচিত্র রহস্যের আবরণ, সেটা একটু একটু সরিতেছে যেন।

—তুমি ডেভিডের ছেলে তো? তোমাকে বলতে ভয় নেই তা হলে। আফিং কোকেনের কিছু কারবার আছে, তবে ডিউটি দেবার হাঙ্গামাটা আর পোয়াই না। বুঝেছ তো?

—বুঝেছি। শান্ত নিরুত্তাপ রক্তে আবার দোলা লাগিল গঞ্জালেসের। ডি-সুজার বয়স হইয়াছে, চুলগুলিতে সাদার নিষ্কলঙ্ক আস্তর। চোখ দুটি ম্লান—কিন্তু ঝড় পার-হইয়া-আসা নৌকার ছেঁড়া পাল আর ভাঙা দাঁতের মতো একটা নির্ভীক দৃঢ়তা তাহাকে ঘিরিয়া আছে।

—কোথায় গিয়ে উঠবে চিটাগাংয়ে?

ডি-সুজাকে চিন্তিত দেখাইল: তাই তো ভাবছি। আড্ডা যেটা ছিল সেটার ওপর ওদের নজর পড়েছে, কাজেই সেখানে ওঠা ঠিক হবে না। তা ছাড়া আধ মণ মাল আছে সঙ্গে—হোটেলে গিয়েও ওঠা যাবে না।

—আধ মণ!

—হাঁ, অন্তত এক হাজার টাকার জিনিস। তা ছাড়া ধরা পড়লে হেঁ—হেঁ—ডি-সুজা হাসিল: স্রেফ দশ বছর ঠুকে দেবে। তা এই বুড়ো বয়সে ওটা আর পারব না।

গঞ্জালেসের চোখে মুখে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল।

—কিছু যদি মনে না করো, আমার একটা আস্তানা আছে। সেখানে বেশ থাকতে পারা যাবে।

—মনে করব—বিলক্ষণ! আপ্যায়নের হাসি হাসিল ডি-সুজা : তুমি ডেভিডের ছেলে! কিন্তু তোমার জায়গাটা, কি বলে, কোনো ভয়টয় নেই তো?

—না, কোনো ভয়টয় নেই—আশ্বাস দিল গঞ্জালেস্।

অতএব পথেই দুজনের অন্তরঙ্গতা অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। আরো কয়েক ঘণ্টার পথ চট্টগ্রাম। ইহারই মধ্যে ডি-সুজা দিব্যি গল্প জমাইয়া লইল গঞ্জালেসের সঙ্গে। সে আর ডেভিড্ কী না করিয়াছে দুইজনে, পৃথিবীর কোন্ বৈচিত্র্য পরখ করিতে তাহারা বাকী রাখিয়াছে। তবে এখন আর সেদিন নাই। ইংরেজের আইন বড় বেশি কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছে—তা ছাড়া সেই সব দিনের দুঃসাহসী মনই বা আজকাল কোথায়! বাংলা দেশে যে সব পর্তুগীজ উপনিবেশ বাঁধিয়া আছে, ডাকাতি রাহাজানির চাইতে তাহারা এখন জমিতে লাঙল ঠেলিতে ভালবাসে, সাহেবী রেস্তোরায় বাবুর্চি হইতে চায়। 'জেণ্টুর'-দের সঙ্গে তাহারা এক পংক্তিতে নামিয়া বসিয়াছে—ইহার চাইতে অসম্মান ও অগৌরবের ব্যাপার সমগ্র পর্তুগীজ সমাজে আর কী হইতে পারে!

বলিতে বলিতে ডি-সুজা উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে, মুঠা করিয়া ধরে গঞ্জালেসের হাতটা। কব্জীর তলায় তামাটে চামড়ার নীচে তাহার ঠেলিয়া-ওঠা মোটা নীল শিরাগুলির রক্তের আন্দোলনে থর থর করিয়া কাঁপে; নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে দ্রুত তালে।

সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ বহিয়া যায় গঞ্জালেসের—যেন ডি-সুজার উত্তেজিত চাঞ্চল্যটা তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইতে শুরু করিয়াছে। বলে, ঠিক কথা।

ঠিক কথা নয়? স্বপ্নাতুর হইয়া ওঠে ডি-সুজার চোখ: পর্তুগীজদের দিগ্বিজয়ী নৌবহর ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলি পার হইয়া আবার কি আসিয়া দেখা দিতে পারে না? আগুন জ্বলিতেছে সপ্তগ্রামের বন্দরে। বন্দুকের শব্দে রাত্রির ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিতেছে থর থর শব্দে। বিবাহ-বাসর হইতে সুন্দরী মেয়েদের ছিনাইয়া আনিয়া বজরার অন্ধকারে সেই রাক্ষস-বিবাহ। আলীবর্দীর কামানের গোলাগুলির লাল আগুনের পিণ্ডের মতো সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু হার্মাদদের জাহাজকে তাহা স্পর্শও করিতেছে না।

শুধু কি তাই? বীররস হইতে ডি-সুজার মন মাঝে মাঝে বর্তমান পৃথিবীতেও ফিরিয়া আসে। ইহারই মাঝে মাঝে ডি-সুজা নিজের পরিবারের গল্পও বলে।

লিসিকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে—ওই মা-মরা নাত্‌নীটার জন্যই তাহার যা কিছু দুর্বলতা। ও না থাকিলে আবার হয় তো সমস্ত ভারতবর্ষটায় সে আর একবার অভিযান করিতে বাহির হইয়া পড়িত—কিন্তু লিসিকে ছাড়িয়াই থাকিতে পারে না। তাহার ঘর সংসার যাহা কিছু লিসিই আগলাইয়া রাখিয়াছে। নিজে ডি-সুজা সামান্য যা কিছু টাকা-পয়সা করিয়াছে তা ওই লিসির জন্যই। ভালো দেখিয়া একটা ছেলে জোটাইতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত।

ডি-সুজাকে গঞ্জালেসের ভালো লাগিয়া গেল।

চট্টাগ্রামে আসিয়া ডি-সুজা গঞ্জালেসের আতিথ্য লইল। শুধু আতিথ্যই লইল না—চর ইস্‌মাইল হইতে একটি বার ঘুরিয়া আসার সনির্বন্ধ অনুরোধও জানাইল তাহাকে। গঞ্জালেস্ রাজী হইল। তারপর একদিন চাঁদপুর হইতে নৌকায় পাড়ি দিয়া চর ইস্‌মাইলে আসিয়া দর্শন দিল।

প্রকৃতির একেবারে কোল ঘেঁষিয়া সদ্যোজাত শিশু চর ইস্‌মাইল। অবশ্য একেবারে সদ্যোজাতও নয়। ইতিহাসের দিক দিয়া খুঁজিতে গেলে গত তিনশো বছর ধরিয়া সমুদ্রচারী জলদস্যুদের সে সযত্নে আশ্রয় দিয়াছে—এককালে এখানে তাহাদের বিরাট উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে উপনিবেশ অবশ্য নদীগর্ভে অনেকখানি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু মাটির মধ্যে পুঁতিয়া যাওয়া মরিচা-পড়া কামান সেদিনের স্মৃতি বহিয়া আজও মুখ তুলিয়া আছে আকাশের দিকে।

তবু চর ইস্‌মাইল শিশু। শিশুর মতো অপরিণত—শিশুর মতো নিজেকে ভাঙিয়া চলে। চূর্ণ খেলনার ধূলি ভাঁটার টানে নামিয়া যায় বঙ্গোপসাগরে। দেহ আর মনের ক্ষুধা আদিম অমার্জিত রূপ লইয়া দেখা দেয়। অতীত নাই—কিন্তু বাতাসে বাতাসে তাহার নিশ্বাস এখনো ফুলের গন্ধের মতো ছড়াইয়া আছে।

এমনি একটা পটভূমিতে গঞ্জালেস্ দেখিল লিসিকে।

আরাকানী-খাদমিশানো তামাটে মুখে ছোট ছোট চোখ দুটিকে আরো ছোট করিয়া লিসিও তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। নির্ভয় নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি। বলিল, তুমি কে?

ভাব দেখিয়া গঞ্জালেসের হাসি পাইল। বলিল, দেখতেই পাচ্ছ।

—ওঃ, তুমি স্যামুয়েল গঞ্জালেস্, তাই না? ঠাকুর্দা তোমার খুব গল্প করছিল।

—তা হবে।

লিসি আর একবার ভালো করিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল: তুমি গাছে উঠতে পারো?

—গাছে? বিস্মিত হইয়া গঞ্জালেস্ বলিল, গাছে কেন?

—গাছে কেন কী? লিসিকে ততোধিক বিস্মিত মনে হইল: নারকেল পাড়তে হবে যে।

—নারকেল পাড়তে! না, সে আমি পারবো না।

অসীম অবজ্ঞা ও অনুকম্পায় লিসি চোখ মুখ কুঞ্চিত করিল: গাছে উঠতে পারো না তো অমন চেহারাখানা রেখেছ কেন? আমি গাছে উঠতে পারি তা জানো?

—সত্যি নাকি!

—ওঃ, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

কথাটা বলবার অপেক্ষামাত্র, তারপরেই কিছু আর করিতে হইল না। চট্ করিয়া কাপড়-চোপড় একটু সামলাইয়া দা হাতে লিসি কাঠবেড়ালীর মতো তর্ তর্ করিয়া নারিকেল গাছে চড়িয়া বসিল। তারপর সেখান হইতে বিজয়িনীর মতো গলা বাড়াইয়া গঞ্জালেস্‌কে ডাকিয়া কহিল, এই দেখলে তো?

গঞ্জালেস্ দেখিল এবং দেখিবামাত্র ভাবান্তর ঘটিয়া গেল তাহার।

লিসি গাছ হইতে ঝুপঝাপ্ করিয়া গোটাকয়েক ঝুনো নারিকেল নীচে ফেলিয়া আবার তেমনি অবলীলাক্রমে নামিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। আর সেই মুহূর্তে গঞ্জালেসের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। পরিশ্রমে লিসির তামাটে মুখখানা চমৎকার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কপালের প্রান্তে প্রান্তে ঘামের বিন্দু। তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া গঞ্জালেসের নেশা ধরিয়া গেল।

দু পা আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ গঞ্জালেস্ লিসির একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, বাঃ, তুমি তো দেখতে বেশ।

লিসি ভ্রূভঙ্গী করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু খুব যে এমন একটা ভয় পাইয়াছে তাহা মনে হইল না। বলিল, বেশ তো, তাতে তোমার কী?

—কিছু কাজ আছেই তো। আচ্ছা, পছন্দ হয় আমাকে?

হাত ছাড়াইয়া লিসি প্রস্থানের উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া সোজা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—কেন পছন্দ হবে তোমাকে? নারকেল গাছে উঠতে পারো না, খালি লম্বা চওড়া চেহারা থাকলেই চলে?

ব্যাপারটা গঞ্জালেস্ আরো সোজা করিয়া আনিল: আচ্ছা, নারকেল গাছে চড়াটা না হয় রপ্ত করে নেব। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবে তুমি?

—বিয়ে! তোমাকে! লিসি তাহার মঙ্গোলিয়ান মুখখানাকে এমন ভাবে

বাঁকাইল যে গঞ্জালেস্ একেবারে সংকোচে জড়োসড়ো হইয়া গেল : তার চাইতে ভুঁড়ো ডি-সিল্‌ভাকে বিয়ে করলে ক্ষতি কী?

ভুঁড়ো-ডি-সিল্‌ভা ব্যক্তিটি কে, সে সংবাদটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার আগেই বেগে লিসি গেল অদৃশ্য হইয়া। দূরে কোথা হইতে চমৎকার বাঁশির স্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল—বাজাইতেছিল জোহান!

লিসির কাটা-ছাঁটা স্পষ্ট জবাবে গঞ্জালেস্ কিন্তু খুশি হইয়া গেল। চর ইস্‌মাইলের এই রুদ্রতায় লিসির এমনি বন্যতাই তো স্বাভাবিক। আরো বিশেষ করিয়া পর্তুগীজদের রক্ত তাহার শরীরে। তাহার ঠাকুর্দা ইংরেজের আইনকে অস্বীকার করিয়া আফিঙের ব্যবসা চালাইয়া চলিয়াছে।

কথাটা শেষ পর্যন্ত ডি-সুজার কাছে সে পাড়িল।

ডি-সুজা এক রকম মুখিয়া ছিল বলিলেই হয়। দন্তহীন মুখে প্রাণপণে যে মুরগীর ঠ্যাংটাকে সে কায়দা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কথাটা শোনা মাত্র সেটা ঠকাস্ করিয়া প্লেটের উপর খসিয়া পড়িল। ঝোলমাখা পাকা গোঁফ জোড়া খাড়া করিয়া ডি-সুজা বলিল, বটে বটে!

—যদি আপত্তি না থাকে—

—আপত্তি! কী বলছ তুমি! ডি-সুজা মুরগীর ঠ্যাং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেল, বলিল, আমি তো সেই কথাই ভাবছিলাম। ডেভিডের ছেলে তুমি, তোমার মতো যোগ্যপাত্র আর কোথায় মিলবে। বললে বিশ্বাস করবে না, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি, সেদিন থেকেই ভাবছি লিসিকে তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।

বিনয়ে গঞ্জালেস্ মাথা নত করিয়া রহিল।

ডি-সুজা কহিল, এর মতো সুখের কথা আর কী আছে। দাঁড়াও লিসিকে আমি এক্ষুনি ডাকছি।—বলিয়া ঝোল মাখা গোঁফজোড়া ফুলাইয়া চীৎকার করিয়া সে লিসিকে ডাকিল।

লিসি আসিয়া উপস্থিত হইল। ডি-সুজার মুখের অবস্থাটা লক্ষ্য করিয়া কহিল, কী হয়েছে? কেন মিছামিছি চ্যাচাচ্ছ অমন করে?

—বাঃ, চ্যাঁচাব না? এই—একে চিনিস্ তো? ডেভিড গঞ্জালেসের ছেলে?

বাঁকা কটাক্ষে গঞ্জালেসের দিকে চাহিয়া লিসি বলিল, হুঁ, খুব চিনি।

—খালি চিনলেই চলবে না।

—কী করতে হবে তবে?

—ওকে বিয়ে করতে হবে তোর।

বিয়ে। কী সব যা তা বলছ ঠাকুর্দা! লিসি ঠাকুর্দাকে ধমকাইয়া উঠিল এক রকম। ডি-সুজা লিসির কথার সুরে থতমত খাইয়া গেল। তাহার আকস্মিক উৎসাহে মস্ত একটা আঘাত লাগিয়াছে।

—বিয়ে! যাকে তাকে ধরে বিয়ে করলেই হয় বুঝি!

—যাকে তাকে কিরে! ডেভিডের ছেলে যে ও—ডি-সুজা বিস্মিত শ্রদ্ধায় থামিয়া গেল। ইহার চাইতে বড় পরিচয় কী আর হইতে পারে মানুষের? অন্তত সে তো জানে না।

কিন্তু এ পরিচয়ে লিসি বিচলিত বা বশীভূত হইল না। বলিল, হলেই বা ডেভিডের ছেলে, নারকেল গাছে যে উঠতে পারে না সে খবর রাখো?

ডি-সুজা চটিয়া গেল: কেন, নারকেল গাছে ওঠাটা এমন কী ভয়ানক ব্যাপার? জানিস্, এমন ছেলে আজকালকার দিনে দেখা যায় না? কত বড় ব্যবসা, কত টাকা—কেমন সুখে রাখবে বল দিকি?

—ছাই!

ডি-সুজা তাতিতেছিল, আগুন হইয়া গেল একেবারে। চীৎকার করিয়া কহিল, এ সব কথা কার কাছে শুনেছিস্ তুই? জোহান বুঝি?

—তুমি আবার পাগলের মতো চ্যাচাচ্ছ ঠাকুর্দা!

নাঃ, চ্যাচাব না! ঝোলা মাথা গোঁফ জোড়া শিকারী বিড়ালের মতো ফুলাইয়া ডি-সুজা সরোষে কহিল, পাজী, নচ্ছার হতভাগা! মেরীর নাম করে বলছি, একদিন ওর সব কটা দাঁত উড়িয়ে দেব আমি।

গঞ্জালেস্ বোকার মতো বসিয়াছিল এতক্ষণ। বড় বেশি বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে বোধ করিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, আহা-হা, কেন মিথ্যে মাথা গরম করছ।

—না, মাথা গরম করব না, একেবারে ঠাণ্ডা জল হয়ে থাকব। জোয়ানের মতলব আমি কিছু বুঝি না আর? কেবল আমার বড়-মোরগটা? লিসিকে শুদ্ধ বাগাবার চেষ্টায় আছে ও।

লিসি খানিকক্ষণ চোখ দুথটা বড় বড় করিয়া ডি-সুজার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে—অনেকটা যাদুকরেরা যেভাবে সম্মোহন-বিদ্যা প্রয়োগ করে সেই রকম। ফলও পাওয়া গেল অবিলম্বেই।

ডি-সুজা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুর নরম হইয়া আসিল তাহার। কহিল, বাঃ, অমন করে তাকিয়ে আছিস্ যে! আমি—আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি?

লিসি গম্ভীর গলায় বলিল, হুঁ। ফের যদি তুমি ওই সব আবোল্ তাবোল্ বকবে, তা হলে আমি ঠিক ওই জোহানের সঙ্গে সোজা চলে যাব।

একবার আঁৎকাইয়া উঠিয়াই ডি-সুজা থামিয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা গঞ্জালেসের কিন্তু ভারী ভালো লাগিয়া গিয়াছিল। লিসির বন্যতাটা তাহার চোখে যত বেশি করিয়া পড়িতে লাগিল, ততই সে দিনের পর দিন প্রলুব্ধ বোধ করিতে লাগিল নিজেকে। মদটা তীব্র না হইলে নেশা জমিতে চায় না—একপাত্র হুইস্কির মতোই লিসি আকর্ষণ করিতেছিল তাহাকে। নারিকেল গাছে উঠিতে না পারিলেও সে প্রতীক্ষা এবং প্রত্যাশা করিয়া রহিল।

কিন্তু চর ইস্মাইলে পড়িয়া থাকিলেই গঞ্জালেসের চলে না। তাহার বিরাট ব্যবসা আছে—দায়িত্ব এবং কাজের অভাবও নাই। সুতরাং একদিন তাহাকে আবার চট্টগ্রামে ফিরিতে হইলই। যাইবার আগে সে আশা লইয়া গেল যে লিসির কৃপাদৃষ্টি শেষ পর্যন্ত তাহার উপরে নিশ্চয়ই পড়িবে।

ডি-সুজা কহিল, ডেভিডের ছেলে তুমি—আমাদের গৌরব। বাপের নাম বাঁচিয়ে রাখা চাই। শুভেচ্ছাটা গঞ্জালেস মাথা পাতিয়া লইল বটে কিন্তু বাপের নাম বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য খুব প্রবল একটা উৎসাহ বোধ করিল না। ডেভিডের চরিত্রের দুঃসাহসিক দিকটাকেই সে শ্রদ্ধা করিয়াছে শুধু, তাহার কার্য-তালিকা খুব অনুকরণযোগ্য বলিয়া ভ্রম তাহার কখনো হয় নাই।

২

ইহার পরে ছয় মাসের মধ্যে গঞ্জালেস্ আর চর ইস্মাইলের খোঁজ খবর নিতে পারে নাই।

নদীতে জোয়ার-ভাঁটা চলিতে লাগিল অব্যাহত নিয়মে, বসন্তের স্পর্শে নদীর জল আরো বেশি করিয়া লবণাক্ত হইয়া আসিল। বিলে কলমীর ফুল ফুটিল—শ্যাওলার মধ্যে বুনো-হাঁস চোখ বুজিয়া রোদ পোয়াইতে লাগিল, আর নদীর স্রোতে বহিয়া আনা প্রচুর পলি-মাটির সহায়তায় জীবন-কীটেরা নূতন উপনিবেশের বীজ রচনা করিয়া চলিল।

এমনি একদিনে—এক বৈশাখী অপরাহ্ণে উপনিবেশের উপর দিয়া কালো ঝড় ঘনাইয়া আসিল।

তাণ্ডব শুরু হইল নদীতে—ফেনার মুকুট তুলিয়া কালো কালো ঢেউ আসিয়া

আছড়াইয়া পড়িল তীরের গায়ে। ধ্বংসাবশিষ্ট গীর্জাটার পাশে যেখানে রাশি রাশি গাছের শিকড় জলের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ওখানে ঝর্ ঝর্ করিয়া মাটি জলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তও চোঁয়াইতে লাগিল—জোহানের রক্ত।···

বর্মীদের বজরাটা ইহার মধ্যে কতদূর চলিয়া গিয়াছে কে বলিবে। ঝড়ের মুখে পাল তুলিয়া দিয়াছে তাহারা! তেঁতুলিয়ার মোহনা পার হইয়া সমুদ্রের দোলায় দুলিতে দুলিতে তাহারা চলিয়াছে ইরাবতীর দেশে। সেখানে এখন পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল ফুটিতেছে, প্যাগোডা হইতে ধূপের গন্ধ উঠিতেছে, শত শতাব্দীর নশ্বর-চিহ্নকে অস্বীকার করিয়া বরাভয় বিতরণ করিতেছে ধ্যানমগ্ন শিলামূর্তি। ম্লান আলোয় চকিতের জন্য তাহাদের বজরায় লিসির ভয়ার্ত মুখখানা দেখা গেল, তারপরেই হয় তো তাহা দৃষ্টির বাহিরে চিরদিনের মতো বিলীন হইয়া গেল।···বর্মীটা হাসিতেছে। পর্তুগীজদের বীরত্বের আদর্শ হইতে যে শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে—সে শিক্ষা এমনি করিয়াই কাজে লাগাইল শেষ পর্যন্ত!

কিন্তু ঝড় চলিতেছে তেঁতুলিয়ায়। কালো অন্ধকারে ঈগলের মতো পাখা মেলিয়া বজরার দুর্দম গতি দিকচক্র-বালে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

আর হরিদাস সাহার পান্সী নৌকা? এই প্রলয়-তুফানে তাহা নির্বিঘ্নেই পাড়ি জমাইতেছে কি? অথবা সৃষ্টিছাড়া যাযাবরের সমস্ত যাত্রা আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে রাক্ষসী-নদীর মৃত্যু তাণ্ডবে? কেরামদ্দীর ভাবনা কোথাও যেন কূল পাইতেছিল না।

কিন্তু সব চাইতে কঠিন সমস্যা বোধ করিতেছিলেন কবিরাজ বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন।

মুক্তো উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতেছে। খোলা জানালা দিয়া জলের ছাট তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইতেছে, চুল কপাল বহিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া পড়িতেছে, আর তাহার সঙ্গে মিশিতেছে চোখের জল। বৃষ্টিতে কাপড়টা ভিজিয়া দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গেছে—শরীরের রেখায় রেখায় নির্ভুলভাবে আসন্ন মাতৃত্ব।

বাইরে ঝড়ের বিরাম নাই। ঘরের মধ্যে ক্ষিপ্ত বাতাস ঢুকিয়া তাণ্ডব করিতেছে যেন—কিন্তু মুক্তোর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই বিন্দুমাত্রও। আর বলরাম তাকাইয়া আছেন বজ্রাহতের মতো! ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়, বরং এর চাইতে সঙ্গত এবং সম্ভব কিছুই নাই। তবু বলরাম কী বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, কেবল মুক্তোর কাতর মুখটা তাঁহার দৃষ্টির সামনে জাগিতে লাগিল দুঃস্বপ্নের মতো।

বলরাম কহিলেন, কেঁদে কী হবে মুক্তো। ব্যবস্থা একটা তো করতেই হবে।

মুক্তোর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, ব্যবস্থা! ব্যবস্থা আবার কী করবে! এই জন্যেই তুমি এত আদর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে, আমার সর্বনাশ করবার জন্যে?

—সর্বনাশ! তাই তো।

বলরাম ঘাড় এবং মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। সর্বনাশ—তা বটে। বংশরক্ষা করাটা দেহধর্মের প্রধান কর্তব্য; বংশধরের মুখ দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে মানুষের মন। কিন্তু সেই বংশধর যে সময়বিশেষে কী ভয়ানক শত্রু হইতে পারে সেটা অনুভব করিয়া বলরাম অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলেন।

চর ইস্মাইলের এই নির্জন সমাজহীন দেশ—এখানে অনেক কিছুই সম্ভব হইতে পারে, কাজেই মোটের উপর একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু—

মুক্তো আবার বিলাপ করিয়া কহিল, আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার সর্বনাশ করাই তোমার মতলব। তবুও বিশ্বাস করেছিলুম। ভেবেছিলুম—

বলরাম চটিয়া গেলেন—পৌরুষটা বেশ সজাগ হইয়া উঠিতেছে এতক্ষণে। সব দোষ বুঝি তাঁহার ঘাড়ে গিয়া পড়িল শেষ পর্যন্ত। এই সর্বনাশের জন্য মুক্তোর যেন কোনো দায়িত্বই নাই। গঙ্গাজলে ধৌত বিশুদ্ধ একটি তুলসীপত্র আর কি! তবু যদি সব কথা বলরাম না জানিতেন। দেশে থাকিতে সে যে কতগুলি ছেলের মাথা খাইবার উপক্রম করিয়াছিল সেটা তো আর জানিতে বাকী নাই কাহারও। ইহাকেই বলে কলিকাল!

বলরাম চটিয়া গেলেন—শুধু মুক্তোর উপরে নয়, সমস্ত পৃথিবীর উপরেই। কাহারো ভালো করিতে নাই জগতে, ভালোবাসিতে নাই কাহাকেও। এতদিন বেশ তো কাটিতেছিল, দয়া-পরবশ হইয়া মুক্তোকে আশ্রয় দিয়াই না এই বিভ্রাট ঘটিল। কী অন্যায় তিনি করিয়াছেন? শুধু আশ্রয় দিয়াছেন বলিলে কম বলা হয়—মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছেন বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না। কাপড় চোপড়, ভালো খাবার দাবার, এমন কি, দু-চারখানা গয়না পর্যন্ত। বলরাম তো আর দেবতা নন যে কেবল দিয়াই চলিবেন, তাহার পরিবর্তে একটুকু দাবি তাঁহার থাকিবে না। মুক্তোর এমন রূপ-যৌবনও বৃথাই তো নষ্ট হইতেছিল।

ঝড় চলিতেছে সমানে। একটা অশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ আর ঘনাইয়া আসা তরল অন্ধকারের অতি তীব্র গতিশীলতা। হুড়মুড় করিয়া একটা নারিকেল গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল বুঝি। তেঁতুলিয়ার জলে যে মাতন চলিতেছে, এখান হইতেও তাহা যেন অনুভব করা যায়।

কিন্তু এই অবাঞ্ছিত আগন্তুক। মুক্তোর গর্ভে যে শিশু আসিতেছে তাহাকে লইয়া

কী করা যাইতে পারে? বলরাম ভাবিতে লাগলেন। মনের সামনে অনেকগুলি শিকড়-বাকড়ের নাম খেলিয়া গেল, বলরামের কবিরাজী প্রতিভা জাগিয়া উঠিতেছে। এখন এই একটা মাত্র পথ খোলা আছে—কিছু হয় তো এতেই হবে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইতেছে। ঝড়টা এইবারে থামিবে বোধ হয়—মুক্তো এখন একটা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেলে পারিত। কিন্তু আজ আলো জালিবার উৎসাহ নাই তাহার।

দরজায় জোর ধাক্কা পড়িল কয়েকটা।

বলরাম উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই রাধানাথ প্রবেশ করিল। ভিজিয়া ভূত হইয়া আসিয়াছে। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দাঁড়াইতেই ছোটখাট একটা নদী বহিয়া গেল যেন।

বলরাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কোত্থেকে এলি!

রাধানাথ কহিল, কোত্থেকে আবার আসব! দিদিমণি পাঠিয়ে ছিলেন—পথে আসতে আসতেই ঝড়ে ধরে নিলে। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলুম—হুড়মুড় ক'রে একটা মস্ত ডাল আমার গা ঘেঁষে পড়ল বাবু। আর দু হাত এদিকে পড়লেই রাধানাথের আর পাত্তা মিলত না।

—পাত্তা না মিললেই ভালো হত। কুড়ের বাদশা কোথাকার।

—আজ্ঞে আপনি তো বলছেন ভালো হত, কিন্তু রাধানাথের রাধা যে বিধবা হত সে খেয়াল নেই বুঝি?

উত্তর-দায়ক ভৃত্যের রসিকতার দুশ্চেষ্টা দেখিয়া আরও ক্ষেপিয়া গেলেন বলরাম। কহিলেন; যা, যা, ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিস নি। কিন্তু দিদিমণি কোথায় পাঠিয়েছিল?

রাধানাথের স্বরেও এবার অসন্তোষ প্রকাশ পাইল, তুমি যে সদরের উকিলের মত জেরা শুরু করলে বাবু, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ জবাব দেব শুনি? ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিল।

—ওষুধ! কী ওষুধ?

—এই দেখ না—রাধানাথ কোঁচড়টা খুলিয়া দেখাইয়া দিল। আধো অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, একরাশ সবুজ উজ্জল ফল বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার কাপড়ের মধ্যে চিক চিক করিতেছে।

—কী ফল রে ওগুলো? বলিয়া একটা ফল হাতে তুলিয়া লইতেই ভয়ে ও বিস্ময়ে বলরাম কথা কহিতে পারিলেন না। করবী ফুলের একরাশ গোটা। এগুলি ওষুধই বটে—ভবরোগের ওষুধ—কয়েকটা বাটিয়া খাইলেই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে নশ্বর

দেহযন্ত্রণাটা বেশিক্ষণ ভোগ করিতে হয় না। বিসূচিকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিছুটা রক্ত বমি হইয়া তারপরেই—ব্যস্! মুক্তোর মতলব তাহা হইলে—

কথাটা ভাবিতে গিয়াও বলরামের মস্তিষ্কের সমস্ত কোষগুলি একসঙ্গে যেন ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া বাজিয়া উঠিল। আত্মহত্যার মতলব আঁটিতেছিল মুক্তো! ব্যাপারটা কি এতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে আত্মহত্যা না করিয়া তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই! কিন্তু পুলিশে একবার খবর পাইলে ফাঁসির দড়ি তাঁহারই গলায় আঁটিয়া বসিবে যে!

ব্যাপারটা সূচনামাত্র অনুধাবন করিয়াই রোষে বলরাম বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন!

—আমাকে ফাঁসিতে চড়াবি তোরা! হতভাগা উজবুক কোথাকার! যাইবার জন্য পা বাড়াইতেছিল, রাধানাথ, কিন্তু বলরামের এই আকস্মিক বিস্ফোরণে থমকিয়া দাঁড়াইল।

—কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? কী হয় নি তাই শুনি? উঃ কী ভয়ানক লোক সব! তলে তলে এই কাণ্ড চলেছে!

—বক্ বক্ করে মরো গে তুমি, আমি চললুম—রাধানাথ সত্য সত্যিই চলিয়া গেল।

অন্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন বলরাম। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত রূপ লইতেছে। সন্তান আসিতেছে—আসুক না। যদি কোনমতেই ঠেকানো না যায় তাহা হইলে গলা টিপিয়া মারিয়া তেঁতুলিয়ার জলে ফেলিয়া দিলেই চলিবে। এ তো ফরিদপুর নয় যে চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে বড়লাট পর্যন্ত ইংরেজের আইন সঙ্গীন্ খাড়া করিয়া আছে।

কিন্তু মুক্তো? জীবন সম্বন্ধে কেন সে এত তিক্ত হইয়া উঠিতেছে, কেন এমন আকস্মিক ভাবে সে নিজেকে শেষ করিয়া দিতে চায়? দেশে গাঁয়েও তো এমন কত ঘটনা হয় বলরাম কি তাহা জানে না? ডাক্তার কবিরাজের পিছনে কয়েকটা টাকা খরচ করিলেই ত যথেষ্ট। দিনকয়েক কানাঘুষা, সামান্য কিছু আলোচনা—তাহার পরেই আর কোন কলরব নাই। যেমন চলিতেছিল—তেমনি ভাবেই কাটিয়া চলে যথানিয়মে।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মুক্তোর বৃষ্টিসিক্ত করুণ মুখখানির কথা ভাবিয়া বলরাম এই মুহূর্তে কেন যেন অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। হাজার হউক, মুক্তো তাঁহার আশ্রিত, একেবারে অতটা না' করিলেও চলিত। কিন্তু সেই সব মুহূর্ত—রক্ত-

তরঙ্গিত স্নায়ুতে সেই মূঢ় বিহ্বলতা। কতদিন যে বলরামের কাটিয়াছে শুষ্ক নিঃসঙ্গতায়, নারীসঙ্গহীন তীব্র একাকিত্বে। বলরাম ভীরু, বলরাম কাপুরুষ।

সেই ভীরু যখন তাহার চাইতেও ভীরুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে অত্যাচারী পশুশক্তিটা দেখা দিয়াছে দ্বিগুণ রূপ লইয়া। যে দুর্বল চিরদিন সকলের কাছে লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াই আসিয়াছে, সে যখন তাহার চাইতে দুর্বলকে আয়ত্তের মধ্যে পায়, তখন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হইয়া উঠে তাহার মূর্তি। সকলের কাছ হইতে যাহা সে পাইয়াছে, সে বস্তু একজনকেই সম্পূর্ণভাবে বর্ষণ করিয়া মানসিক ক্লীবত্বের ঋণমুক্ত হইতে চায় সে।

ঝড় থামিয়া গেছে সম্পূর্ণভাবে। শুকনো পাতার উপর থাকিয়া থাকিয়া ঝর্ ঝর্ শব্দে এক এক পশলা জল ঝরিয়া পড়িতেছে মাত্র। তেঁতুলিয়ার গর্জন আর শোনা যায় না। শুধু ঘরের মুক্তো এখনো নিতান্ত অকারণে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। আর কাচভাঙা দেওয়ালে ঘড়িটা ক্রমাগত টক্ টক্ করিতেছে—যেন অত্যন্ত জোরে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবেই।

৩

উৎসব শেষ হইয়া গেল।

আকাশের প্রান্তে যাহারা কালো কালো মৃদঙ্গে ঘা মারিয়া নদীর উপর নাচিতে শুরু করিয়াছিল, তাহাদের আর খুজিয়া পাইবার জো নাই। কোঁকড়ানো চুলের মতো নদীর জল এখনও ফুলিয়া উঠিতেছে—দিক দিগন্তে ফস্‌ফরাসের উজ্জ্বল দীপ্তি-কণিকা ফুটিয়া পড়িতেছে, ফাটিয়া পড়িতেছে এখনও। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া আর ভয় করে না। ওপার হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিতেছে : নদীর মুখের উপর হইতে কে একখানা কালো ঘোমটা সরাইয়া নিল যেন। জলের হাসি দেখিলে এখন কাহার মনে হইবে যে একটু আগেই পাতাল হইতে একশোটা রাহু পৃথিবীর সমস্ত আলো গিলিয়া খাইবার জন্য ইহার তলা হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছিল।

উৎসব শেষ হইয়া গেল—যাহারা উৎসবে যোগ দিয়াছিল, ঝোড়ো হাওয়ায় পাখা মেলিয়া উড়িয়া গিয়াছে তাহারা। শুধু চাঁদ নয়, মেঘের আড়াল সরিয়া ধোঁয়াটে তারাগুলি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সপ্তর্ষি নামিতেছে একেবারে জলের কোল পর্যন্ত। কেবল উৎসবের সাক্ষী হইয়া আছে ভূলুণ্ঠিত কতকগুলি সুপারী গাছ—আর নাচের সময় কাহার হাত হইতে একটা সোনার বালা যে খসিয়া পড়িয়াছিল তাহারি

উত্তাপে দীর্ণদগ্ধ একটা তালগাছ হইতে এখনো উৎকট গন্ধকের গন্ধ উঠিয়া আকাশ বাতাসকে ছাইয়া ফেলিতেছে—মুমূর্ষুর খানিক বিষাক্ত নিশ্বাসের মতো।

ঝড় থামিতেই ডি-সিল্‌ভার মনে হইল, গোরুগুলির একবার খোঁজ লইলে ভালো হয়। ঝড় শুরু হইবার আগে তাহাদের সবগুলি ফিরিয়া আসে নাই, গাছ চাপা পড়িয়া দু-একটা মরিয়াছে কিনা কে বলিবে। বিশেষত শাদা-কালোয় মিশানো যে বড় গোরুটা দু বেলায় পাঁচ সের করিয়া দুধ দেয় তিন-চার দিনের মধ্যেই বাচ্চা হইবে সেটার। এই দুর্বৎসরে সেটা খোয়া গেলে বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া যাইবে।

একটা লণ্ঠন লইয়া ডি-সিল্‌ভা বাহির হইয়া পড়িল। বৈশাখ আসিতে অবশ্য দু মাস দেরী, তবু ইহাকে চরের প্রথম কালবৈশাখী বলা যাইতে পারে! জোরটা নেহাৎ কম হয় নাই। নদীতে কতগুলি নৌকা যে মারা পড়িয়াছে কে জানে। দু-একটা মড়া আসিয়া চরে ঠেকিলে হয় তো সেটা সঠিকভাবে জানিতে পারা যাইবে! গাছ অনেকগুলি পড়িয়াছে। জোহানের চালা হইতে তিন-চারখানা টিন আসিয়া উড়িয়া নামিয়াছে রাস্তায়।

চাঁদ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু নানা গাছের ছায়ায় খানিকটা ঘন অন্ধকার। পায়ের তলায় জল ছপ্‌ ছপ্‌ করিয়া উঠিতেছে, ওপাশ দিয়া ওটা কী চলিয়া গেল? বাপরে—প্রকাণ্ড একটা খ'য়ে জাতি! চার হাতের কম লম্বা হইবে না। ডি-সিল্‌ভা লাফাইয়া তিনি পা সরিয়া গেল। কিন্তু লিসির মতোই সাপটাও ডি-সিল্‌ভাকে নগণ্য বোধ করিল কিনা কে জানে—অন্তত লক্ষ্য করিল না।

ঝড়ের পরে চর ইস্‌মাইল ঘুমাইয়া আছে শিশুর মতো শান্ত হইয়া। কোথাও কোনো কলরব নাই, সব যেন রহস্যময় ভাবে নীরব। অন্ধকার গ্রামের পথে ডি-সিল্‌ভার ভয় করিতে লাগিল। এখানে ওখানে জমাটবাঁধা জোনাকীর পুঞ্জ—আলোগুলো যেন ভূতের মতো দেখিতে। নূতন বৃষ্টির জল পড়িয়া ভিজা ঝরা পাতা আর কাদার গন্ধ উঠিতেছে।

ডি-সিল্‌ভা চিৎকার করিয়া ডাকিল, জোহান, জোহান!

পাত্তা মিলিল না।

—এই সন্ধ্যে বেলায় ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? জোহান!

তবুও সাড়া মিলিল না।

ওপাশেই ডি-সুজার বাড়ি। এও যেন একটা ঘুমন্তপুরী হইয়া আছে। কোনখানে একটা সাড়াশব্দ পাইবার যদি আর জো থাকে। অবশ্য, ডি-সিল্‌ভা প্রাণ গেলেও ডি-সুজার সঙ্গে যাচিয়া আর আলাপ করিতে রাজী নয়—বিশেষত সেদিনের সেই ব্যাপারের পর। সে ভুঁড়ো, সে অকর্মা—এসব অপবাদ এবং অপমান ডি-সিল্‌ভা

মরিয়া গেলেও ভুলিবে না কোনোদিন। বরং যেমন করিয়া হোক ইহার শোধ লইবে! মেরীর নাম করিয়া সে শপথ করিয়াছে, চালাকি নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন সময়—এইরকম অন্ধকারের মধ্যে ডি-সুজার এক-আধটা কাশির আওয়াজ শুনিতে পাইলেও খুশি হইত মনটা।

তিন-চারটা গাছ পড়িয়াছে ডি-সুজার। দরজাটা হাঁ করিয়া খোলা। বাড়িতে মানুষ নাই নাকি? ডি-সিল্‌ভার আরো খারাপ লাগিতেছে। পথ চলিতে চলিতে ডি-সিল্‌ভা নিজের মনে গুন্ গুন্ করিয়া বাইবেল আওড়াইতে লাগিল। কিন্তু অস্থির চঞ্চল মন—ঈশ্বর আর শয়তানের মধ্যে বারে বারে গণ্ডগোল বাধিয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের কৃপা চাহিতে গিয়া সে বারে বারেই চাহিতেছে শয়তানের কৃপা।

দুত্তোর শয়তান! একেবারে মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি তাহার? চুলোয় যাক গোরু—এমন রাত্রে সেটাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিলেই হইত। তা ছাড়া যে সাপ সে দেখিয়াছে, ওই রকম আর একটা ফণা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেই তো—

ডি-সিল্‌ভা ফিরিয়া যাইবার প্রেরণা বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু জঙ্গলের আড়ালটা সরিয়া গেছে—এতক্ষণে মাথার উপর তারা-ভরা আকাশ ও চাঁদ ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। আর ওদিকে পোস্ট অফিসের জানালায় একটা বড় আলো জ্বলিতেছে, তবে আর ভয়টা কিসের?

ভাঙা গির্জার ওদিকটায় একবার খুঁজিয়া আসিতেই হইবে।

ভয়টা অবশ্য ওদিকেই—এক সময়ে ওখানে গোরস্থান ছিল। লোকে বলে, জায়গাটা জিন-পরীর আস্তানা। তবে গোরস্থান বলিতে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নাই। ডি-সিল্‌ভার চোখের সামনেই তো প্রতিবছর একটু একটু করিয়া ভাঙিতে ভাঙিতে তাহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে। তবুও—

সাহসে ভর করিয়া ডি-সিল্‌ভা আগাইয়া চলিল।

গাছের ছায়ায় শাদা মতো কী পড়িয়া আছে ওটা? তাহার গোরুটাই নয় তো? বসিয়া বসিয়া জাবর কাটিতেছে বোধ হয়। সমস্ত গ্রামটা খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে হয়রাণ, আর এদিকে—

কিন্তু কয়েক পা আগাইতেই ভয়ে ডি-সিল্‌ভার মাথার চুলগুলি খাড়া হইয়া গেল। গলা হইতে একটা চিৎকার বাহির হইতে আসিতে না আসিতেই থামিয়া গেল অর্ধপথে! হাত হইতে লণ্ঠনটা মাটিতে পড়িয়া বার কয়েক দপ্ দপ্ করিল, তারপরেই নিবিয়া গেল সেটা। যা দেখিয়াছে তা যেন এখনো বিশ্বাস হইতেছে না।

জোহানের রক্তাক্ত কবন্ধ দেহটাই চোখে পড়িয়াছিল ডি-সিল্‌ভার।

বর্মী মেয়েই শেষ পর্যন্ত দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, বড় বেশি অন্ধকার, তাই না?

কথা কহিবার প্রেরণা ছিল না। তবু মণিমোহন জবাব দিল, তা হোক, টর্চ আছে আমার সঙ্গে।

বর্মী মেয়ে তাহার টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে মিষ্টি একটুখানি হাসি ফুটাইয়া তুলিল।

—আর কোনোদিন এদিকে আসবে না বোধ হয়?

—না!

—আমার ওপর রাগ করেছ তুমি?

—কারো ওপর কোনো রাগ নেই আমার—মণিমোহন আর কথা বাড়াইতে চাহিল না। বড় বড় পা ফেলিয়া সে চলিতে লাগিল। সমস্ত শরীর মনে অসহ্য গ্লানি আর বিরক্তি। স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই ঝড়ের সন্ধ্যা তাহার জীবনে থাকিবে একটা দুঃস্বপ্ন হইয়াই।

দূর হইতে বর্মী মেয়ের গলা ভাসিয়া আসিল, আবার এসো।

মণিমোহন জবাব দিল না।

ঝরা পাতা, কাদা আর অন্ধকার। টর্চের আলোয় পথটা জ্বলিয়া উঠিতেছে তরল কাদায়। রবারের জুতা বারে বারে পিছলাইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু মণিমোহনের মনটা নিজের মধ্যেই তলাইয়া গিয়াছিল।

ক্ষুধা কত তীব্র হইতে পারে মানুষের, আর কেমন অসংকোচেই সেটা যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, ভাবনা নাই। কী হইতে পারে এবং কী যে হইতে পারে না তাহা লইয়া বিচলিত হওয়া অসম্ভব এবং অবান্তর। রূপকে যদি আগুন বলা যায় তাহা হইলে সে রূপের দাহিকা-শক্তি সম্বন্ধে আর এতটুকু সংশয় নাই মণিমোহনের মনে।

কিন্তু একথা কি কখনো ভাবিতে পারিত রাণী? বর্ধমানের সেই গ্রাম। আমের জামের ছায়ায় ঝিমাইয়া-আসা সন্ধ্যা। এখন ফাল্গুন মাস—অজস্র মুকুল ধরিয়াছে চারিদিকে, মহুয়ার গন্ধের মতো অত্যুগ্র একটা মাদক-সৌরভে মাঠ-ঘাট-বন ছাইয়া গেছে। তুলসী-মঞ্চের তলায় ছোট একটা মাটির প্রদীপে শিখাটা কাঁপিতেছে মৃদু মৃদু। দূরের স্টেশনে সন্ধ্যার লোকাল আসিয়া থামিল কলিকাতা হইতে—অলসভাবে হুইশিল বাজাইয়া আবার চলিয়া গেল। রাণী উৎকর্ণ হইয়া কান পাতিয়া আছে। এখনই বাহিরে কাহার জুতার শব্দ শোনা যাইবে বোধ হয়।

মৃদু জীবন—শান্ত আর মন্থর। একশো বছর আগে যাহা ছিল তাহাই। গ্রামের তলা দিয়া যে নদী বহিয়া গেছে, এক বর্ষাকাল ছাড়া সব সময়েই হাঁটু অবধি

কাপড় তুলিয়া সে নদী পার হইয়া যাওয়া চলে। দুই পারে ভাঁটফুল ফুটিয়াছে, কখনো কখনো তাহার দু-চারটি কেউ বা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। সে নদীতে প্রদীপ ভাসিয়া চলে, ভাসিয়া যায় কাগজ আর মোচার খোলার নৌকা। শুক্‌নার সময় শ্যাওলার মধ্যে হাত বাড়াইয়া গুগ্‌লি আর চিংড়ি মাছ ধরে গ্রামের বাগ্দীরা।

আর এখানে? যেটুকু মাটি তাহা তো নদীর করুণাতেই নিজেকে সঁপিয়া দিয়া বসিয়া আছে। নূতন চর জাগিতেছে প্রত্যহ—নূতন মানুষ আসিয়া দেখা দিতেছে নূতন পেশী আর নূতন হিংস্রতা লইয়া। মাটিকে বিশ্বাস নাই—আছে আকাশের কোণে কোণে ঝড়ের মুখবন্ধ। আর এই জগতের প্রেম? রাণীর মতো তাহা উৎকণ্ঠ এবং উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে না—কাড়িয়া লয়—ছিনাইয়া লয়।

এখানকার যোগ্য নয় মণিমোহন। এই হিংসা আর পশুত্বকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় জাগে, কিন্তু শ্রদ্ধা আসে না। আদিম অমার্জিত যাহা—তাহার মধ্যে বিশালত্ব আছে, কিন্তু রূপ নাই। তাহা আগুন লাগাইতে পারে, আলো জ্বালাইতে পারে না।

সমস্ত দেহটা বিশ্রীভাবে বিস্বাদ আর কুৎসিত লাগিতেছে। ওই বর্মী মেয়েটাকে ভাবিতে গিয়াই তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। নিজেকেই কি সে আর বিশ্বাস করে? পাত্র যখন কানায় কানায় ফেনাইয়া উঠিতেছে, তখন সে কতক্ষণ ধরিয়া নিজেকে রাখিতে পারিবে শান্ত এবং সংযত করিয়া?

যা থাকে কপালে, এখানকার চাকরী সে ছাড়িয়াই দিবে। তারপর কলিকাতা। ট্রাম বাস মোটরের কলিকাতা। পরিচিত মুখ, চেনা রেস্তোরাঁ। লেকে পার্কে আর সিনেমায় সেই সব মেয়ের মুখঃ যাহারা মোহ জাগাইয়া দেয়, কল্পনাকে প্রসারিত করে। আগুন নয়, খোলা জানালার ফাঁকে বিদ্যুতের আলোর মতো। রাত্রির চৌরঙ্গী মেট্রো সিনেমা। ফ্লাওয়ার মার্কেট। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের গা হইতে পাউডারের গন্ধ।

চট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় কলিকাতা! উপনিবেশের নারিকেল বীথিতে বাতাসের মর্মর। নদী হইতে ঠাণ্ডা বাতাসে শীত করিতেছে। শিয়াল ডাকিতেছে দূরে। বৃষ্টি ভেজা বন হইতে উড়িয়া-আসা একদল পোকা টর্চের আশ্চর্য আলোটার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে। সামনেই তাহার বোট।

টর্চের আলো দেখিয়া গোপীনাথ একটা লণ্ঠন লইয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নামিয়া আসিল। বলিল, আমরা ভেবে ভেবে হয়রাণ। এই ঝড়ের মাঝখানে কোথায় ছিলেন বাবু?

মণিমোহন সংক্ষেপে কহিল, গাঁয়ের মধ্যে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া গোপীনাথ বলিল, আমরা তো ভেবে কুল পাই না। সবাই

মিলে আপনাকে খুঁজিতে বেরোচ্ছিলুম! কী ভয়ানক ঝড়—দেখেছেন! একটু হলেই বোটটাকে উড়িয়ে নিত আর কী!

রবারের জুতোটা কাদায় ভরিয়া গেছে। নদীর জলে জুতা-শুদ্ধ পা দুইটা ধুইয়া মণিমোহন বোটে উঠিয়া আসিল!

গোপীনাথ বলিল, তা হলেও ছাড়িনি। মুরগী দুটো বানিয়েছি বেশ করে! টাকা না দিক, বুড়ো মজঃফর মিঞা মাঝে মাঝে এ-রকম দু চারটে মুরগী খাওয়ালে মন্দ হয় না নেহাৎ।

ক্লান্তভাবে মণিমোহন বিছানাটার উপর গড়াইয়া পড়িল। বলিল, বেশ তো ভাল করে খেয়ে নাও! আমি আর রাত্রে কিছু খাব না।

—খাবেন না? গোপীনাথের কণ্ঠস্বর বিস্মিত এবং আহত শুনাইল, এত ভালো করে রান্না করলুম বাবু আপনি না খেলে—

—আমি খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছেন! এই গাঁয়ের মধ্যে।

—হুঁ!

গোপীনাথ আরো বিস্মিত হয়ে গেল: এই সব মুসলমানেরা! এরা আবার আপনাকে কী খেতে দিলে বাবু?

—সে অনেক কথা। মণিমোহন গম্ভীর হইয়া রহিল।

অতএব গোপীনাথ চুপ করিয়া গেল, কিন্তু তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। এই গ্রামে এমন কোন লোক আছে যে আদর আপ্যায়ন করিয়া সরকারীবাবুকে খাইতে দিবে! সন্ধ্যার সময় এক এক কাঁসি পান্তা ভাত গিলিয়াই তো ইহারা নিশ্চিন্তে রাত কাটাইয়া দেয়। আরো এই ঝড়—

সে যাই হোক, অত ভাবিয়া গোপীনাথের কাজ নাই। বারো টাকা মাহিনার কর্মচারী সে। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া মণিমোহন তাহাকে কিছুটা সম্মান দেখায়, কাগজপত্র লেখায় মাঝে মাঝে। কিন্তু আসলে সে তো মণিমোহনের আর্দালী ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরওয়ালা মনিবের চাল চলন লইয়া সে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতে যাইবে কী জন্য?

তবু একটা জিনিষ বড় খচ্‌খচ্‌ করিতেছে। হাজার হোক, হিন্দুর ছেলে। মুরগী খাওয়াটা না হয় সমর্থন করা যাইতে পারে—পেটে গঙ্গাজল আছে, ওটা শুদ্ধ হইয়া যাইবেই। কিন্তু মুসলমানের রান্না! সাতবার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পাপ হইতে আর নিষ্কৃতি নাই, নির্ঘাৎ ম্লেচ্ছলোক প্রাপ্তি।

৫

বর্মীটা মিথ্যা বলিয়াছিল লিসিকে। ডি-সুজা কিন্তু মরে নাই।

ঝড়ের পর দিন সে ফিরিল গ্রামে। সমস্ত চর ইস্‌মাইলে হুলুস্থূল শুরু হইয়াছে। জোহানকে যেন খুন করিয়াছে কাহারা। আর লিসি? কোনোখানে তাহার এতটুকু স্বাক্ষর চিহ্ন ডি-সুজা খুঁজিয়া পাইল না—সে যেন ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গেই দিগন্তে গেছে বিলীন হইয়া।

ডি-সুজা ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া উঠিতেছিল। আফিমের ব্যবসায়ে ইহাই অবশ্য তাহার প্রথম হাতে-খড়ি নয়। জীবনের ত্রিশটি বৎসর ইহারই মধ্যে কাটাইয়া দিল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে সে নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সব ব্যাপার লইয়া যাহারা কারবার করে, সমাজে কেহই তাহারা সাধু অথবা সচ্চরিত্র নয় —সাধু সাজিবার ভান সে-ও করে না। বরং সাধুত্ব জিনিসটা যে ক্লীব ও দুর্বলের লক্ষণ, এটাও সে ভালো করিয়াই জানে।

প্রথম যৌবন।

কলিকাতায় কর্মক্ষেত্র করিয়া সে তখন পেটেন্ট ঔষধের ব্যবসা চালাইতেছিল। ঔষধগুলি সেই সব জাতের—যে সমস্ত রোগের নাম ভদ্রসমাজে কখনো করিতে নাই এবং ভদ্রসমাজই যাহাদের প্রধান খরিদ্দার। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় চটকদার বিজ্ঞাপনগুলি কয়েক বছর যেন ছপ্পর ফুঁড়িয়া টাকা বৃষ্টি করিয়া গেল। ইচ্ছা করিলেই ডি-সুজা তখন লাল হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পারিল না। লাল দামী মদ এবং গড়ের মাঠের পাশে পাশে সন্ধ্যার সময় দরজা জানালা বন্ধ যে সব রহস্যময় ল্যাণ্ডো ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারাই সে ব্যাপারে বাদ সাধিল।

প্রতিযোগিতার বাজার। দেখিতে দেখিতে যত্রতত্র অসংখ্য ঔষধের কোম্পানী গড়িয়া উঠিল এবং তাহাদের প্রচণ্ড বিজ্ঞাপন কোলাহলে ডি-সুজার কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া গেল। অতএব বাড়ীওয়ালাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জাল গুটাইতে হইল। কিন্তু কেবল জাল গুটাইলেই তো চলে না, ব্যবসা উপলক্ষে যে অংশীদারটি প্রাণপণে তাহার জন্য ঢাক পিটাইতেছিল, তাহাকেও বঞ্চিত করিলে ধর্মে সহিবে কেন? ডি-সুজা ধার্মিক লোক। সুতরাং একদিন প্রভাতে সমস্ত রাত্রির নেশা কাটাইয়া যখন তাহার সহকারী জার্ডিন উঠিয়া বসিল তখন তাহার রূপবতী স্ত্রী হিল্‌ডাকে এবং

সেই সঙ্গে ঘরের বহু মূল্যবান জিনিসপত্র কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য, ডি-সুজাকে তো নয়ই!

সেই প্রথম হাতে খড়ি। তাহার পর কত হিল্ডা আসিল গেল। জীবন এবং জগৎটাকে আরো ভালো করিয়া জানিয়া লইবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষটাই পরিভ্রমণ করিল সে। সঙ্গী জুটিল যোগ্যতম ব্যক্তি—ডেভিড গঞ্জালেস্।

অর্থ-রোজগারের চেষ্টায় যে সব পথ তাহারা তখন ধরিয়াছিল, তাহার ইতিহাস প্রকাশ পাইলে তিরিশ বছর পরে আজো অনায়াসেই দ্বীপান্তর হইতে পারে। ডাকাতি, নোট-জাল, দ্রুতগামী মেল ট্রেনের কামরায় একাকিনী মহিলাযাত্রীকে আক্রমণ—সভ্যতার আলোকিত রঙ্গমঞ্চটার নেপথ্যে যে অন্ধকার অংশটা—সেখানকার কোনো গলিঘুঁজি চিনিয়া লইতেই তাহার বাকী নাই।

মাতাল অবস্থায় মোটর-চাপা পড়িয়া মরিল ডেভিড। আর ডি-সুজা চট্টগ্রামের বন্দরে খালাসীদের কাছ হইতে বিপ্লববাদীদের জন্য রিভলভার সংগ্রহ করার ব্যাপারে এই নূতন পথটার সন্ধান পাইয়া গেল। যেমন অল্প পরিশ্রম, তেমনিই আয়। ঝক্কি অবশ্য আছেই, রোজগারের পথ কবে আর কুসুমাস্তৃত হইয়া থাকে?

আজই না হয় চর ইসমাইলের বন্দর শোভায় সমৃদ্ধিতে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সেদিন কি এম্নি অবস্থা ছিল? সেদিনও তেঁতুলিয়া এমন করিয়া নিজের বহিয়া আনা পলি মাটিতে নিজেরই মৃত্যুশয্যা রচনা করে নাই। চৈত্রের অসহ্য রৌদ্রে যখন আকাশটায় শুদ্ধ চিড় খাইবার উপক্রম করিত, তখনও এই নদীতে বাঁও মিলিবার কল্পনাই করিতে পারিত না কেউ। আর-এস-এন কোম্পানীর নূতন লাইনে তো দূরের কথা, জল-পুলিশের নৌকা তখন ভোলা বা চাঁদপুরের কূল ছাড়াইয়া এদিকে পাড়ি জমাইবার দুঃসাহসিক কল্পনাকে মনের কোণেও স্থান দিত না। ব্যবসার পক্ষে কী দিনগুলাই যে গিয়াছে।

তারপর তিরিশ বৎসর কাটিয়া গেল—সম্পূর্ণ তিরিশটা বৎসর। নদীতে চড়া পড়িল, পড়িল মানুষের মনেও। সেই দুঃসাহসিক ডি-সুজার প্রখর রক্তধারাও মন্থর হইয়া আসিল বুঝি। কয়দিন হইতেই ভয় করিতেছে। নিজের সুদীর্ঘ জীবনে পাশবিকতা আর বিশ্বাসঘাতকতার এত দৃষ্টান্তের সহিত তাহাকে মুখোমুখি করিতে হইয়াছে যে সাপের চাইতেও মানুষ নামক জীবটিকে সে অবিশ্বাস করে বেশি।

লিসির-সম্পর্কে বর্মীটার মনোভাব কী কে জানে? হয় তো ভালোই—কিন্তু বহুদিন পরে ডি-সুজার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছে; এ পথে প্রথম নামিবার সময় যেমনটা হইয়াছিল তেমনিই। এই যে এতগুলি টাকা সে জমাইয়াছে

বা জমাইতেছে এ কেবল লিসির জন্যেই তো। কিন্তু ইহার জন্য শেষ পর্যন্ত লিসিকেই যদি হারাইতে হয়, তাহা হইলে—

নাঃ, এ সবের কোনো অর্থ হয় না। নিজেই কি পরোয়া রাখে কাহারো? বয়স হইয়াছে—তা হোক, বর্মীর চাইতে তাহার পর্তুগীজ বাহুতে কিছু কম শক্তি ধরে না। তেমন তেমন ঘটিলে সে-ও তাহার মহড়া লইতে জানে। আর টাকা? টাকা যে কাহারো বেশি হয় এ কথা কেউ কখনো শুনিয়াছে নাকি? সারাজীবন ভরিয়া উপবাসী থাকিয়া জমাইয়া যাও—ঘোড়-দৌড়ের মাঠে তিনটা দিন বাজী ধরিয়াই একদম ফতুর। নিজের চোখেই তো এসব সে কতবার দেখিল।

কাজেই সন্ধ্যার মুখে ভাঙা গীর্জাটার তলা হইতে ডিঙি খুলিয়া দিতে হইল। আগে হইলে কি এত সব বালাই ছিল নাকি! দিনকাল এখন সত্যিই খারাপ পড়িয়াছে। শুধু খারাপ বলিলেই যথেষ্ট হয় না—যতদূর খারাপ হইতে হয়। এমন দিনও গিয়াছে যখন প্রকাশ্যে হাটে বসিয়া—হাঁ, এই গাজীতলার হাটে বসিয়াই দাঁড়ি পাল্লা দিয়া কালো খয়েরের সঙ্গে আফিং বিক্রী করিয়াছে ডি-সুজা। তখনকার দিনে তো সে এ তল্লাটে একরকম রাজত্বই করিত বলা চলে।

কিন্তু সে-সব এখন নিতান্তই স্বপ্ন-কল্পনা। আবগারী লোকের জ্বালায় এখন আর কোনোদিক সামলাইবার জো নাই। গ্রামে গ্রামে, হাটে বাজারে তাহাদের লোক নিতান্ত নিরীহ ভালো মানুষটির মতো, ঘুরিয়া বেড়ায়, খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে। তারপর কিছু সূত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই গলাটি টিপিয়া ধরিতে যা দেরী। এই তো সেদিন খোকা মিঞার পাঁচটি বৎসর শ্রীঘর হইয়া গেছে।

ডি-সুজা ধীরে ধীরে দাঁড় টানিতে লাগিল, কিন্তু টানিবার কিছু দরকার ছিল না। ভাঁটার মুখে নোনা জল খরস্রোতে নামিয়া চলিয়াছে তর্ তর্ করিয়া। নারিকেল বনের মাথায় জাগ্রত একখণ্ড চাঁদ হইতে বুনো হাঁসের পাখার মতো নদীর জলে আলো-অন্ধকারের বিচিত্র রঙ ছড়াইয়া পড়িতেছে। গাজীতলার হাট পার হইলেই মুসলমানদের বস্তি। ছোট ছোট ঘরগুলি বাগানের আড়ালে আড়ালে একেবারে জলের ধার অবধি নামিয়া আসিয়াছে; আর তাহারই কোল ঘেঁষিয়া চলিতেছে নৌকা। নিবিড় দীর্ঘ ঘাসের বন সমস্ত তীরভূমিটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ইচ্ছা করিয়াই এ দেশের লোক বাড়িতে দিয়াছে ওদের। ঝড়-তুফান কিংবা জোয়ারের সময় যখন বড় বড় ফেনার মুকুট-পরা ঢেউ আসিয়া কূলকে আঘাত করিতে চায়, তখন এই ঘাসগুলিই বুক পাতিয়া সর্বপ্রথমে সে আঘাত গ্রহণ করে, ডাঙা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেয় না। এই ঘাসবন ভাঙিয়া ডিঙ্গিটা খস খস করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। কী একটা ছোট

মাছ অন্ধের মতো লাফাইয়া উঠিয়া ছলাৎ শব্দে একেবারে আসিয়া পড়িল নৌকার খোলের মধ্যেই।

গলুইয়ের উপর অলস-ভাবে গা এলাইয়া দিয়া বর্মীটা সিগারেট টানিতেছে। অনুজ্জল জ্যোৎস্নায় তাহাকে ভালো করিয়া যেন চেনা যাইতেছে না। ডি-সুজার মনে হইতে লাগিল : ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত দিগ দিগন্ত যেন অদ্ভুতভাবে রহস্যময়—আশে পাশে কী আছে এবং কী যে নাই—দূরের তটরেখা যেমন সম্ভব-অসম্ভবের অসংখ্য ছায়ামূর্তি রচনা করিয়া একটি অজ্ঞাত জগতের রূপ লইয়া বসিয়া আছে—বর্মীর সঙ্গে ইহাদের সব কিছুরই কী একটা সামঞ্জস্য আছে হয় তো। পুরানো-হইয়া-আসা হাতীর দাঁতের মতো তাহার মুখের রঙ—সিগারেটের আলোয় থাকিয়া থাকিয়া সেই মুখটা আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

অস্বস্তি লাগিতেছিল। নীরবতাটা যেন পীড়িত করিতেছে ডি-সুজাকে। কিছু একটা বলিবার জন্যই সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের আসামের খবর কী?

অনাসক্ত গলায় জবাব আসিল, খুব খারাপ।

—খুব খারাপ? কেন?

—পার্বতীপুরের রেল-ইষ্টিশনে তিনজনকে ধরে ফেলেছে। সাত-আট হাজার টাকাই জলে গেল। ওদিকের ও পথটায় আর সুবিধে হবে না মনে হচ্ছে।

ডি-সুজা ভীত হইয়া উঠিতেছিল।

—বলো কী! আসামের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তো সবই গেল।

—প্রায় গেলই তো। এদিকেও পুলিশ খুব জোর দেবে বোধ হচ্ছে। যতটা সম্ভব সাবধান হয়ে থেকো, কোনরকম কিছু আঁচ না পায়।

ভয়টা মনের ভিতর হইতে আবার ঠেলিয়া উঠিতেছে। গঞ্জালেস্ কবে আসিবে কে জানে। জোহানকে আর বিশ্বাস নাই, সবাই যখন জানিয়া ফেলিয়াছে, তখন যে ইচ্ছা তাই সে অনায়াসে করিয়া বসিতে পারে।

উত্তেজিতভাবে ডি-সুজা বলিয়া ফেলিল, যথেষ্ট হয়েছে, এবার আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি আর এসব গোলমালের মধ্যে থাকতে চাই না।

মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া বর্মী উঠিয়া বসিল। সে যে খুব বিস্মিত হইয়াছে মনে হইল না, যেন এমন একটা কথার জন্যই সে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। সংক্ষেপে বলিল, তুমি তো পর্তুগীজ। তোমার পূর্বপুরুষেরা সারা দুনিয়া লুঠতরাজ করে বেড়াত—সুন্দরী মেয়ে মানুষ পেলেই ছিনিয়ে নিয়ে আসত, তাদের বংশধর হয়ে তোমার এত ভয় কিসের?

পূর্বপুরুষদের গৌরবময় কীর্তিকলাপ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া

তুলিবার মতো কথার স্বরটা তাহার নয় ; বরং ইহার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা আছে। বহুদিন ধরিয়াই ডি-সুজা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, শাদা জাতিগুলির উপর ইহার অতি-প্রকট খানিকটা ঘৃণা যখন তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। হয় তো স্বাধীন ব্রহ্মের স্মৃতিটা এখনো ভুলিতে পারে নাই ; শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু মান্দালয়ের রাজশক্তি যে আবার একদিন জাগিয়া উঠিবে গৌরবের পূর্ণ রূপ লইয়া—একথা ইহারা আজও বিশ্বাস করে হয় তো। তাই শ্বেত জাতিগুলি ইহাদের ঘৃণার বস্তু। একদিন—এবং সে তো আর খুব বেশিদিন আগেই নয়—ভারতবর্ষের কূল উপকূল ঘিরিয়া তাহারা পূর্বপুরুষেরা যে ভাবে অত্যাচারের আগুন জ্বালাইয়াছিল, বিবাহের রাত্রে চন্দন-চর্চিতা কন্যাকে যে ভাবে ছিনাইয়া আনিয়া বজরার অন্ধকারে রাক্ষসমতে নিজেদের অঙ্কশায়িনী করিয়াছিল, গর্বোজ্জ্বল এই সমস্ত কাহিনী শুনিয়া ওর চোখ প্রশংসায় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে না ; হাতীর দাঁত যেন কালো হইবার উপক্রম করে গ্রানাইটের মতো। ডি-সুজার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ভারতবর্ষের উপর এই হলদে মানুষটির বেশ খানিকটা তীব্র সহানুভূতি জাগিয়া আছে হয় তো।

তিক্তভাবে ডি-সুজা কহিল, ভয় নয়। বুড়ো হয়ে গেছি, শরীরে এখনও আর এসব পোষায় না। আর যে কটা দিন বাঁচব, কোনো ঝক্কির ভেতরে থাকতে চাই না।

সিগারেটটাকে জলে ফেলিয়া দিল বর্মী। আস্তে আস্তে বলিল, সে একটা কথা বটে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, এ পথে ঢোকা সহজ, কিন্তু বেরোনো সহজ নয়। তাই যতদিন বাঁচবে, ততদিন এই কাজই করে যেতে হবে তোমাকে। আজ দলের থেকে বেরিয়ে গিয়ে কালই যে তুমি সবাইকে ধরিয়ে দেবে না—তার কোনো প্রমাণ আছে?

ডি-সুজা ম্লান হইয়া গেল।

—আমাকে বিশ্বাস করো না তোমরা?

একটু হাসিল সে। তারপর আবার আধশোয়ার ভঙ্গিতে গলুইয়ে গা এলাইয়া দিয়া জবাব দিল, বিশ্বাস করা কি এতই সহজ?

ডি-সুজা চুপ করিয়া রহিল। সত্যিই বিশ্বাস করা সহজ নয়। অবিশ্বাস, মিথ্যা আর অন্যায় লইয়াই যে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কারবার চালাইল, বুড়ো বয়েসে দলকে দল ধরাইয়া দিয়া সে যে মোটারকম একটা কিছু পাইবার প্রত্যাশা করিবে সেটা তাহার পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক হয় না। ঠিকই বলিয়াছে, রাগ করিয়া লাভ নাই।

নারিকেল বনের চূড়ায় খণ্ড চাঁদ। ডি-সুজা অন্যমনস্কের মতো দাঁড় টানিয়া

চলিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে হঠাৎ খানিকটা ঢোল ও করতালের শব্দ উঠিয়া মথিত করিয়া দিল আকাশকে। দূরে নদীর মাঝখানে নূতন জাগা ছোট বালুচরটার উপরে নোঙর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে একখানা বড় নৌকা। ঘোলাটে জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তাহার ছদিকে ছোট ছোট দুটি পতাকা উড়িতেছে ; দুই-একটা আলো জ্বলিতেছে মিট মিট করিয়া, আর তাহারই সঙ্গে ঝমর্ ঝমর্ করিয়া বাজনা বাজিতেছে।

সজোরে দাঁড়ে কয়েকটা টান দিয়া ডি-সুজা নৌকাখানাকে আনিয়া ফেলিল একেবারে কূলের কাছে। ঝোপ-জঙ্গলের এলোমেলো ছায়ায় জ্যোৎস্না এখানে তেমন স্পষ্ট হইয়া পড়ে নাই। তাহারই আড়ালে নৌকা বাহিতে বাহিতে ডি-সুজা বলিল, জলপুলিশ!

—জলপুলিশ! বর্মী সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল!

ডি-সুজা বলিল ভয় নেই, আমাদের ধরবার জন্যে নয়। এখানে কয়েকদিন আগে মস্ত একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, তারই খোঁজ-খবর নিতে এসেছে ওরা।

—ডাকাতি? কারা করেছে?

—কারা করবে আর? আমাদের গাজী সাহেবের দল নিশ্চয়ই।

—চালাক লোক গাজী সাহেব। এদিকে তো ঢের জমিদারী আছে, আফিঙের কাজেও রোজগার একেবারে মন্দ হয় না, আবার ডাকাতির ব্যবসাও চলেছে বেশ।

জলপুলিশের নৌকাটা ডি-সুজার মনটাকে বদলাইয়া দিয়াছে আকস্মিকভাবে। বর্মীটাকে যেন এই মুহূর্তে আর ততটা খারাপ বলিয়া বোধ হয় না। দুঃসাহসিক—বেপরোয়া ডি-সুজা। জীবন ভরিয়া কীই না করিল সে। আজই না হয় খুনাখুনির ব্যাপারে চিত্তটা চমকিয়া ওঠে—পুলিশের নামে তটস্থ হইয়া উঠে সর্বাঙ্গ, কিন্তু কর্মমাতাল জীবনে যেদিন জোয়ার আসিয়াছিল, সেদিন মৃত্যুর চাইতে সহজ আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় নাই। আম্বালা স্টেশনে সেই শিখ স্টেশনমাস্টারটার কথা মনে পড়িতেছে। ডেভিডের কুড়ুলের একটি কোপে তাহার মাথার গোলাপী পাগড়ি উড়িয়া পড়িয়াছিল—আর খুলিটা চুরমার হইয়া রক্ত আর ঘিলু ছিটকাইয়া দেওয়ালে গিয়া লাগিয়াছিল। ফিন্‌কি দিয়া খানিকটা রক্ত আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ডি-সুজার নাকে-মুখে।

ডি-সুজা নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিল। একটু আগেই কী দুর্বলতা যে পীড়িত করিতেছিল তাহাকে। লোকটাকে এমন অবিশ্বাস করিবার কী আছে! এতদিন ধরিয়াই ত লিসিকে দেখিয়া আসিতেছে সে। কিছু একটা করিবার মতলব থাকিলে কি এর মধ্যেই করিতে পারিত না?

বর্মীর কথার কোনো স্পষ্ট উত্তর না দিয়া ডি-সুজা নীরবে দাঁড় টানিতে লাগিল। জলপুলিশের নৌকাটা একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, হোগ্‌লাবন ঘেষিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলিল ডিঙিটা। আফিঙের বাণ্ডিলটাও সঙ্গেই আছে। চ্যালেঞ্জ করিলে কেবল যে হাতে দড়ি পড়িবে তাই নয়, অনেকগুলো টাকাই বরবাদ হইয়া যাইবে একেবারে।

জলপুলিশের তখন এদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মতো মনের অবস্থা নয়। নিরালা নদীর বুকে বসন্তের রাত্রি। বাতাসে বাতাসে স্নিগ্ধ পেলবতা দূর পশ্চিম হইতে বাংলা দেশের এই প্রত্যন্ত সীমায় এমন অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে আসিয়া রীতিমতো রঙীন হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের মন। যুক্তপ্রদেশের কোন্ এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে সর্বাঙ্গে রূপার গয়না পরিয়া যেখানে তাহার প্রেয়সীরা ঘর্ ঘর্ করিয়া জাঁতায় গম ভাঙিতেছে, সেখানকার স্মৃতি মানসচক্ষের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাদের উদাস করিয়া দিতেছে। একজন দস্তুর মতো গান জুড়িয়া দিয়াছে ঃ

"আরে সাত সমুন্দর পারে প্রিয়া বাসে
আহা আওনে মোরা পাস্ তাকত্ নেহি—"

সঙ্গে সঙ্গে ঢোল এবং করতালও চলিতেছে সমান উৎসাহে। বোঝা যাইতেছে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যে প্রেয়সীটি বিদ্যমান আছে এবং যাহার বিরহে গায়কের বিক্ষোভের সীমা নাই—সে প্রেয়সীটির সম্বন্ধে কেহই নিতান্ত উদাসীন নয়। ঢোলকের উপর যেভাবে উদ্দাম আক্রমণ চলিতেছিল, তাহাতেই সেটা বোঝা যাইতেছিল।

নীরবে খানিকটা পথ পার হইয়া গান ও করতালের শব্দটা যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন বর্মী প্রশ্ন করিল, আর কতটা যেতে হবে ?

ডি-সুজা জবাব দিল, দূর আছে। সামনের অন্ধকারে ওই যে কালো বাঁকটা —ওটা পেরোলে আরো প্রায় এক কোশ !

—গাজী সাহেব কী বলে আজকাল ?

—কোকেনের কথা বলছিল। বলছিল, কিছু কোকেন আনাতে পারলে সুবিধে হয়।

বর্মী হাসিল ঃ খাঁই আর মিটছে না। ডাকাতির ব্যবসাও তো চলছে।

—তা চলছে ! গাজী মানুষ কিনা, তাই রক্তের থেকে লড়াইয়ের নেশা আজো মেটে নি।

—গাজীরা কি লড়ায়ে জাত নাকি ?

—তা বই কি। গাজী মানেই তো তাই। যুদ্ধ আর ধর্ম-প্রচার একসঙ্গে যারা করে তারাই গাজী।

বর্মী হালকাভাবে একটা মন্তব্য করিল, সেইজন্যেই শাদা জাতের সঙ্গে তাদের এতটা মেলে বোধ হয়।

কথাটা অনাবশ্যকভাবে টানিয়া আনা—ডি-সুজা আবার গম্ভীর হইয়া গেল। আলো-আঁধারে মিশানো এই বিচিত্র কালো রাত্রির তলায় কেমন যেন মনে হইতেছে লোকটাকে। এই রাত্রিকে, এই মুহূর্তকে যেন বিশ্বাস করা চলে না। বাতাসের ছন্দটা অত্যন্ত লঘু, যেন অস্ফুট ভাষায় কী একটা কথা ক্রমাগত বলিয়া চলিয়াছে। চিত্র-বিচিত্র পাখা মেলিয়া বুনো হাঁসের মতো নদীর জল ভাঁটার মুখে সমুদ্রের নীড়ে চলিয়াছে বিশ্রামের সন্ধানে। দাঁড়ের মুখে জল ভাঙিয়া লবণ মিশানো ফস্‌ফরাস্ থাকিয়া থাকিয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে। এমন একটি রাত্রে—এমন একটি মুহূর্তে কত কী যেন অঘটন ঘটিতে পারে। ডি-সুজা মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকাইল—নিশি-সমুদ্রে স্নান করিয়া অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে তারাগুলি দপ্ দপ্ করিতেছে। অন্তত বারোটার কম হইবে না। রাত্রির প্রহরী কাল-পুরুষ যেন সজাগ সতর্ক চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে আকাশে অরণ্যে জলে-স্থলে একাকার স্বপ্নাচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে।

বর্মী আবার একটা সিগারেট ধরাইল। কাজের লোক সে। এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে একের পর এক আসিয়া ভিড় করিতেছে। কালই নৌকা ছাড়িয়া হয় তো বা যাত্রা করিতে হইবে আকিয়াবের পথে। এদিককার ব্যবস্থা দিনের পর দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে—আর বেশিদিন এখানে কাজ চালাইলে সব মাটি হইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়। নুরুল গাজী অত্যন্ত হুঁশিয়ার ও স্বার্থপর—তাহাকে কোনোদিনই বিশ্বাস করা যায় নাই। ডি-সুজা কাজের লোক, কিন্তু বয়স হইয়াছে, অনেক দিক দিয়া সে পড়িয়াছে পিছাইয়া। এখন তাহাকে রাখাও যায় না, ছাড়াও যায় না। এ অবস্থায়—

এ অবস্থায় যা করা যাইতে পারে সে তাহা আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে। কাজটা নানাদিক দিয়া তেমন ভালো হয় তো দেখাইবে না, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নাই আর। তা ছাড়া এই পর্তুগীজের দল। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসই যাহাদের আদর্শ পুরুষ, নৃশংসতাই যাহাদের বীরকীর্তির চরম নিদর্শন, তাহাদের সঙ্গে এ ছাড়া আর কী করা যাইতে পারে? শুধু পর্তুগীজ কেন, যে কোনা শ্বেত জাতিকেই যে সে সত্যি সত্যি দেখিতে পারে না, এ কথা তো আর অস্বীকার করা চলে না।

নৌকা চলিয়াছে। বৈশাখী নদী—চেহারায় কৃশতা আসিলেও টের পাইবার জো নাই এর রাত্রিতে। তবু যে রূপটা তাহার এই আলো অন্ধকারে অতি বিচিত্র ও অতি বিশাল বলিয়া বোধ হইতেছে সে রূপটা পুরাপুরি সত্য নয়। নদীর অনেকটা ভিতর

দিয়াই নৌকা চলিতেছে। তবু যে তলায় খস্ খস্ শব্দ করিয়া বালি বাজিতেছে সেটা টের পাওয়া গেল। চর জাগিতেছে। দাঁড়ে বালি ঠেলিতে ঠেলিতে ডি-সুজা নৌকা-টাকে একপাশে বেশি জলের মধ্যে নামাইয়া আনিল।

চর জাগিতেছে। ঠিক এবারে নয়—দু-এক বছরের মধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ চেহারাটা জলরেখার উপরে বেশ খানিকটা ঠেলিয়া উঠিবে—এমনি একটা অনুজ্জল জ্যোৎস্না রাত্রিতে দূর হইতে তাহাকে দেখাইবে একটা উবুড় করা অতিকায় জেলে-ডিঙ্গির মতো। তারপরেই আবার চলিবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নূতন উপনিবেশ —নূতন মানুষ। নব নব বর্বরতা—আদিমতার প্রায়ান্ধকারে সৃষ্টি-শতদলের প্রথম উন্মেষ। সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের নানা তরঙ্গে উপনিবেশ সার্থক হইবে, সেদিন আবার আসিবে তাহাকে লইয়া কাহিনী রচনার অবকাশ।

বর্মী কথা কহিল। হঠাৎ কেমন করিয়া তাহার স্বর বদলাইয়া গেছে অনেকটা। ঠিক বদলাইয়া গেছে বলা চলে না—তাহার অনাসক্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে কিছুটা অনুভূতির ছোপ ধরিয়াছে যেন। শব্দের যদি রঙ থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইত কালো রঙ ; অথবা চর ইস্মাইলের দিগন্তে বৈশাখের যে আসন্ন-প্রলয় মেঘচ্ছবি ফুটিয়া ওঠে তাহার রঙ। সে কহিল, পথ আর কতটা ?

ডি-সুজা তখন তীরের দিকে পাড়ি ধরিয়াছে। দাঁড়ের টানে টানে ফসফরাস মিশানো জলে যেন লক্ষ লক্ষ জোনাকির অগ্নিবিন্দু জ্বলিতেছে। নারিকেল বনের মাথায় চাঁদের মুখের উপর একরাশ মেঘ বেশ খানিকটা আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। তীরের জঙ্গলগুলি দেখিলে এখন হয় তো বা হঠাৎ মনে হইতে পারে সারি সারি ঝাঁকড়া মাথা লইয়া অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছে কাহারা—আর অসংখ্য জোনাকি পিট পিট করিতেছে তাহাদের রাশি রাশি চোখের মতো : ঠিক সেই সব চোখের মতো—পাথরের মতো ছিদ্রহীন আর জমাট রাত্রিতে যাহারা বত্রিশ দাঁড়ের ছিপ লইয়া সমুদ্রে কালো মোহানায় শিকারের সন্ধান করিয়া বেড়ায়।

ডি-সুজার আবার ভয় করিতেছে। অথচ ভয়টা অর্থহীন—সম্পূর্ণই অর্থহীন। তবুও এই রাত্রি। এমন রাত্রিকে বিশ্বাস করা চলে না।

কিন্তু ভরসা এই, পথটা ফুরাইয়াছে এতক্ষণ।

ডি-সুজা বলিল, এসে পড়েছি প্রায়।

বর্মী চুপ করিয়া রহিল।

নৌকা খালের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। এই খালে লগি ঠেলিয়া আরো খানিকটা পথ। কচুরিপানা খালের বুক জুড়িয়া ঘন হইবার উপক্রম করিতেছে। এই নোনার দেশে আসিয়াও তাহাদের জীবনশক্তিতে একটুকু নোনা ধরে নাই—

বংশ-বিস্তৃতি চলিতেছে অপ্রতিহতভাবে। এমন একদিন হয় তো আসিবে যখন সমস্ত বঙ্গোপসাগর জুড়িয়া কচুরিপানার দুর্ভেদ্য আবরণ পড়িবে—আর হাজার হাজার মাইল জুড়িয়া বেগুনি ফুলগুলি হাওয়ায় হাওয়ায় মাথা দুলাইবে।

কচুরি বন ভাঙিয়া আগাইয়া চলিয়াছে নৌকা। খস্‌-খস্‌-খস্‌। কেমন একটা শব্দ—কানের মধ্যে শির শির করিতে থাকে। হঠাৎ নৌকাটা কিসে আট্‌কাইয়া গেল। তলা হইতে বিশ্রী দুর্গন্ধের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। কোনো কিছুর একটা মড়া লাগিয়াছে নিশ্চয়ই।

টর্চের আলো ফেলিল বর্মী। মড়াই বটে। ফুলিয়া অস্বাভাবিক রকমের শাদা প্রকাণ্ড একটা ঢোলের মতো দেখাইতেছে। পেটে মাংস কাহারা খুবলাইয়া খুবলাইয়া খাইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কালো একরাশ নাড়ীভুঁড়ি দুইপাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এক মাথা চুল জলে ভাসিতেছে—তরুণী স্ত্রীলোকের দেহ। নারী-ঘটিত আসক্তি হইতে মুক্তি লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চায় যাহারা—এই নগ্ন বিকৃত দেহটাকে একবার দেখিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

শিহরিয়া সে টর্চটা নিভাইয়া দিল। অন্ধকারের মধ্যে দুর্গন্ধটা যেন পুরু ক্যানভাসের পর্দার মতো জুড়িয়া আছে। জোরে জোরে লগি ঠেলিয়া ডি-সুজা জায়গাটা পার হইয়া গেল। একটু দূরেই ঝোপের মধ্যে হঠাৎ আলো জলিয়াই নিবিয়া গেল—আলেয়া? যে শেয়ালগুলি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া মড়া খাইতেছিল তাহারাই কি হাই তুলিতেছে? এ দেশের লোক হইলে নিশ্চয় মনে করিত পেত্নী। অথবা সেই তাহারা—যাহাদের মাথা নাই অথচ ঘাড়ের উপর দুইটা বড় বড় চোখ ভাঁটার মতো জলিতেছে; অন্ধকারে পঞ্চাশগজী দুইটা হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া জীবজন্তু হাতড়াইয়া বেড়ায়।

শেয়ালের কোলাহল শোনা গেল। মড়াটাকে লইয়া নিশ্চয়ই। ওই মড়াটা বর্মীর সমস্ত দ্বিধা-সংশয়কে যেন সমতল করিয়া দিয়াছে। গাজীকে বিশ্বাস করা আর নিরাপদ নয়। ডি-সুজার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে—তা ছাড়া লিসি! পর্তুগীজদের ঘৃণা করা যাইতে পারে, তাই বলিয়া তাহাদের মেয়েদেরও যে ঘৃণা করিতে হইবে তাহার কী মানে আছে। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস্‌ও তো জেন্টুদের ঘৃণা করিত—কিন্তু তাহাদের সুন্দরী মেয়েদের উপর তাহার আসক্তিও কিছুমাত্র কম ছিল না।

গাছপালার ঘন অন্ধকার। কচুরিপানা ঠেলিয়া একঘেয়ে শির শির শব্দে চলিয়াছে নৌকাটা। অন্ধকারে কাহারো মুখ দেখা যায় না। চলিত পোকা-মাকড়ের দল উড়িয়া নৌকায় আসিয়া পড়িতেছে।

কাঠ-ফেলা বড় একটা ঘাটের গায়ে ডি-সুজা নৌকাটাকে ভিড়াইয়া দিল। কহিল, এসে পড়েছি।

মুরুল গাজী তাহাদের জন্য প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন।

বাহিরের একটা ঘরে মিটৃ মিটৃ করিয়া একটা দেশী চৌকোণা লণ্ঠন জলিতেছে। অনুজ্জ্বল রক্তাভ আলো, ঘরময় পোড়া কেরোসিনের গন্ধ ভাসিতেছে। টিনের চালে সুপারির আড়া হইতে কালো একরাশ ঝুল দুলিতেছে ঝালরের মতো। আর নিচে একখানা মাদুর পাতিয়া কী যেন পড়িতেছেন গাজী সাহেব—রীতিমতো সুর করিয়াই।

ডি-সুজা এবং বর্মীটি ঘরে ঢুকিতেই গাজী সাহেব সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ফকিরের মতো চেহারা। শাদা দাড়ি বুক অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে সুদীর্ঘ চামরের মতো। পাকা গোঁফ দাড়ির দুইটি সীমান্তরেখা তামাকের রঙে অনুরঞ্জিত। গলাতে কাচ এবং কড়িতে মিশানো দুই ছড়া মালা—থাকিয়া থাকিয়া খটৃ খটৃ শব্দে বাজিয়া ওঠে।

হাত দুটি সামনে বাড়াইয়া দিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, এসো, এসো। তোমাদের জন্যই বসেছিলাম।

দুজনে মাদুরে আসিয়া বসিল। গাজী সাহেব শশব্যস্তে তাহাদের দিকে গোটা দুই তাকিয়া আগাইয়া দিলেন। তারপর ডাকিলেন, আবদুল্লা!

মালকোঁচা করিয়া লুঙ্গি পরা একটা ছোকরা চাকর তন্দ্রাজড়িত চোখ লইয়া দেখা দিল।

—জী!

—তামাক।

এক কোণে একটা গড়গড়া হইতে কল্‌কেটা তুলিয়া লইয়া আবদুল্লা বাহির হইয়া গেল।

গাজী সাহেব হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাল কতটা?

—পাঁচ সের।

—পাঁচ সের? বড্ড কম। গাজী সাহেবের স্বরে নৈরাশ্য প্রকাশ পাইল।

বর্মী সামান্য একটু ভ্রূকুটি করিল, কী করা যাবে? বাজার বড় গরম। এমন যদি চলে তো এদিকের সব কাজ-কারবার তুলে দিতে হবে। পথে জলপুলিস দেখে এলাম।

—জলপুলিস? গাজী সাহেব একটু হাসিলেন। ভালো করিয়া তাকাইলে

দেখা যায়, গাজী সাহেবের চোখ দুইটা ঠিক কালো নয়। কিছুটা নীলচে, কিছু পিঙ্গল—যেন বিড়ালের চোখ। হাসির ছন্দে সেই নীলাভ-পিঙ্গল চোখ দুটি চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল একটু।

—জলপুলিসের ভয় কিছু নেই। ওরা হাতের লোক—খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে দিয়েছি। নেমকহারামী বোধ হয় করবে না। তবে—

ডি-সুজা বলিল, আবগারী ?

গাজী সাহেব কহিলেন, তাই ভাবছি। এখানে সুলেমান বলে একটা লোক আছে, তার চাল-চলন সুবিধে বোধ হচ্ছে না। ও লোকটা বোধ হয় খোঁজখবর দেয়। ভালোমত একটা হদিস একবার পেলে হয়, তারপর ধরে ঠিক জবাই করে দেব।

এরা দুইজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল একবার। প্রায় এক সঙ্গেই জোহানের কথা মনের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহাদের। জবাই। বর্মী নীচের ঠোঁটটাকে কামড়াইল শুধু।

আবদুল্লা ফুঁ দিতে দিতে কল্‌কেটা লইয়া আসিল, তারপর সেটাকে গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া একেবারে সভার মাঝখানে আনিয়া রাখিল। বর্মী গড়গড়াটা নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া কাঠের নলটায় মৃদু মৃদু টান দিতে শুরু করিল। কী একটা ভাবনায় চোখ দুইটা মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহার।

আফিঙের বাণ্ডিলটা বারকয়েক নাড়াচাড়া করিয়া গাজী সাহেব সেটাকে তুলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন, তারপর খানকয়েক নোট আনিয়া তাহাদের সামনে রাখিলেন। বারকয়েক গণিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বর্মী সেগুলিকে ট্রাউজারের পকেটস্থ করিল।

গড়গড়াটা অধিকার করিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, আমি ভাবছিলাম কিছু কোকেনের কথা। কলকাতা থেকে আমাদের যে লোক এসেছে সে বলছিল চালাতে পারবে।

বর্মী জিজ্ঞাসা করিল, সে লোক আছে ?

—আছে। ডাকব তাকে ? আবদুল্লা !

আবদুল্লা তন্দ্রাজড়িত চোখ লইয়া আবার দেখা দিল। মুখের ভাবে স্পষ্ট অপ্রসন্নতা। সারা রাত কি তাহাকে ঘুমাইতে দিবে না এরা ?

—ইয়াসিন, ইয়াসিন কোথায় রে ?

—গণিমিঞার বাড়িতে।

—গণিমিঞার ! গাজী সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, আর মোতালেব ?

—সেও।

—বুঝেছি। গাজী সাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাও মৃদু হাসিল।

ডি-সুজা প্রশ্ন করিল, কী হয়েছে?

—আর বলো কেন সাহেব! কোত্থেকে একটা জেলের মেয়ে নিয়ে এসেছে, তাকে নিয়ে রেখেছে গণিমিঞার বাড়িতে। তাই—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া গাজী সাহেব আবার হাসিলেন।

আবদুল্লা লোভীর মতো ঠোঁট চাটিল। বলিল খুব মৌজ হচ্ছে এখানে। আমি মালিকের হুকুম পেলাম না, নইলে—সক্ষোভে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবদুল্লা চুপ করিল, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত মনে হইল তাহাকে।

গাজী সাহেব ধমক দিয়া উঠিলেন, হয়েছে, থাম্। সবগুলো এবার জেলে যাবি তোরা, আমাকে শুদ্ধ ডোবাবি। যা, এখন খানা-পিনার ব্যবস্থা কর গে। আর ইয়াসিন কিংবা মোতালেব ফিরলেই আমাকে খবর দিবি।

ডি-সুজা হাসিতেছিল, কিন্তু বর্মীর মুখের দিকে চোখ পড়িতেই তাহার হাসি গেল বন্ধ হইয়া। শুধু বিবর্ণ নয়—অদ্ভুতভাবে রেখাংকিত আর অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মুখশ্রী। একটা ভয়ের শিহরণ উঠিয়া আসিয়া তাহার পা হইতে শুরু করিয়া সমস্ত মাথা পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। নৌকায় আসিতে কালো জল আর দিগন্তপ্লাবী অন্ধকারের মধ্যে যে অর্থহীন ভীতির শিহরণ তাহাকে আন্দোলিত করিয়াছিল—সেই অনুভূতি আবার যেন ফিরিয়া আসিতেছে। ডি-সুজা অনুভব করিল তাহার বুকের লোমগুলি জামার তলায় ঘামে ভিজিয়া উঠিতেছে।

গল্প-গুজবের পর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইল। গাজী সাহেব আয়োজন মন্দ করেন নাই। বনিয়াদী বড়লোক, লোককে কী করিয়া খাওয়াইতে হয় সেটা জানেন। ভালো পোলাও, মাংস, আস্ত মুরগীর রোস্ট। পায়েসের বন্দোবস্তও আছে।

সব শেষে আসিল বোতল। গাজী সাহেব নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি, মদ স্পর্শ করেন না। বর্মীটা বেশি খাইল না, অতএব বোতলটা শেষ করার ভার ডি-সুজার উপরেই পড়িল।

বয়স হইয়াছে—মদ খাওয়াটা ছাড়িয়াই দিয়াছে প্রায়। ডি-সুজা সামান্য আপত্তি তুলিল। গাজী সাহেব অনুযোগ করিয়া কহিলেন, ডি-সুজার পূর্বপুরুষেরা পিপার পর পিপা মদ টানিয়া পাচার করিয়া দিত আর সামান্য একটা বোতলের জন্য ডি-সুজা ভয় পাইতেছে!

পূর্বপুরুষ! যাদুমন্ত্রের কাজ করিল কথাটা, চন্ করিয়া মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল ডি-সুজার। দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেল বোতলটা, তারপর ডি-সুজা টলিয়া পড়িল মেজেতে—

নেশা ছুটিল পরের দিন—শেষ বেলায়।

আচ্ছন্ন চোখ দুটি কচ্লাইয়া লইয়া ভারি গলায় ডি-সুজা বর্মীর সন্ধান করিল।

গাজী সাহেব বলিলেন, চলে গেছে। ইয়াসিনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যেতে সকালেই চলে গেল।

—চলে গেছে! আমাকে ফেলে! অকৃত্রিম বিস্ময়ে ডি-সুজা সোজা উঠিয়া বসিল।

—হ্যাঁ, কী একটা জরুরি কাজ ছিল তার।

সন্দেহে ডি-সুজার মনটা মুহূর্তে ঘোলা হইয়া উঠিল: বর্মী চলিয়া গেল—তাহাকে একলা ফেলিয়াই!

লিসি বাড়িতেই আছে—আর—আর—

বিদ্যুৎ-চকিতের মতো ডি-সুজা কহিল, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে সাহেব। নৌকো আছে না?

—তা আছে। কিন্তু এখন তুমি কী করে যাবে? আকাশের অবস্থা দেখেছ?

আকাশের অবস্থা—হাঁ, সেটা দেখিবার মতোই বটে! শিকারী বাজের মতো আকাশের প্রান্তে প্রান্তে কালো মেঘ উড়িয়া আসিতেছে। ঋজু দীর্ঘ সুপারির বন প্রত্যাশায় নিস্তব্ধ। সামনে প্রকাণ্ড একটা নিমগাছের মাথায় অসংখ্য বক আসিয়া বসিতেছে রাশি রাশি শাদা ফুলের মতো। চারিদিকে নিস্তব্ধ সমারোহ।

ঝড় আসিতেছে।

অতএব ঝড় না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। বাতাস, বৃষ্টি! সমস্ত মনটায় তোলপাড় চলিতে লাগিল। এমন ঝড় এ বৎসর আর হয় নাই। ঘর বাড়ি কিছু পড়িয়া গেল কিনা কে জানে। তা ছাড়া লিসি একলা আছে বাড়িতে। জোহান—বর্মী—বিশ্বাস নাই কাহাকেও।

ঝড়ের পরে নৌকা লইয়া ডি-সুজা ফিরিল চর ইসমাইলে! রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। চোখের সামনেই জলিতেছে শুকতারা। বাড়ির সামনে দু-তিনটা সুপারি গাছ পড়িয়া—দরজাটা খোলা।

—লিসি!

কেহ সাড়া দিল না।

ডি-সুজা প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, লিসি!

এবার সাড়া আসিল। তবে লিসির নয়। একটা পরিচিত তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারে চারিদিক যেন চিরিয়া ফাটিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। ডি-সুজা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বাড়ির প্রাচীরের উপর বীরের মতো গলা ফুলাইয়া তাহার সেই বড় মোরগটা তীব্র কণ্ঠে প্রভাতী ঘোষণা করিতেছে। গ্রামের কেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—বোধহয় সুযোগ পাইয়া সে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

মোরগটা যথাস্থানেই ফিরিয়াছে, কিন্তু লিসি আর ফিরিল না। খবরটা সমস্ত চর ইসমাইলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। জোহানকে খুন করিয়া বর্মীটা লিসিকে লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ডি-সিল্‌ভা তিন দিন যাবৎ শয্যাগত। ভয়ানক ভয় পাইয়াছে লোকটা, আছাড় খাইয়া নিজের পা-ও ভাঙ্গিয়াছে।

৫

আর ওদিকে বলরাম ভিষক্‌রত্ন আবার সামাজিক হইয়া উঠিতেছেন। কিছুদিন তিনি তো একেবারে অসূর্যম্পশ্য হইয়াছিলেন বলিলেই হয়। মুক্তো—মুক্তো—মুক্তো! তাহার শাড়ীর খস খস্ শব্দ শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, তাহার চুড়ির শব্দ তাঁহার কানে জল-তরঙ্গ বাজাইত। মুক্তোর পায়ের শব্দ শুনিয়া তাঁহার হাতের তালু হইতে ক্রমগোলায়মান বটিকা টুপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইত এবং অসাবধানে ছাগলাদ্য ঘৃতের পাত্রটা উল্টাইয়া স্রোত বহাইয়া দিত! আর রাত্রি। সেগুলি যেন বাস্তব নয়—স্বপ্ন আর অনুভূতির ঘনত্ব।

কিন্তু আকস্মিক ভাবে বলরাম আবার আদি ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিলেন, বাহিরের জগৎটাকে আবার তিনি নিজের করিয়া লইলেন। নির্বিঘ্নে সুখ-শান্তি তিরোহিত হইয়া গেল রাধানাথের—দিনের মধ্যে তিরিশ বার করিয়া আবার তামাক যোগানো শুরু হইল। তাসের আসরে যথাযোগ্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনা প্রকাশ পাইতে লাগিল বলরামের।

তাসখেলার সঙ্গীদের তিনি আবার জোটাইয়া লইয়াছেন। এবার আর হরিদাস সাহা নাই, তা তিনি নাই থাকিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কথা মনে পড়িলেই শুধু বলরাম অস্বস্তি বোধ করেন। অলক্ষণে আর মুখফোঁড় হইলেও লোকটা তাঁহাকে ভালোবাসিত—হয় তো তিনিও তাহাকে সত্যই ভালোবাসিতেন। তা ছাড়া তাসের আসরে এমন জমাট গল্প বলিতে আর কেউ পারে না। কিন্তু কোথায় হরিদাস !

ঝড়ের রাত্রে তেঁতুলিয়ার সেই তাণ্ডব—হরিদাসের এক মাল্লাই নৌকা কি সে ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছে।

তাসের আসরে বসিয়া বলরাম অন্যমনস্ক হইয়া যান, ভুল করিয়া বসেন। সঙ্গীর সক্ষোভ চিৎকারে চেতনা ফিরিয়া আসে।

—আহা-হা তুরুপ করলেন না কবিরাজমশাই! পিটটা শুধু শুধুই গেল!

নূতন পোস্টমাস্টারও বেশ মজলিস জমানো লোক। তা ছাড়া খাসমহল অফিসের যোগেশবাবুও আসেন, মোটের উপর আড্ডা মন্দ জমে না।

তাস বাঁটিতে বাঁটিতে যোগেশবাবু বলেন, বুড়ো ডি-সুজা বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে।

কবিরাজ বলেন, তাই নাকি!

—হুঁ। সারাদিন চুপ করে বসে থাকে। কারো সঙ্গে কথা কয় না। রাত্রে চিৎকার করে কাঁদে। বড্ড শোক পেয়েছে লোকটা।

কবিরাজ বলেন, বদলোকের অমনিই হয়। মগ-টগগুলোর স্বভাবই ওই রকম।

যোগেশবাবু হাসেন, শয়তানের বন্ধুত্ব যে! তা ছাড়া বিশ্বাস করার নিয়মই এই। যে তোমাকে বেশি বিশ্বাস করবে, তাকেই তুমি বেশি করে ঠকাবে, তত বেশি করে সর্বনাশ করবে তার। এই নইলে আর কলিকাল বলে কেন।

খচ্ করিয়া কথাটা তীরের মতো আসিয়া বলরামের পাঁজরে বিঁধিয়া যায়। মুক্তোও তাহাকে বিশ্বাস করিত, খুব বেশি করিয়াই বিশ্বাস করিত। বলরাম তাহার যথাযোগ্য প্রতিদানই দিয়াছেন বটে। করবীর গোটা খাইয়া মুক্তো এখন তাহার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায় বুঝি।

বলরাম জোর করিয়া হাসেন। মুহুর্মুহু হাসেন—তারপর হো হো করিয়া অট্টহাসি। যোগেশবাবু খানিকটা বিস্ময় বোধ করেন। তাঁহার কথার মধ্যে হাসাইবার এতটা উপাদান যে আছে সে কথা তিনি জানিতেন না। তাঁহার চোখের দিকে চোখ পড়িতেই আকস্মিকভাবে বলরাম থামিয়া যান—আরো বিস্ময়কর বলিয়া যোগেশবাবুর মনে হয় সেটাকে।

—কবিরাজমশাই এই সাত সকালেই কিছু মোদক খেয়েছেন বুঝি?

—মোদক! না তো—অকারণেই কবিরাজের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

তারপর সভা ভাঙিয়া যায়ঃ সকলে বাহির হইয়া গেলে কবিরাজ একা বসিয়া থাকেন চুপ করিয়া। ফরশীর আগুন আপনা হইতেই নিবিয়া আসে, হাওয়ায় হাওয়ায় ঘরময় ছাই উড়িয়া বেড়ায়। দেওয়ালে কাচভাঙা ঘড়িটা কাঠঠোকরার মতো রুক্ষভাবে ঠক্ ঠক্ করে! বাজনাটায় কেমন করিয়া টান লাগিয়াছে—ন'টার

সময় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া যায়। কবিরাজের একবার মনে হয় উঠিয়া বাজনাটা ঠিক করিয়া দিবেন কিন্তু দেহে মনে কোথাও কোন প্রেরণা আসিতে চায় না। চীনা ছবির অনাবৃতাঙ্গ মেয়েটির মোহিনী হাসির উপর মাকড়সারা নিঃশব্দে জাল বুনিয়া চলে।

ওদিকে অন্তঃপুরে খোলা জানালার সামনে মুক্তোও নীরবে বসিয়া থাকে। দূরে দেখা যায় নদী—একটা মরুভূমির মতো ধূ ধূ করে যেন। বাতাসে মুক্তোর রুক্ষ চুলগুলি মুখের উপর পড়িয়া কাঁপে। সমস্ত চেহারায় রুক্ষ পাণ্ডুরতা, কেবল চোখ দুটি কিসের স্পর্শে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেহের পরিবর্তন অতিশয় সুস্পষ্ট।

মুক্তো কী ভাবে কে জানে। বলরাম তাহার মনের কোনো সন্ধান পান না, তলও পান না আজকাল। মুক্তো যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে তাঁহাকে। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। আশ্চর্য এই যে, চরম যাহা কিছু তাহা ঘটিবার পরেই সে বলরামকে ভয় করিতে শুরু করিয়াছে।

আগে দরজা বন্ধ করিত না। কিন্তু দু'দিন আগে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে।

ঝড়ের পর হইতে বলরাম আলাদাই থাকেন। নিজের মধ্যে কেমন একটা অপরাধীর ভাব আসিয়াছে তাঁর, মুক্তোকে স্পর্শ করিতেই তিনি সংকোচ বোধ করেন। তা ছাড়া সে-ও যে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে পারিলেই খুশি থাকিবে, ইহাও বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

কিন্তু মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া বলরাম অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিলেন। সেই নিঃসঙ্গতা—মুক্তো চরইসমাইলে আসিবার পূর্বেকার সেই অনুভূতি। দেহ এবং মন একটা সুতীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। বলরাম বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। জানালার ওপারে চাঁদ উঠিয়াছে। বাতাসে চামেলির গন্ধ। নদীর হাওয়ায় শীত করিতেছে—অভ্যস্ত খানিকটা দেহের উত্তাপ পাইবার জন্য যেন লালায়িত হইয়া উঠিলেন বলরাম। স্বপ্নাচারণার মতো নিঃশব্দে দরজা ঠেলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাশের ঘরে মুক্তো অঘোরে ঘুমাইতেছে। দরজাটা ভেজানো, ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল।

বিড়ালের মতো সতর্ক পা ফেলিয়া বলরাম আসিয়া দাঁড়াইলেন মুক্তোর পাশে। নিদ্রিত শান্ত মুখের উপর জ্যোৎস্নার পত্ররচনা। চোখের কোণে জল শুকাইয়া আছে —বাঁ গালের উপর উজ্জ্বল একটা সরল রেখা। নাকের সোনার ফুলটা করুণভাবে জ্বলিতেছে। পূর্ণায়মান দেহশ্রী অসম্বৃত বস্ত্রের অবকাশে উদ্ঘাটিত হইয়া আছে—যেন আত্মসমর্পণ করিতেছে নিজেকে। একটা অহেতুক করুণায় বলরামের মনটা ভরিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে নত হইয়া বলরাম মুক্তোকে স্পর্শ করিলেন।

ঘুমের মধ্যে ঠিক যেন সাপে কামড়াইয়াছে এমনিভাবে চমকিয়া মুক্তো উঠিয়া বসিল। খোলা চুলগুলি তাহার ঘাড়ে বুকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহার চোখের দৃষ্টি মনে হইল যেন পাগলের মতো। তারপর বলরাম কিছু ভাবিবার বা বলিবার আগেই মুক্তো তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, যাও তুমি, যাও!

বলরাম হতচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন, মুক্তো!

মুক্তো কান্নায় প্রায় ভাঙিয়া পড়িল, না—না—যাও তুমি।

বলরামের স্বর করুণ হইয়া উঠিল, আহা-হা, কেন তুমি—

—তুমি যাও, নইলে আমি চেঁচিয়ে সব জাগিয়ে তুলব বলছি—উত্তেজনায় মুক্তো সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল একেবারে। তাহার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

বলরাম কয়েক মুহূর্ত নির্বোধের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অপরাধীর মতো বাহির হইয়া গেলেন। মুক্তো দিনের পর দিন যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি দুরধিগম্য হইয়া উঠিতেছে। জরাতিসারের লক্ষণগুলিও এমন জটিল নয় বোধ হয়। নিদানেরও অতীত।

বলরাম বাহির হইয়া গেলে মুক্তো সজোরে দরজায় খিল আঁটিয়া দিল। বলরাম সম্পর্কে সম্প্রতি কেন যে এই অহেতুক ভয় তাহার মনে জাগিয়াছে সে তাহা নিজেও বুঝিতে পারে না।

প্রথম মনে হইয়াছিল সে আত্মহত্যা করিবে। রাত্রির সেই কুৎসিত মোহগ্রস্ত আত্মসমর্পণগুলি মাঝে মাঝে তাহাকে পীড়া দিত বটে, কিন্তু মোটের উপর সেগুলিকে সে সহজ করিয়াই লইয়াছিল একরকম। তারপর যখন সন্তান আসিয়া সাড়া দিল, তখন ঘৃণা এবং লজ্জায় মুক্তো আত্ম বিস্মৃত হইয়া গেল একেবারে। হইলই বা পাণ্ডব-বর্জিত দেশ, লোক-লজ্জা না হয় না থাকিল, কিন্তু মনকে সে বুঝাইবে কী বলিয়া এবং কী করিয়া?

অতএব সে আত্মহত্যার সংকল্প করিল। কিন্তু ভয় করে আত্মহত্যা করিতে। মনে পড়িয়া যায় গ্রামের বলাই পালকে, গলার নলীতে একটা ভোঁতা ক্ষুর বসাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল; তবুও একবার সে শাড়ীটাকে বেশ করিয়া দড়ির মতো পাকাইয়া চালের পাটাতনের উচ্চতাও হিসাব করিয়াছিল পর্যন্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত কৌতূহল তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

সন্তান আসিতেছে। তাহার দেহের অভ্যন্তরে ছোট একটি মাংসপিণ্ডের আকারে একটা নূতন বিস্ময় রূপ পাইতেছে। নিজের রক্ত দিয়া, আয়ু দিয়া মুক্তো পালন করিতেছে তাহাকে—গড়িয়া তুলিতেছে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাহাকে পূর্ণ করিয়া।

নিজের মধ্যে এই বিরাট শক্তি—এই বিশাল সৃষ্টি-ক্ষমতার কথা ভাবিয়া আজ আর মুক্তোর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। স্বামী-পরিত্যক্ত বিড়ম্বিত তাহার জীবন—গ্রামের মেয়ের পরম কাম্য এবং একান্ত লোভের বস্তু সন্তানকে পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা সে ভুলেও করিতে পারে নাই। অন্যের শিশুকে লোভীর মতো বুকে টানিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ব্যথাই বাড়িয়াছে শুধু, কিছুমাত্র কমে নাই। সেই সন্তান! সেই সন্তানের জননী হইতে চলিয়াছে সে! অকস্মাৎ নিজের জীবনের প্রতি মুক্তোর অত্যন্ত মমতা হইল। সে বাঁচিতে চায়, নিজের সৃষ্টিকে সে স্থায়ী করিয়া যাইতে চায় এই পৃথিবীর বুকে। কিন্তু পিতৃ-পরিচয়? না—অত কথা অত ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভাবিতে চায় না। এক মাত্র মাতৃত্বেই তাহার লোভ—দুর্বার এবং প্রচণ্ড।

বলরামকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া মুক্তো যখন জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, হৃৎপিণ্ড দুইটায় আন্দোলন চলিতেছে প্রমত্তভাবে। এতক্ষণে—এতক্ষণে সে বুঝিয়াছে বলরামকে কেন সে এত ভয় করিতেছে। এই পিতৃত্ব বলরাম চায় না—এই পিতৃত্ব তাহার পক্ষে অভিশাপ। তাই বলরামের ভীরু দৃষ্টির মধ্যে মুক্তো দেখিয়াছে হত্যাকারীর চোখ—তাহার সন্তানকে হত্যা করিয়া কাপুরুষ দায়মুক্ত হইতে চায়। নির্বোধ সারল্যের নেপথ্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে তীক্ষ্ণাগ্র ছুরি ফলক।

তড়িৎগতিতে একটা তীব্র বেদনা পেটের মধ্য হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া ব্যথায় যেন সর্বাঙ্গ অবশ করিয়া দিল মুক্তোর। দেহের নিভৃত রহস্যলোক হইতে একটা জীবন সত্তা কিসের যেন ক্ষুব্ধ আকাশে থাকিয়া থাকিয়া তাহার পাঁজরে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে। ব্যথায় মুক্তোর সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, চোখ দুটি বুজিয়া আসিল। জানালার শিক ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে।

মণিমোহনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিয়া। প্রজাদের ডাকাইয়া আনা, টাকার জন্য তাগিদ দেওয়া। অপরিচ্ছন্ন অমার্জিত নানাস্তরের লোকের ভিড়। অশ্রান্ত বকুনি শোনা এবং অবিশ্রামভাবে বকিয়া যাওয়া।

দেখা গেল—দেনাটা মজাঃফর মিঞারই সব চাইতে বেশি এবং সেই জন্য তোষামোদটাও তাহার দৈনন্দিন হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা গোপীনাথই অনুধাবন করিল সব চাইতে আগে এবং আর যাই হোক, মণিমোহনের নৌকায় মুরগীর অভাব রহিল না।

মজাঃফর মিঞা অনুতপ্ত বোধ করিতে লাগিল। শৃগালকে ভাঙা বেড়া দেখানোর

সম্পর্কে প্রচলিত প্রবচনটি মনে পড়িল তাহার। এইভাবে প্রতিদিন মন যোগাইবার চেষ্টা না করিয়া কয়েকটা টাকা ফেলিয়া দিলেই ত চুকিয়া যাইত। কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—এখন প্রায়শ্চিত্ত চলিবে।

গোপীনাথের তাহাতে তৃপ্তি নাই—তাহার উদরে ভুমা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। বলে, রোজ রোজ আর মুরগী খেতে ভালো লাগে না মিঞা, খাসী টাসী খাওয়াও একটা।

—খাসী! জাফরাণ রাঙানো দাড়ির মধ্যে মজাঃফর মিঞার বিপন্ন আঙুলগুলি শক্ত হইয়া আসে: তাই তো, খাসী!

গোপীনাথ অধৈর্য হইয়া উঠে, হাঁ-হাঁ, খাসী। বেশ তেল চুকচুকে। আমরা হিঁদুর ছেলে, আমাদের ওই কুঁকড়ো মুকড়ো আর কতদিন সহ্য হয়! জুৎসই একটা খাসী পেলে বেশ প্রেমসে—গোপীনাথ জিভ দিয়া একটা অর্থপূর্ণ সলোভ শব্দ করে।

—তাই তো বাবু, খাসী কোথায় পাওয়া যাবে?

কোথা হইতে কাসেম খাঁর ব্যাটা আসিয়া ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া নেয় কথাটা। মজাঃফর মিঞাকে বিপন্ন করিবার জন্যই যেন সে সব সময়ে খাপ পাতিয়া আছে।

বলে, কেন চাচা, অমন ইয়া ইয়া তোমার খাসী, দশ-পনেরো সের গোস্ত হবে এক একটায়। তারই একটা দিয়ে দাও না বাবুদের।

গোপীনাথ সোৎসাহে বলে, বটে, বটে!

দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া ওঠে মজাঃফর মিঞার। এই হতভাগা ছোকরাটাই তাহাকে ডুবাইবে। কবে সে তাহার ক্ষেতে মহিষ নামাইয়া জোর করিয়া ধান খাওয়াইয়াছে, তাহার শোক আজও ভুলিতে পারিল না। কোথায় থাকে কে জানে—ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া দেয় নির্ঘাৎ।

মজাঃফর করুণ কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, বিশ্বাস করবেন না। ও চ্যাংড়া ভয়ানক মিথ্যেবাদী। দিনকে রাত করতে পারে ও।

ছোকরাও ছাড়িবার পাত্র নয়? সে সভাস্থ সকলকে তৎক্ষণাৎ সাক্ষী মানিয়া বসে। বলে, আমি মিথ্যে বলছি? তা হলে হুজুর নিজেই যাচাই করে নিন। এই ইয়াকুব রয়েছে, এই আনিসুদ্দীন আছে, ওই জাফর—সবাইকে জিজ্ঞেস করুন মজাঃফর চাচার তিনটে বড় বড় খাসী আছে কিনা।

এসব কথা আর আলোচনা করিয়া খুব বেশি করিয়া সাড়া তোলে না মণিমোহনের মনে। তাহার সমস্ত চেতনায় কেমন একটা আলোড়ন শুরু হইয়াছে। এই জল, এই আকাশ বাতাস—উপনিবেশের এই সব বিচিত্র মানুষের দল। ইহারা ক্রমেই মণিমোহনের ভাবনায় প্রেতচ্ছায়া ফেলিতেছে, যেন কী একটা অদ্ভুত জিনিস

সঞ্চার করিতেছে তাহার রক্তে! বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুস্ যেদিন আগুন আনিয়াছিল, সেদিন সে আগুনের ব্যবহার কাহারো জানা ছিল না—সে আগুন নিজেদের ঘরে লাগাইয়া দিয়া অন্ধ-উল্লাসে তাহারা উৎসব করিয়াছিল হয় তো। সেই মূঢ় আনন্দ আসিয়া যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চায়, নিজের শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুকে বিদ্রোহের আগুনে দগ্ধ করিয়া—

বোটে বসিয়া মণিমোহন দেখে জল বহিয়া চলিয়াছে। অবিশ্রান্ত—অতলস্পর্শ। পাল তুলিয়া মাঝে মাঝে নৌকা যায়। মহাজনী নৌকার দীর্ঘ মাস্তুলের আগায় কাক বসিয়া থাকে ধ্বজার মতো।

মণিমোহনের মাঝিরা আলাপ করিতে চায়। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, নৌকা কোথা থেকে আসছে ভাই?

হয় তো জবাব আসে, লালমোহন।

—কোথায় যাবে?

—ওপারে আমতলী হয়ে বগার বন্দরে।

বগা। নামটা অপরিচিত নয় একেবারেই। পটুয়াখালি মহকুমার স্বনামধন্য বন্দর আর গঞ্জ। এত বড় প্রকাণ্ড ধান আর চাউলের আড়ত বাংলা দেশের শস্য-ভাণ্ডার, এই জেলাতেও খুব বেশি নাই। লক্ষপতি। মহাজনেরা ওখানে ধান চাউলের পাহাড়ের উপর বসিয়া দেশের ক্ষুধার্ত অঞ্জলিতে মুষ্টিভিক্ষা বর্ষণ করিতেছে—অবশ্য মূল্য বিনিময়ে। আর—সেই সঙ্গে ভাবিয়া বিস্ময় লাগে যে বরিশাল জেলায় দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। সরকার হইতে বীজধান কিনিবার ও আবাদ করিবার জন্য চাষীদের যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, সে টাকা আদায় করিবার জন্যই তাহার এই অভিযান।

গোপীনাথ আসিয়া বলে, এবার তো খুব ভালো ধান হয়েছিল বাবু। তবু দেশের অবস্থা যে কে সেই।

ভালো ধান হইয়াছিল সত্য। মণিমোহন নিজের চোখেই তো দেখিয়াছে। এই কালুপাড়া—শুধু কালুপাড়া কেন—আশে পাশের যে কোনো চরের দিকে তাকাইলে লক্ষ্মীশ্রীতে চোখ ভরিয়া তুলিত একেবারে। বৃষ্টি হইয়াছে, নিয়মিত বর্ষার বানে নতুন পলি পড়িয়া ধানের ক্ষেত উর্বর হইয়াছে। আর ধানের শীষ্‌গুলি শাঁসে সমৃদ্ধ হইয়া বাতাসে দোল খাইতেছে। ধীরে ধীরে মেঘ-বরণ সেই ধানে সোনার আভা লাগিল। দুদিন পরেই কাস্তে পড়িবে—দেশ ও জাতির সমস্ত স্বপ্ন আর আশা উদ্‌গ্রীব চোখ মেলিয়া তাকাইয়া আছে এই ধানের দিকেই।

কিন্তু স্বপ্ন আর আশা। কতটুকু তাহার ফলিল, সার্থকতা লাভ করিল কী

পরিমাণে। পৃথিবীর খনি হইতে যাহারা জীবনমূল্যে এই সোনা আহরণ করিল, তাহাদের বুভুক্ষু চোখের সামনে দিয়া তাহা চলিয়া গেল বগায়, সাহেবগঞ্জে, টর্কীতে আর ঝালকাঠির বন্দরে। মহাজনের গোলায় বস্তা ভরিয়া সেই ধান আশ্রয় পাইল। তারপর—তারপর?

তারপর যাহা চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ—ওটা তো লাগিয়াই আছে—গাছে পাতা এবং মাঠে ঘাস থাকিতে কোনো দুশ্চিন্তা নাই সেজন্য। সরকার? সরকারের দোহাই দিলে শিয়াল কুকুরেও হাসিয়া উঠিবে।

কিন্তু এ সব ভাবিয়া মণিমোহনের বিশ্রী লাগে। কেন সে ভাবিতে চায় এত কথা? চাকরী করিতে আসিয়াছে, চাকরীই করিয়া যাইবে।

গোপীনাথ আসিয়া মাঝে মাঝে গল্প করিতে চায়। দেশের কথা, বৌয়ের কথা। মণিমোহনকে সে সমব্যথী বলিয়াই জানে।

বলে, এবার বিশে ফাল্গুন দোলযাত্রা।

মণিমোহন হাসিয়া বলে, তাই নাকি? কী করে জানলে?

—বাঃ জানব না? গোপীনাথ চোখ বড় বড় করিয়া বলে, হিন্দুর ছেলে।

—কিন্তু জেনে কী লাভ?

—লাভ? তাই বটে। সব সময়ে সে কথা মনে থাকে না। গোপীনাথ বিষণ্ণ আর গম্ভীর হইয়া যায়। যা দেশ! দোল-দুর্গোৎসব যাহা কিছু, কাহারো কোনো মূল্য নাই! চাকুরীর দুর্ভাগা জীবন। খাতা খুলিয়া হিসাব লেখা, প্রজাদের সঙ্গে বকাবকি করা, টাকা পয়সা গুনিয়া লওয়া আর মাঝে মাঝে এক আধটা মুরগীর ঠ্যাং চর্বণ। ইহাই আদি এবং ইহাই অন্ত।

—গত বছর দোলের সময়—বলিয়াই থামিয়া যায় গোপীনাথ। মনটা ব্যাকুল হইয়া ওঠে তাহার। এ-ও তো বাংলা দেশ—বাংলা দেশ? এ যেন আর এক পৃথিবী। এখানকার মানুষগুলি প্রক্ষিপ্ত। দোল ইহাদেরও আছে, কিন্তু মানুষের রক্তে। জমি লইয়া, ধান কাটা লইয়া।

গোপীনাথ বসিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ দেশের গল্প করে, বৌয়ের কথা বলে, নিজের পাঁচ বছরের ছেলেটার কথা ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর উঠিয়া যায় রান্না চাপাইতে। বজরার বাহিরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, ডায়েরীর লেখাগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যায়, মণিমোহন আসিয়া দাঁড়ায় বজরার ছাদের উপর। নদী অসম্ভব শান্ত। যেন ঘুম-পাড়ানি গান গাহিয়া চলিয়াছে।

বর্মী মেয়েকে ক'দিন ধরিয়া আর দেখা যায় নাই। তার জন্য দোষ অবশ্য বর্মী মেয়ের নয়। সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর মণিমোহন আর গ্রামের দিকে পা বাড়ায় নাই।

সমস্ত মনটা তাহার দিন কয়েক কেমন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, অত্যন্ত অশুচি বোধ হইয়াছিল নিজেকে। কিন্তু ধীরে ধীরে আত্মস্থ হইয়া উঠিতেছে মণিমোহন। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বজরার জানালা দিয়া যখন হলদে চাঁদের আলো আসিয়া মুখে পড়ে, আর নদীর উপর দিয়া গাঙ-শালিকের চিৎকার তীক্ষ্ণ আর করুণ হইয়া ভাসিয়া যায়, তখন মণিমোহনের যাহাকে মনে পড়ে, আশ্চর্য এই যে রাণী সে নয়। অর্ধতন্দ্রার মধ্যে মণিমোহন যেন দেখিতে পায় কাহার দুটি নীল গভীর চোখ আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সাপের মতো বেণী-করা কাহার চুল তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটা স্বেদাক্ত দেহের দৃঢ় কোমল বন্ধন তাহার সর্বাঙ্গ নিবিড় করিয়া ঘিরিয়া আছে যেন—তাহার চুলের গন্ধ, তাহার মুখের মিষ্টি গন্ধ, তাহার ঘামের গন্ধ তাহাকে ক্লোরোফর্মের মতো অচেতন করিয়া ফেলিতেছে।

তন্দ্রা টুটিয়া যায়। বজরার মধ্যে লঘু অন্ধকার। গোপীনাথের নাক ডাকিতেছে। চুলের গন্ধ নয়—জল ও ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধ ছড়াইয়া যাইতেছে বাতাসে। দূরে তেঁতুলিয়ার বুকে পাড়ি ধরিয়া কোনো মাঝি ভাটিয়ালির স্বর তুলিয়াছে :

“রজনী আন্ধার ঘোর মেঘ আসে ধাইয়া,
পার কর নাইয়া—”

৬

গঞ্জালেস্ চাটগাঁয়ে ফিরিল বটে, কিন্তু কবির ভাষায়, গোটা মনটা লইয়া সে ফিরিতে পারিল না। আধখানা তাহাকে রাখিয়া আসিতে হইল চর ইস্মাইলে। গঞ্জালেস্কে শনিতে পাইল বলিলেই কথাটা ঠিক করিয়া বলা হয়।

এতদিন তো কাটিতেছিল বেশ। আর যাই হোক নারী-সম্পর্কিত অভাব বোধটা গঞ্জালেসের ছিল না। অর্থশুল্কেই দৈহিক দাবীটা মিটিতেছিল, দেহের নিতান্ত স্থূল দিক ছাড়া মেয়েদের আর কোনো প্রয়োজন আছে এ কথা গঞ্জালেসের কখনো মনে হয় নাই। অন্তত উত্তরাধিকার-সূত্রে আর কিছু না পাইলেও পৈতৃক এই মনোভাবটা সে আয়ত্ত করিয়াছিল। বিবাহ করিয়া তাহার দায় টানিয়া চলা—এটাকে নির্বোধের বিড়ম্বনা বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল এতকাল, কিন্তু অকস্মাৎ যেন গঞ্জালেসের ভ্রম ভাঙিল।

আর সেটাকে প্রথম আবিষ্কার করিল তাহার বন্ধু পেরিরা।

সহরের বাহিরে ছোট একটা বাড়ি করিয়া লইয়াছিল গঞ্জালেস্। নারিকেলের কুঞ্জে ঘেরা—নিরালা এবং নিভৃত। একটু দূরেই কর্ণফুলী। জাহাজ-ঘাটের কালো কালো ধোঁয়াগুলি এখান হইতে দেখা গেলেও মোটের উপর জায়গাটি নিরিবিলি এবং শান্তিপূর্ণ।

দুপুর-বেলায় পেরিরা আসিয়া দেখিল, বাহিরের ঘর খোলা, কিন্তু গঞ্জালেস্ নাই। পেরিরা ভিতরে ঢুকিল, কিন্তু গঞ্জালেস্ সেখানেও নাই। এই দুপুর-বেলায় ঘর-দুয়ার সব খোলা রাখিয়া লোকটা গেল কোথায়?

এমনি সময় মুসলমান বাবুর্চিটির সঙ্গে দেখা হইল। পেরিরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, সাহেব কোথায়?

বাবুর্চি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, বাগানে।

—বাগানে? বাগানে কী করছে?

বাবুর্চি মৃদু হাসিটা আর একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দাড়ির ফাঁকে শাদা দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল তাহার। বলিল, গাছে চড়ছে।

—গাছে চড়ছে! সে কী!

—যান্—দেখুন না। বাবুর্চি প্রস্থান করিল।

গাছে চড়িতেছে এই ভর দুপুর-বেলায়! লোকটার কি মাথা খারাপ হইয়াছে নাকি! না অতিরিক্ত খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গিলিয়া যা খুশি তাই করিতে শুরু করিয়াছে! পেরিরা ছুটিয়াই বাগানে গেল।

কোথাও কেহ নাই। পেরিরা চীৎকার করিয়া ডাকিল, স্যামুয়েল!

অন্তরীক্ষ হইতে সাড়া আসিল, এই যে!

—অ্যাঁ, তাই তো! পেরিরা নিজের চোখ দুইটাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—বাবুর্চি তাহা হইলে বানাইয়া বলে নাই এক বিন্দুও! নারিকেল গাছের মাথায় বসিয়া আছে গঞ্জালেস্। মুখের ভাব অত্যন্ত গর্বিত এবং প্রসন্ন—যেন কেহ তাহাকে দিল্লীর তখ্‌ত তাউসে বসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া পেরিরার শূলে চড়ানোর মতই বোধ হইল।

—আরে পাগল নাকি! এই দুপুরবেলা নারকেল গাছে? নামো, নামো।

স্যামুয়েল সামান্য অপ্রতিভ বোধ করিল। বহু কষ্টে টানা-হেঁচড়া করিয়া মাটিতে পদার্পণ করিল সে। অনভ্যাসের ফলে শার্টটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে অনেকখানি। ছাল ছাড়িয়া তিন-চার জায়গা হইতে রক্ত পড়িতেছে। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, মুখে পরিতৃপ্ত প্রসন্নতার হাসিটি আঠার মতো লাগিয়া আছে।

পেরিরা হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর খানিকটা

প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, ব্যাপার কী তোমার? হঠাৎ এই ভাবে গাছে চড়তে শুরু করেছ, গাঁজা খাচ্ছ নাকি আজকাল?

—না, গাঁজা খাচ্ছি না। স্থামুয়েলের কণ্ঠস্বর অপ্রসন্ন শুনাইল, অভ্যাস করছি।

—অভ্যাস করছ! এত অভ্যাস থাকতে গাছে চড়া?

—ওসব তুমি বুঝবে না—পেরিরার কাঁধে একটা থাবড়া দিয়া গঞ্জালেস্ তাহাকে বাড়ির মধ্যে লইয়া আসিল: কী বলে, একটু ব্যায়াম করে নিলাম আর কি। গাছে চড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো জিনিস।

—কিন্তু এই দুপুরবেলা?

—এসো এসো, চা খাওয়া যাক এক পেয়ালা।

নারিকেল গাছে ওঠা লইয়াই ব্যাপারটা আরম্ভ হইল, কিন্তু শেষ হইল না। দিনের পর দিন গঞ্জালেসের পরিবর্তন শুরু হইল। বাহির আর নয়—এবার ঘর লিসির তামাটে আরাকানী মুখখানা যখন তখন আসিয়া স্বপ্ন-সঞ্চার করিয়া যায়। কাজকর্মে আলস্য আসিয়াছে। জাহাজের খোল বোঝাই করিয়া শুটকি মাছ তুলিয়া দিতে গিয়া গঞ্জালেস লিসির কথা ভাবিতে শুরু করে, বস্তা গণিতে ভুল হইয়া যায়। পেরিরা আসিয়া সন্ধ্যার আড্ডায় যাওয়ার জন্য টানাটানি করে কিন্তু তাহাকে নড়াইতে পারে না।

বলে, কী ব্যাপার? যাবে না?

গঞ্জালেস্ সংক্ষেপে বলে, উঁহু!

—কেন? রাতারাতি সুবুদ্ধি চাড়া দিল নাকি? সেণ্ট জন হওয়ার মতলবে আছ? জেরুজালেম রওনা হচ্ছ নাকি?

পরিহাসে বর্মচর্ম ভেদ হয় না। ততোধিক সংক্ষেপে গঞ্জালেস্ জবাব দেয়—হুঁ।

পেরিরা নিরাশ হইয়া যায়। কী যেন হইয়াছে লোকটার। আধিব্যাধি কিছু নয় তো? কিন্তু ভাব দেখিয়া তা তো মনে হয় না। খাওয়ার সময় বরং ডবল পরিমাণে গিলিতে শুরু করিয়াছে আজকাল। তবে কি মাথা খারাপ হইয়া গেল? ভাবিয়া অত্যন্ত মনঃকষ্ট বোধ করে পেরিরা।

নাঃ, আর দেরী করা ঠিক নয়। গঞ্জালেস্ অধীর হইয়া উঠিল যেমন করিয়া হোক লিসিকে আনিতেই হইবে। কাজকর্ম সব গোল্লায় যাইতেছে—লোকজন যাহারা কাজ করে তাহারা চুরি-চামারি করিতেছে আপ্রাণ। সর্বোপরি তাহাকে পাগল ভাবিয়া পেরিরা যে সব কাণ্ড করিতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে গঞ্জালেসের মাথায় খুন চাপিয়া যায় একরকম।

কথা নাই বার্তা নেই, পেরিরা আসিয়া গঞ্জালেসকে টানিয়া বাহির করিল। বলিল, আজ রবিবার, চলো গীর্জায় যাই।

—গীর্জা? এবার হাঁ করিবার পালা গঞ্জালেসের। পেরিয়া গীর্জায় যাইতে চায়—ইহাও এ জন্মে তাহাকে দেখিতে হইল! গঞ্জালেস্ বলিল, গীর্জায়!

—হাঁ, হাঁ, গীর্জায়। চল না।

খানিকটা বিস্ময় এবং কিছুটা কৌতুক বোধ করিয়া গঞ্জালেস্ গীর্জায় আসিল। প্রার্থনা ইত্যাদির ব্যাপার শেষ হইলে ফাদার আসিয়া গঞ্জালেস্ ও পেরিরাকে পাশের একটা ছোট ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

গঞ্জালেসের সবই কেমন রহস্যময় বোধ হইতেছিল। রহস্যটা আরো বেশি প্রগাঢ় হইয়া আসিল তখনই—যখন পাদ্রী সাহেব খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে কটমট্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর বিড় বিড় করিয়া কী খানিকটা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, শয়তান, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। মুক্তি দাও এর আত্মাকে।

গঞ্জালেস বোবার মতো চাহিয়াই রহিল। পাদ্রী সাহেব আবার কহিলেন, শয়তান, পৃথিবীতে অনেক পাপীর আত্মা আছে, যাদের তুমি ইচ্ছে করলেই নরকে টেনে নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু এর পবিত্র আত্মা ভগবানের দাসত্বে নিয়োজিত, একে তুমি হরণ করতে পারো না।

মুহূর্তে গঞ্জালেসের অধিগম্য হইল ব্যাপারটা। পেরিরার দিকে তাকাইল, দেখিল সে মিটি মিটি হাসিতেছে। গঞ্জালেসের মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে বেঠিক হইয়া গেল। তাহাকে বেকুব বানাইয়া তাহার খরচায় খানিকটা হাসিয়া লইবার চেষ্টা। অশ্রাব্য ভাষায় সে পাদ্রী সাহেব পেরিরাকে একটা গালি বর্ষণ করিয়া বেগে বাহির হইয়া গেল। পাদ্রী সাহেব চোখ দুটি বিস্ফোরিত করিয়া সখেদে কহিলেন, হায়, শয়তান এর আত্মাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে।

শয়তান আত্মাকে থাক্, বা না থাক্, গঞ্জালেস্ বাহির হইয়া আসিয়া আর বিলম্ব করিল না। নৌকা সাজাইয়া লইয়া সে চর ইস্মাইলের পথে পাড়ি জমাইল। এবারে লিসিকে লইয়া তবেই সে ফিরিবে।

সন্দীপ হইয়া আসিলে অনেকটা ঘুরিতে হয়, কাজেই সোজাসুজি পাড়ি ধরিল সে। হাতিয়ার মোহনায় নদী আর সমুদ্রে যেখানে একাকার হইয়া গিয়াছে—সেখান দিয়া নীল জলের উপর নৌকা চালাইয়া সে আসিল সাহাবাজপুরের নদীতে। এমনি সময় ঝড় উঠিল রুদ্র-মূর্তি লইয়া। ভোলার দ্বীপের এক প্রান্তে আশ্রয় লইয়া গঞ্জালেসের নৌকা সে ঝড় হইতে আত্মরক্ষা করিল—তারপর ভোলার কূলে কূলে নৌকা বাহিয়া তেঁতুলিয়া পার হইয়া সে চর ইস্মাইলে আসিয়া দেখা দিল।

সকালের আলোয় স্নান করিতেছে চর ইস্মাইল। কোথাও এতটুকু কোনো পরিবর্তন নাই। চৈত্রের স্পর্শে জলের নীল রঙ একটু একটু শাদা হইয়া উঠিতেছে, উপরের কোনো কোনো নদীতে ঢল্ নামিতেছে বোধ হয়। পর্তুগীজের ভাঙা-গীর্জার ওখানে ঝির্ ঝির্ করিয়া তেমনই মাটি ভাঙিতেছে।

নৌকা হইতে নামিয়া কয়েক পা হাঁটিতেই ডি-সিল্‌ভার সঙ্গে দেখা হইল তাহার।

ডি-সিল্‌ভা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছিল। এক হাতে লাঠি। এক পায়ে বেশ করিয়া ন্যাকড়া জড়ানো। সুডোল ভুঁড়িটা কয়দিনের মধ্যেই কেমন চুপসাইয়া ছোট হইয়া গেছে।

গঞ্জালেস্‌কে দেখিয়া ডি-সিল্‌ভা থামিল। তাহার চোখে মুখে এক ধরনের আত্ম-প্রসাদ প্রকাশ পাইল। সে নিজে বুড়ো এবং ভুঁড়ো—এই কার্তিকটিকে জামাই করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল ডি-সুজা। সকলের আশায় ছাই দিয়া লিসিকে কে লইয়া গেছে।

বলিল, আরে, এই যে স্যামুয়েল সাহেব। কী মনে করে?

—বেড়াতে এলাম।

—বেড়াতে? বেশ, বেশ। কিন্তু একটা ভারী দুঃসংবাদ আছে যে।

—দুঃসংবাদ? গঞ্জালেস্ থমকিয়া থামিয়া দাঁড়াইল, কিসের দুঃসংবাদ?

—আর বলো কেন। লিসিকে বর্মীরা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর তার শোকে বুড়ো ডি-সুজা পাগল। দিন রাত কাঁদছে আর—

বলিয়াই আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, গঞ্জালেসের উপর আশাতীত ফল হইয়াছে। তাহার সমস্ত মুখ মুহূর্তে শাদা হইয়া গিয়াছে—পা দুইটা কাঁপিতেছে থর থর করিয়া, চোখের দৃষ্টি শূন্য আর অর্থহীন।

অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ডি-সিল্‌ভা চলিয়া গেল।

ডি-সুজা সংক্রান্ত খবরটা যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছিল নুরুল গাজীর কানে।

ব্যাপারটা শুনিয়া গাজী সাহেব বিস্মিত হইলেন। লিসিকে দেখিয়া তাঁহারই এক সময়ে কিছু চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, কাজেই অন্যে যে তাহার উপর ছোঁ মারিয়াছে এটা এমন কিছু অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়! কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহাদের ব্যবসায়-গত ব্যাপারটা ফাঁস না হইয়া যায় সেটা ভালো করিয়া দেখিবার জন্য তিনি চর ইসমাইলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডি-সুজা চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়াছিল। এই কয়দিনেই অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার চেহারায়। পাড়ার কে একটি মেয়ে আসিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া

দিয়া যায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। সমস্ত দিন সে নীরবে বাড়ির রোয়াকে বসিয়া থাকে, কাহারো সঙ্গে কথা বলে না। তারপর রাত্রি যখন আসে—রাত্রি আসে নয়—রাত্রি যখন গভীর হয়, সে অদ্ভুত অমানুষিক স্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদে। সে কান্না শুনিলে সারা গা ছম্ ছম্ করিয়া ওঠে।

গাজী সাহেব ডাকিলেন, বুড়া সাহেব!

এই নামেই ডি-সুজা পরিচিত। কিন্তু বুড়া সাহেব জবাব দিল না।

গাজী সাহেব আবার কহিলেন, বুড়া সাহেব!

ডি-সুজা কটমট করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। তাহার চোখ দেখিয়া গাজী সাহেব শিহরিয়া পিছাইয়া আসিলেন। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চোখে আসিয়া জমা হইয়াছে তাহার। খুন করিবার আগে মানুষের চোখ এম্‌নি হইয়া ওঠে বোধ হয়।

—বিস্‌মিল্লা!

স্বগতোক্তি করিয়া গাজী সাহেব বাহির হইয়া আসিলেন। ডি-সুজার সম্পর্কে আর কোনো ভরসাই নাই। একেবারে গোল্লায় গিয়াছে—উন্মাদ পাগল।

রাস্তায় নামিয়া গাজী সাহেবের মনে হইল, একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলে নেহাৎ মন্দ হয় না ব্যাপারটা।

কবিরাজের সঙ্গে গাজী সাহেবের পরিচয় অনেকদিনের। মাঝে কিছুদিন উদরীতে পেটে জল হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছেন। সেই সময় পটপটি খাওয়াইয়া কবিরাজ রোগমুক্ত করিয়াছিল তাঁহাকে। সেই জন্য কবিরাজের প্রতি গাজী সাহেব কৃতজ্ঞ হইয়া আছেন। গুটি গুটি পায়ে তিনি বলরাম ভিষক্‌রত্নের ডিস্পেন্‌সারীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বলরাম তখন কিছু পারিবারিক ব্যাপারে বিপন্ন ও বিব্রত হইয়াছিলেন।

মুক্তোকে লইয়া কী করা যায় এখন? আরো বিশেষ করিয়া এই সন্তানের দায়িত্ব। অবাঞ্ছিত এই পিতৃত্বের বোঝা মাথায় করিয়া চলা কোনো মতেই সম্ভব নয়—লোক লজ্জার কথা না হয় না-ই ধরিলাম।

বলরামের চিন্তার মধ্যে অনেকগুলি কবিরাজী ওষুধ ও শিকড়-বাকড় আসিয়া ঝিলিক দিয়া গেল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন মুক্তো বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছে।

বলরাম কহিলেন, ও কী করছ তুমি?

মুক্তোর চোখে ভয়ের ছায়া পড়িল। বলিল, কাঁথা।

—কেন?

মুক্তো জবাবই দিল না।

বলরাম বিছানাটার একপাশে বসিলেন। বলিলেন, ছাখো অনেক ভেবে দেখলাম ওটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। নইলে তোমারও কলঙ্ক—আমারও একটা বিশ্রী—সপ্রতিভভাবে বলরাম একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

মুক্তো ভয়ার্ত চোখ মেলিয়া কয়েক সেকেণ্ড তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার হাত হইতে সেলাইটা খসিয়া পড়িল। তারপর সেদিনকার সেই রাত্রির মতোই সে চিৎকার করিয়া উঠিল, না—না!

—না, না? বলরাম হতবাক হইয়া গেলেন: কেন, এতে তোমার আপত্তির কী থাকতে পারে? এ ছাড়া তো উপায় নেই আর। আমার কাছে ভালো ওষুধ আছে, যদি বলো তো আজকেই চেষ্টা করে দেখি। তোমার কোনো—

—না, কিছুতেই নয়। মুক্তো উঠিয়া দাঁড়াইল—যেন বলরামকে স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতেছে। বলরাম খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তারপর টাক চুলকাইতে চুলকাইতে পুনর্মূষিক হইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন।

মুক্তো—নাঃ, মুক্তো দুঃসাধ্য। এমন জানিলে দুদিনের সখের জন্য বলরাম এমন একটা কাণ্ড করিতেন নাকি। বেশ ছিলেন—কিন্তু এখন সামলাও ঠ্যালা! সুখে থাকিতে ভূতে কিলানো আর কাহাকে বলে!

রাধানাথ আসিয়া একখানা চিঠি দিল।

চিঠি? চিঠি আসিল কোথা হইতে? বলরাম চিঠিখানা তুলিয়া লইলেন। হাতের লেখাটা চেনা চেনা ঠেকিতেছে—হাঁ, হরিদাসের চিঠিই তো।

হরিদাস লিখিয়াছেন:

ভায়া হে, জানিয়া নিরাশ হইবে যে আমি মরি নাই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এখনও বাহাল তবিয়তেই বাঁচিয়া আছি, এক হাঁপানির টান ছাড়া আর বিশেষ কোনো অসুবিধা হইতেছে না।

পথে নদী কিঞ্চিৎ ভারতীয় নৃত্য দেখাইয়াছে। ডুবাইয়া মারিবার মতলব করিয়াছিল, কিন্তু পারিয়া ওঠে নাই। আমার গৃহিণী বহু শিবপূজার ফলে আমার মতো ভৃঙ্গীকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন, এত সহজেই তাঁহার বৈধব্য ঘটিবে কেন? তাই আর একবার শুকনা মাটিতে পা দিয়াছি।

ভাবিতেছ, আমি গৃহিণীর মুখ-চন্দ্রমা দর্শন করিয়া মধুযামিনী যাপন করিতেছি? সেটা ভাবিয়া থাকিলে মহা ভ্রম করিয়াছ। আমি অন্ধকারের জীব—প্যাঁচাই বলিতে পারো, তাই অতটা চন্দ্র-ফন্দ্র আমার তেমন সহ্য হয় না। আমি এখন ঘরে নয়—পথে!

মণিপুর রোড দিয়া হাঁটিতেছি। দু পাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অতীতের কঙ্কালগুলি ইট পাথরের রূপ লইয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছে। বহু দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা হাতীর পাল দেখিতেছি—কাছে নয় এইটাই রক্ষা। বুনো ফুলের গন্ধে ভরিয়া আছে বাতাস। ওদিকে কুকীদের কী একটা উৎসব চলিতেছে যেন—বাজনার আওয়াজ কানে আসিতেছে।

পথ চলিয়াছি। কোথায় যাইব জানি না। হয় তো মণিপুর হইয়া বর্মা, তার পরে চীন। তার পরে? তার পরে কোথায় গিয়া থামিব কে জানে? যদি চর ইসমাইলে কখনো ফিরিতে পারি, তাহা হইলে রোমাঞ্চকর অনেকগুলি গল্প শুনাইয়া দিতে পারিব।

তোমার দিন আশা করি ভালোই কাটিতেছে। সেই মেয়েটির কী সংবাদ ইতি—

শ্রীহরিদাস

চিঠিটা পড়িয়া বলরামের মনটা কেমন উদাস আর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হরিদাস—বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি এই যাযাবর-লোকটা। ঘর নাই, আত্মীয় স্বজন নাই—পৃথিবীকে একমাত্র চিনিয়াছে, আর পথকে। যে পথ দিয়া যায় সে পথ দিয়া আর কখনো ফেরে না, কিন্তু এমনই দাগ রাখিয়া যায় যে কাহারো সাধ্য নাই তাহাকে ভুলতে পারে।

এই সময়—এই সময় যদি এখানে হরিদাস থাকিতেন! বলরামের মনে হইল, কেন কে জানে তাঁহার মনে হইল, এই সময় হরিদাস এখানে থাকিলে তাঁহার সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। বলরাম হরিদাসকে সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করিতেন।

—কবিরাজ আছো হে?

বলরামের চমক ভাঙিল। চাহিয়া দেখিলেন, এক মুখ শাদা দাড়ি লইয়া প্রসন্ন মূর্তি নুরুল গাজী সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

—আরে গাজী সাহেব যে! আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন—বলরাম সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন: আজ আমার কী সৌভাগ্য যে এখানে গাজী সাহেবের পায়ের ধুলো পড়ল।

গাজী সাহেব সহাস্যে বলিলেন, দেখা করতে এলাম।

ঘরে ঢুকিয়া তিনি ফরাসের উপর বসিতেই বলরাম ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, রাধানাথ, ওরে রাধানাথ! গাজী সাহেবকে তামাক দে।

তামাক আসিল। গাজী সাহেব ফরশীতে টান দিয়া বলিলেন, তোমাদের বুড়ো সাহেব তা হলে পাগল হয়ে গেল?

বলরাম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই তো দেখছি। তবে লোকটা নেহাৎ খারাপ ছিল না।

—না, না, বেশ লোক। গাজী সাহেব সমর্থন করিলেন, একটু রগচটা ছিল তাই যা। ওর নাত্‌নীটাকে বুঝি চুরি করে নিয়ে গেছে?

—সেই কথাই তো শুনেছি।

—হবে, যে পাজী ব্যাটারা। ওই জাতটাই বদ। যত ভালোই তুমি করো, ঘ্যাচাং ক'রে দা চালিয়ে দেবে গলায়। আমার এলাকায় যত মগ ছিল, সবগুলোকে আমি ভিটেমাটি ছাড়া করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

বলরাম কহিলেন, তাই উচিত।

গাজী সাহেব হঠাৎ গলাটা নামাইয়া আসিলেন। বলিলেন, আচ্ছা কবিরাজ, আমাকে একটা ওষুধ দিতে পারো?

—ওষুধ? কী ওষুধ?

গাজী সাহেব দ্বিধা করিলেন, কাশিলেন একটু। কহিলেন, এই যাতে—মানে—জীবন-শক্তিটা একটু—মানে বাকীটা তিনি চাপা স্বরে বলরামের কানে কানে কহিলেন।

বলরাম হাসিলেন।

বলিলেন, সে তো তৈরী করতে সময় লাগবে। নানারকম জিনিস দিয়ে পাক করতে হবে কিনা। তা তিন-চারদিন বাদে আপনি লোক পাঠাবেন, তারই হাতে দিয়ে দেব না হয়।

গাজী সাহেব প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, খরচ যা লাগে—

বাতাসে বলরামের অন্দরের দরজাটা হইতে পর্দা সরিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে গাজী সাহেব দেখিলেন মুক্তোকে। চোখের দৃষ্টিটা তাঁহার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

—আচ্ছা কবিরাজ, তোমার বাড়িতে মেয়েদের দেখলাম না? এতদিন তো একাই থাকতে, তা—

গাজী সাহেবের চোখ বলরামের ভালো লাগিল না—বিশেষত মেয়েদের সম্বন্ধে সুখ্যাতি তাঁহার নাই। বলরাম দ্বিধা করিয়া কহিলেন, ও আমার এক দূর-সম্পর্কের—তিন কুলে কেউ নেই, তাই—

—ও: তাই।

আর একবার অন্দরের দিকে চোরা চাহনি ফেলিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, আচ্ছা আসি তা হলে, আদাব।

—আচ্ছা।

গাজী সাহেব বাহির হইয়া গেলেন! ভারী জুতা আর গলার কড়ির মালার খট্‌খট্‌ শব্দ মিলাইয়া আসিল দূরে। আর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হরিদাসের পোস্টকার্ডখানা বাতাসে বলরামের পায়ের কাছে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল শুধু।

চৈতালী

১

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"থাকিয়া থাকিয়া মনে হয় প্রকৃতিটাই একমাত্র সত্য, আর মানুষ এর মাঝখানে প্রক্ষিপ্ত।

প্রক্ষিপ্ত নয় তো কী! তারায় ভরা আকাশ আর ছায়া-ভরা জল লইয়া এই যে পৃথিবী—এর মাঝখানে আমাদের দাবী কতটুকু! দয়া করিয়া যাহা দিতেছে, তাহাই লইতেছি—যাহা দিতেছে না, আপ্রাণ আকাঙ্খা করিলেও তাহা মিলিবে না। তবু যাহা দিবার তাহাই কি সহজে দেয়! ল্যাবরেটারীর অ্যাসিডের গন্ধ আর বুনসেন বার্নারে অশ্রান্ত সাধনা, কারখানার ডায়নামো আর লোহা-লক্কড় লইয়া তিলে তিলে জীবন পণ করিয়া চলা! তারপরে কৃপণ বর্ষণ। তবুও মনে হয় সব পাইয়াছি।

কী পাইয়াছি। মাথার উপরে নীহারিকা আর নক্ষত্রের জগৎ—রহস্যের তল নাই, কূল নাই, কিনারা নাই। ওদের পংক্তিতে পৃথিবীর আসন কোথায়। শুধু কি ওখানেই? তিন ভাগ জলের মাঝখানে এক ভাগ মাটি জাগিয়া আছে—আর সেই মাটিতে আছে পাহাড়ের শৃঙ্গ—সাহারার মরুভূমি, সাইবেরিয়ার তুষার-প্রান্তর, আর আফ্রিকার কালো অরণ্য। কে কাকে জয় করিয়াছে!

আর মানুষ? মানুষের কয়জনই বা প্রকৃতিকে ছাড়াইতে পারিয়াছে? এক হইয়া আছে তাহারা, জড়াইয়া আছে পরস্পরকে, অবলীন হইয়া আছে পরস্পরের মধ্যে। আর সেইখানেই তো সত্যিকারের জীবনের রূপ। জীবনকে যদি প্রকৃতির দান বলা যায় তবে প্রকৃতি হইতে জীবনকে তো বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তাহার নিয়মের সঙ্গে সঙ্গেই সে যে ঘুরিয়া চলিবে। তাই এই চর ইস্মাইলে, এই কালুপাড়ায় —তেঁতুলিয়ার মোহানায় এই সবটা জুড়িয়া মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে।

মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে। মানুষ পৃথিবীর বুদ্বুদ। তবু পৃথিবী লইয়া মানুষ আর মানুষ লইয়া পৃথিবী।

অথচ মানুষ প্রক্ষিপ্ত। শরীর-ধর্মের দিক হইতে নয়। যে মন তাহাকে দিক হইতে দিগন্তে, শূন্য হইতে শূন্যান্তরে নব নব অভিযানের পথে লইয়া চলিয়াছে, প্রক্ষেপ

তাহার সেই মনে। দেহের মধ্যে মন আসিয়া দ্বন্দ্ব শুরু করিয়াছে। তাই যাত্রা চলিতেছে রকেটের গতিতে আকাশটাকে বিদীর্ণ করিয়া—সৌর জগৎ, নক্ষত্র জগৎ, লাখো কোটি কোটি নীহারিকাকে ছাড়াইয়া।

প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই তো বিঘ্ন। মূলকে ভুলিতে চায়—কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া কি সহজ? ইচ্ছা আর দেহ প্রতি পদে পদে পরস্পরকে আঘাত করে—কল্পনা চলিয়া যায় সম্ভাবনার দিকদিগন্ত পার হইয়া, আর দেহ ছড়াইয়া পড়িতে চায় পৃথিবীর সনাতন মৃত্তিকায়।

*　　　*　　　*　　　*

তবু এই প্রক্ষিপ্ত মনোময় মানুষটা একসময় শরীর-ধর্মের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন ল্যাবরেটারী থাকে না, বয়লারের আগুনের রক্তশিখা তখন মিথ্যা হইয়া যায়। নীহারিকা আর নক্ষত্র-জগতের স্বপ্ন মিলাইয়া যায় ভাব-বিলাসের মতো। তখন আর মানুষ পৃথিবীকে ছাড়াইতে চায় না—পৃথিবীতে লীন হইয়া যায়, জড়াইয়া ধরে তাহাকে কালো অরণ্য, ঝড়ের তুফান, বিদ্যুতের বজ্রজিহ্বা আর অমার্জিত আদিমতায়।

…নিজের কথা ভাবিতেছি।

বর্মী মেয়েটিকে আর দেখিতে পাই নাই। প্রথম প্রথম তাহাকে ভয় করিয়াছিলাম, তাহার চোখের দিকে তাকাইতে সাহস হয় নাই। তারপর সেই ঝড়ের রাত্রি। সে এক অনুভূতি। মনে হইয়াছিল আমার মৃত্যু হইয়াছে—আমার আত্মার, আমার পৌরুষের! একটা বিশ্রী বিস্বাদ, একটা কটু তিক্ততা সমস্ত চেতনাকে রাখিয়াছিল আচ্ছন্ন করিয়া।

কিন্তু কদিন হইতে মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য, আমি সেই বর্মী মেয়েটিকে ভাবিতেছি। তাহার নীল সাপের মতো চোখ, তাহার সেই বাঘের মতো দৈহিক ক্ষুধার্ততা। আমার অলস ভাবনার মধ্যে সে আসিয়া তাহার :চিহ্ন আঁকিয়া যায়।

আমার প্রক্ষিপ্ত মন—সভ্যতার আলোকে মার্জিত মন—তাহার কি মৃত্যু হইতেছে? চারিদিকের পৃথিবী প্রতিদিন তাহার জারক-রসে আমাকে লইতেছে জীর্ণ করিয়া? আমি কি অনুভব করিতেছি আমার আদিম সত্তা ধূসর ধরিত্রীতে আমাকে আহ্বান করিতেছে?

সব চাইতে বিস্ময়কর বস্তু এই, আমি কি বর্মী মেয়েকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছি?"

*　　　*　　　*　　　*

গঞ্জালেস্ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কথাটা বিশ্বাস করা দূরে থাক,

সে যে এখনো তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া গঞ্জালেসের চোখের সামনে খানিকটা হলদে রঙের ধোঁয়া যেন ঘুরপাক খাইতে লাগিল—আর সামনের জগৎটা গেল আচ্ছন্ন হইয়া। মাথা হইতে সমস্ত রক্ত গলিয়া আসিয়া যেন হৃৎপিণ্ডে জমা হইয়াছে, নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতেছে তার। দুই কানের মধ্যে একটানা একটা তীব্র ধ্বনি-তরঙ্গ—যেন এই দিবা-দ্বিপ্রহরেই প্রচণ্ড রবে ঝিঁঝিঁ ডাকিতে শুরু করিয়াছে।

তারপর আস্তে আস্তে চেতনা ফিরিয়া আসিল তাহার। ডি-সিলভার কথাগুলি মনের উপর ছুরির দাগের মতো কাটিয়া বসিয়াছিল—এইবার সেই ছুরির দাগ রক্তাক্ত হইয়া আসিল। গঞ্জালেস ধীরে এবং দৃঢ়পদে ডি-সুজার বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পা দিল।

ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইল বৃদ্ধ ডি-সুজা। বকের পাখার মতো শাদা ভ্রূ-জোড়াকে কপালে তুলিয়া তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইল গঞ্জালেসের মুখের দিকে। গঞ্জালেসের মনে হইল সে তাহার দিকেই তাকাইয়া আছে সত্য, কিন্তু সে দৃষ্টি তাহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেছে বহুদূরে—যেন দূরবীণের কাচের মধ্যে দিয়া সে আকাশের কোনো একটা গ্রহ বা নক্ষত্রকে বৈজ্ঞানিকের মতো পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

তারপর বলিল, কে?

তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া গঞ্জালেস্ও পিছাইয়া আসিল, কিন্তু গাজী সাহেবের মতো চলিয়া গেল না। জবাব দিল, আমি।

—তুমি? তুমি জোহান? শার্টের আস্তিন গুটাইয়া ডি-সুজা দু-এক পা আগাইতে লাগিল, কেন এসেছো এখানে?

—আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্।

—গঞ্জালেস্! মিথ্যে কথা। ডি-সুজা চিৎকার করিয়া উঠিল। তারপর অকস্মাৎ একটা প্রবল অট্টহাসিতে সে ফাটিয়া পড়িল: তুমি ধরা পড়েছ জোহান, ধরা পড়েছ। আমি ঠিক চিনে ফেলেছি তোমাকে।

—সত্যি বলছি আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্।

—সত্যি বলছ। হাঃ হাঃ হাঃ—জোহানও সত্যি বলছে আজকাল। এমন হাসির কথা কেউ কখনো শুনেছে নাকি?

এমন হাসির কথা যে বাস্তবিকই কেহ কখনো শোনে নাই, ডি-সুজার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সেটা আর বুঝিতে বাকী রহিল না গঞ্জালেসের। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে অকারণে খানিকটা হা-হা করিয়া হাসিল, দন্তহীন মুখের হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধ থুথুর কণা ছিট্‌কাইয়া গঞ্জালেসের চোখে মুখে পড়িতে লাগিল। তারপর কী ভাবিয়া মুহূর্তে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল।

—আচ্ছা জোহান, তোমার মাথাটা ওরা কেটে ফেলেছিল—জোড়া লাগালে কী করে?

গঞ্জালেস্ কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না। ডি-সুজা আগাইয়া আসিয়া তাহার গলায় হাত বুলাইতে লাগিল—কেটে ফেললে কি মাথা আবার জোড়া লাগানো যায়?

গঞ্জালেসের মুখের সামনে শোকাচ্ছন্ন উন্মাদ ডি-সুজার টকটকে লাল চোখজোড়া জলিতে লাগিল, গরম নিশ্বাস আসিয়া আগুনের হল্‌কার মতো তাহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্যহারার মতো চলিতে লাগিল গঞ্জালেস্। পোস্টাপিস পার হইল, খাসমহাল কাছারী ছাড়াইল, তারপর গ্রামের হাট-খোলা পাশে রাখিয়া মুসলমানদের পাড়ার মধ্য দিয়া সে চরের পশ্চিম দিকে আগাইয়া চলিল।

সামনে বিল। বর্ষায় তেঁতুলিয়ার জল আসিয়া বিল আর নদীকে একত্র করিয়া দেয়, তারপর বর্ষার অবসানে ছোট বড় অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন জলখণ্ড লইয়া বিলের সৃষ্টি হয়। মাটির নিবিড় স্পর্শে নোনা জল মিঠা হইয়া উঠিয়াছে, শালুক ফোটা শেষ হইয়া গেলেও সমস্ত বিল জুড়িয়া হরিদ্রাভ শালুক পাতা আর গাঢ় সবুজ কল্মী শাক লক্ লক্ করিতেছে। ওদিকে দীর্ঘ হোগলা বন, সেই হোগলা বনে এক ধরনের ফল দেখা দিয়াছে। দুটি ছোট ছেলে একখানা সুপারির লম্বা ডোঙায় চড়িয়া হোগলার সেই ফলগুলি সংগ্রহ করিতেছিল। এদিকে একজন লোক একটা টেটা লইয়া ঝুঁকিয়া জলের উপর দাঁড়াইয়া আছে—মাছ পাইলেই বিঁধিয়া ফেলিবে।

গঞ্জালেস্ একটা ঢিবির উপর আসিয়া বসিল। শাদা শাদা মেঘে সারা আকাশটা ছাইয়া আছে, আর সেই আকাশ একটা গম্বুজের মতো বাঁকিয়া দূরে নদীর মধ্যে নামিয়া গেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে, আকাশটা আর কিছু নয়—ওই নদীটাই ওখান দিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, শাদা মেঘগুলি ঢেউয়ের মতো সূর্যের আলোয় জলিয়া উঠিতেছে। বহু দূরে জলের মধ্যে একদল বুনো হাঁস নির্ভয় ও স্বচ্ছন্দ মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; বড় বড় পা ফেলিয়া ঝুঁটিওয়ালা বক বিচরণ করিতেছে দলপতির মতো। আর বকেরই বৃহত্তর সংস্করণ তিন-চারিটি বিরাটকায় কঙ্ক বা 'কাঁক' পাখি ফণা-ধরা সাপের মতো এই পক্ষী-তন্ত্রকে পাহারা দিতেছে। সুযোগ পাইলেই ছোঁ মারিয়া বিলের জল হইতে সংগ্রহ করিতেছে পারিশ্রমিক।

গঞ্জালেস বসিয়া রহিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার মনের মধ্যে একটা নিশ্চিত আকার পাইয়াছে এতক্ষণে। লিসিকে ধরিয়া লইয়া গেছে বর্মীরা, ডি-সুজা উন্মাদ পাগল এবং জোহানকে কাহারা মুণ্ড কাটিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া গেছে। আর সেই

সঙ্গে গঞ্জালেসের সমস্ত আশা আর কল্পনা সাবানের বুদ্বুদ হইয়া অসীম শূন্যতায় ফাটিয়া পড়িয়াছে।

বুকের হৃৎপিণ্ডে যে রক্তধারা আসিয়া পাথরের মতো জমিয়া গিয়াছিল, সে রক্ত ক্রমে তরলতর ও দ্রুততর হইয়া আসিল। তারপর সে রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া আছড়াইতে পড়িতে লাগিল মস্তিষ্কের মধ্যে! পায়ের তলা হইতে একটা ঘাসের শীষ তুলিয়া সে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ একটা ঘুমন্ত হিংসা আসিয়া তাহার আঙ্‌লের ডগায় যেন আশ্রয় লইয়াছে।

ঝুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। তাহার চোখে পড়িল মৎস্যলোভী লোকটি টেটার বাঁকা ফলাগুলিতে প্রকাণ্ড একটা কুঁচে মাছকে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাছটা দুম্‌ড়াইতেছে, ছট্‌ফট্ করিতেছে।

গঞ্জালেসের আঙ্‌লে হিংসাটা যেন আরো প্রবল—আরো ভয়ংকর হইয়া উঠিতেছে। তাহার হাত দুইটা কিছু একটা করিতে চায়, যেন কোনো একটা বস্তুকে মোচড়াইয়া পিষিয়া ভাঙিয়া না ফেলিলে সে দুইটা আর তৃপ্তি পাইবে না। গঞ্জালেস্ নির্মমভাবে ঘাসের শীষ্ ছিঁড়িয়া চলিল। ঘাসের মধ্য হইতে একটা চিনে জোঁক মাথা তুলিতেছিল, গঞ্জালেস্ টানিয়া আনিল সেটাকে। তারপর দুই আঙ্‌লে ধরিয়া সেটাকে ছিড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সেটাকে সহজে ছেঁড়া গেল না—রবারের মতো সেটা বড় হইয়া চলিল, তাহার পিচ্ছিল শিরা-সর্বস্ব দেহটা আঙ্‌লের মধ্যে শির শির করিতে লাগিল। খানিকটা ক্লেদাক্ত নীলরসে গঞ্জালেসের আঙ্‌ল চট্‌চট্ করিতে লাগিল আঠার মতো।

নখের সাহায্যে গঞ্জালেস্ জোঁকটাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিল। এতক্ষণে তাহার মনে হইল সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের উত্তর পুরুষ সে—ডেভিড তাহার পিতা। শক্তির পূজা করিয়াছে তাহারা—বাহুবলকেই একমাত্র পরম সার ও চরম তত্ত্ব বলিয়া জানিয়াছে। নারীর জন্য কখনো তাহারা আরাধনা করে নাই, ক্লান্ত তপস্যায় প্রতীক্ষা করে নাই, ইনাইয়া বিনাইয়া প্রেমের প্রলাপ বলিতেও তাহারা অভ্যস্ত নয়। তাহাদের কাছে নারীর মূল্য একান্ত দেহগত—ছিনাইয়া আনিলেই যথেষ্ট। প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মতো দূরে ফেলিয়া দিতেও তাহারা কুণ্ঠা বোধ করে নাই কোনোদিন। ডেভিডের জীবনে কত নারী আসিয়াছে গিয়াছে—তাহার মতো লিসিকে হারাইয়া বুক চাপড়াইয়া কখনো কাঁদিতে হয় নাই তাহাকে।

কিন্তু গঞ্জালেস্! আজ হঠাৎ একটা তীব্র ধিক্কার আর অপমানবোধে বিষাক্ত হইয়া গেল তাহার মন। গঞ্জালেস্ নিজের অমর্যাদা করিয়াছে, বংশধারার অপমান করিয়াছে, চরম অসম্মান করিয়াছে দিগ্বিজয়ী হার্মাদ-বীর সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের।

কেন সে ছিনাইয়া লয় নাই লিসিকে, কেন সে বাহুবলে তাহাকে আয়ত্ত এবং অংকশায়িনী করে নাই? নিজের জাতিগত গৌরব এবং বিশেষত্বকে অবহেলা করিয়া সে দুর্বলের পথ ধরিয়াছিল, তাই তাহার এই পুরস্কার?

জুতা বাহিয়া আর একটা জোঁক উঠিতেছিল, গঞ্জালেস্ সেটার্কে চাপিয়া ধরিল। কোন্ ফাঁকে সেটা গঞ্জালেসের খানিকটা রক্ত খাইয়াছিল কে জানে, সেটাকে ধরিতে কয়েক বিন্দু ঘন রক্ত জুতার উপর ছড়াইয়া পড়িল। আঙুল দুইটা ভরিয়া গেল সেই রক্তে। কয়েক মুহূর্ত সে সেই রক্তের দিকে তাকাইল—মানুষের রক্ত, সব চাইতে উগ্র নেশা!

শুটকি মাছের ব্যবসা, চট্টগ্রামের সেই নিরিবিলি নিবাস। কর্ণফুলির কল্লোলে নারিকেল বীথির মর্মর মিশিতেছে। পেরিরা—মদের বোতল। অনুগৃহীতা সেই বাঙালি মেয়েটা।…মুহূর্তে মনে হইল সব কিছু ব্যর্থ আর অর্থহীন। তাহার সমস্ত চেতনাকে মুখরিত করিয়া সমুদ্রের গর্জন বাজিয়া উঠিল—যেমন করিয়া সাহাবাজপুরের নদীর মুখে ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্র সেদিন গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল সেই রকম। সেই সমুদ্রের ঘোড়ায় সোয়ার হইয়া যাহারা পৃথিবী জয় করিয়াছে, মনের সামনে তাহাদের ছায়ামূর্তিগুলি আসিয়া দেখা দিল। কালো চামড়ার টুপিতে তাহাদের মাথা আর মুখটা ঢাকা—তাহাদের তামাটে কপাল চোঁয়াইয়া শ্রম-ক্লান্ত ঘামের বিন্দু বড় বড় গোঁফ দাড়ির মধ্যে গড়াইয়া পড়িতেছে। শকুনের মতো চোখ মেলিয়া তাহারা নীল চক্রবালে চাহিয়া আছে—কোথাও শাদা পালের এতটুকু আমেজ পাওয়া যায় কিনা। তাহাদের হাতের মধ্যে বন্দুকের কঠিন নল ঘামে ভিজিতেছে, অবিশ্রান্ত লোহার সাহচর্যে তাহাদের হাতেও মর্চে পড়িয়া গেছে যেন। ওদিকে 'টারেটের' উপর তাহাদের পিতলের কামান গলা বাড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে—মাথার উপর খর্ খর্ করিয়া তাহাদের জাহাজের পাল উড়িতেছে—বাঘের জিভের মতো টক্‌টকে লাল, যেন ক্ষুধার্ত হইয়া সশব্দে লেহন করিতেছে বিরাট শ্বকনী।

গঞ্জালেস্ উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে তাহার মন। যেমন করিয়াই হোক, সে ইহার প্রতীকার করিবে, প্রতিষ্ঠা করিবে নিজের পৌরুষকে। যে ভুল তাহার একবার হইয়াছিল, সে ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হইতে দিবে না কোনোক্রমেই। আরাকান—আরাকান সে আর কতদূরে। কাজের তাড়ায় সে বহুবার আরাকান হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। আর দূর! দূর হইলেই বা ক্ষতি কী। তাহার পূর্বপুরুষেরা সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙাইয়া অবলীলাক্রমে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেছে। আর সে এই সামান্য পথটুকু ডিঙাইতে পারিবে না! পৃথিবীর যেখানে থাক, লিসিকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

প্যাক্ প্যাক্ করিয়া আর্তনাদ, খানিকটা ঝুটাপুটির শব্দ। গঞ্জালেস্ চাহিয়া দেখিল আকাশ হইতে শিক্রে বাজ ছোঁ মারিয়া একটা হাঁসের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, মৃত্যু-কাতর হাঁসের আর্ত রব বিলের শান্ত আকাশকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

অসংযত অস্থির হাত দুইটাকে কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া গঞ্জালেস্ ফিরিয়া চলিল।

২

জোহানের অপঘাত মৃত্যুর খবরটা তখন থানায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। চৌকীদারের মুখে সংবাদ পাইয়া বিরক্ত দারোগা ব্যাপারটা ডায়েরী করিয়া লইলেন। তারপর গোটা-কয়েক পান আর এক থাবা জরদা মুখে পুরিয়া ক্ষুব্ধ অসন্তোষে কহিলেন, ব্যাটারা আর চাকরী করতে দেবে না। খুন আর জখম, খুন আর জখম। দুটি দিন যে. ঘরে বসে বিশ্রাম করব তার জো-টি নেই। ইংরেজ রাজত্ব কি একেবারে বানচাল হয়ে গেল, না এরা নো-ম্যানস ল্যাণ্ড পেয়েছে? তুই কী বলিস্ রে ব্যাটা?

শেষোক্ত প্রশ্নটি করিলেন তিনি চৌকীদারকে। চৌকীদার কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না, দাড়ি চুলকাইয়া বোকার মতো হাসিল এবং শঙ্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে তাহার সজ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত কোনো অপরাধ বিদ্যমান আছে কিনা।

দারোগা আবার বলিলেন, জলপুলিশ কোথায়?

চৌকীদার কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা তো নেই ওদিকে।

—তা থাকবেন কেন! তাঁরা প্রাণের আনন্দে নৌকো-বিলাস করছেন—সুখের চাকরী তাঁদের। আর আমি সব্বো দিন নেই রাত নেই—টো টো কোম্পানীর ম্যানেজারী করে বেড়াচ্ছি। নৌকোয় ঘুরতে ঘুরতে সর্দি-কাশি প্রুফ্ হয়ে গেলাম, জল-কাদায় স্রেফ্ ওয়াটার প্রুফ্। আর ঘোড়া আর সাইকেল দাবড়ে হার্নিয়া হয়ে গেল। ছেড়েই দেব এই কচুপোড়ার চাকরী, দেশে গিয়ে জমিতে লাঙল ঠেললে এর চাইতে অনেক বেশি কাজ দেবে।

লাঙল ঠেলিলে অবশ্য ভালোই হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও চাকরীর মায়াটা দারোগা কাটাইতে পারিলেন না। মুখে যত গর্জনই করুন, ধরা-চূড়া পরিয়া বাহির হইয়া

পড়িতে হইল। খুনের মামলা, সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটিতে হইবে, এক মুহূর্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।

নৌকাতেও দেড় দিনের পথ। যাতায়াত তিনদিন। দুজন কন্‌স্টেবল লইয়া দারোগা যখন চর ইস্‌মাইলে আসিয়া দর্শন দিলেন, জোহানের কবন্ধ দেহটা পচিয়া তখন এমন উৎকট দুর্গন্ধ ছাড়িতেছে যে তাহার এক মাইলের মধ্যেও আগানো যায় না। অসংখ্য শাদা পোকা সর্বাঙ্গে কিলবিল করিতেছে, কালো রস গড়াইতেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। চৌকীদার পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিল বলিয়াই শেয়াল কুকুরে খাইতে পারে নাই। পচা চামড়ায় পোড়া তামার রং।

কিন্তু দারোগা এতটুকু দ্বিধা করিলেন না, একবারও নাসাকুঞ্চন করিলেন না। সেই দুর্গন্ধ বিকট বস্তুটাকে পা দিয়া বারকয়েক নাড়াচাড়া করিলেন, তারপর সেটাকে চালান দিবার হুকুম দিয়া রহমতুল্লা সরকারের বাড়ির দিকে যাত্রা করিলেন। রহমতুল্লা এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। কালে-ভদ্রে সরকারী মহিমান্বিত ব্যক্তিরা এ অঞ্চলে পদার্পণ করিলে তাঁহার আতিথ্যই লইয়া থাকেন। রহমতুল্লা নুরুল গাজীর চাচাতো ভাই—তবে একটু বেশি সরকার ঘেঁষা বলিয়া নুরুল গাজী তাঁহাকে এড়াইয়া চলেন।

জবানবন্দি দিতে ডাকা হইল ডি-সিল্‌ভাকে। ডি-সিল্‌ভা এলো-মেলোঃভাবে যাহা মনে আসে বলিয়া গেল এবং দারোগা তাঁহার ইচ্ছামতো যাহা খুশি তাহাই টুকিয়া লইলেন। রহমতুল্লার রান্নাঘর হইতে তখন হাঁড়ি কাবাবের চমৎকার গন্ধ আসিতেছিল এবং দারোগা ক্ষুধার্ত বোধ করিতেছিলেন। তা ছাড়া সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিতে হইবে, রাত্রি ঘনাইয়া আসিলে এদেশের নদীনালায় পুলিশের লোকেও নিজেদের নিশ্চিন্ত এবং নির্ভীক বলিয়া বোধ করে না।

শহরে লইয়া গিয়া সেই বিকৃত গলিত দেহটাকে ডাক্তারি পরীক্ষার পরে পুঁতিয়া ফেলা হইল। দারোগা থানায় বসিয়া পান আর জরদা চিবাইতে চিবাইতে লম্বা-চওড়া দেখিয়া একখানা রিপোর্ট উপরে দাখিল করিলেন, তাহাতেই মিটিয়া গেল ব্যাপারটা। চরের ক্রিমিন্যাল এলাকায় এ সমস্ত জিনিস তো হামেসাই ঘটিতেছে, ইহা লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করিতে গেলে বিশ্রাম লইবার জো থাকে না পুলিশের।

অতএব এই গল্প হইতে জোহানের দাবী মিটিয়া গেল। তাহার আশা তাহার কল্পনা, লিসিকে লইয়া ভিজাগাপত্তনে সেই ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন—জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সবই নিঃশেষে নির্বাপিত হইয়া গেল। তাহার এক দূর সম্পর্কের মাসী—যে তাহার ঘর আগলাইয়া থাকিত, কিছুদিন সে কাঁদা-কাটা করিল, তারপর একদিন নদী পার হইয়া চলিয়া গেল কোথায়। জোহানের ভাঙা-ভিটা ঘিরিয়া জঙ্গল গজাইতে লাগিল,

গর্ত খুড়িয়া সাপ আর ইঁদুর বাসা করিল—তারপর চর ইস্‌মাইলের মন হইতে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন ভাবে মুছিয়া গেল তাহার স্মৃতি। ভাঙন লাগিয়া মেঘনার মোহনায় ফলে শস্যে সমুজ্জ্বল উপনিবেশ তলাইয়া গেল, আবার নতুন করিয়া মাথা তুলিল নূতন উপনিবেশ—নব সূর্যালোকে, নবতম মানুষের পদপাতের রোমাঞ্চিত সম্ভাবনায়।

৩

ডি-সুজার হাবভাব দেখিয়া গাজী সাহেব শঙ্কিত হইয়া ছিলেন। যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে বিকৃত-মস্তিস্ক ডি-সুজা হয় তো পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া দিবে—কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িবে অবশেষে। আফিঙের ব্যবসার খবরটা একবার বাহির হইয়া গেলে কিছু আর করিবার থাকিবে না, দীর্ঘকাল শ্রীঘর বাস অনিবার্য। এ তো আর পুলিশের সাধারণ ব্যাপার নয় যে দারোগা ইন্‌সপেক্টারের পকেট ভারী করিয়া দিলেই চলিবে।

কিন্তু ডি-সুজা বাহিরে জিনিসটাকে একেবারেই যে প্রকাশ পাইতে দিল না, ইহাতে গাজী সাহেব অতিশয় আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেন। এমন কি, এ কথাও তাঁহার মনে হইল যে লোকটার জন্যে কিছু করিতে পারিলে মন্দ হইত না। বুড়ো সাহেবের কাছে নানা দিক হইতেই তিনি ঋণী।

এখানে গাজী সাহেবের কিছু বিস্তৃত পূর্ব পরিচয় দেওয়া চলিতে পারে।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে মুসলমান ক্ষাত্র-শক্তির প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়িল। দাক্ষিণাত্য-সমাগত সেন-বংশের রাষ্ট্রিক কাঠামোতে তখন ঘুণ ধরিয়াছে; হিন্দু-ধর্মের নবীন-অভ্যুত্থানের দোহাই দিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর চরম অত্যাচার চলিতেছে, লৌকিক সংস্কারের কঠিন-নাগপাশে জাতির শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় এবং কামতন্ত্রতার প্রশ্রয়ে রাজসভায় রসের স্রোত বহিতেছে। ক্ষত্রিয়ের চারণ-গাথা লোপ পাইয়াছে গীতগোবিন্দের ললিত-মধুর-কোমল-কান্ত 'পদাবলীতে' এবং পরকীয়া প্রেমে সুদক্ষ রাজার গৌরব-গাথা তাম্রশাসনে অবিনশ্বর কণ্ঠে কীর্তিত হইতেছে।

এমনি সময় মুসলমান শক্তির সংঘাতে গৌড়ের রাজ-সিংহাসন ধূলায় মিলাইয়া গেল। রাজা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। বাধ্যতামূলকভাবে একদল হিন্দুকে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে হইল, একদল বৌদ্ধ হিন্দুদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গেল। উত্তর ও মধ্য বঙ্গের বিচূর্ণ দেবালয়গুলির পাথর লইয়া মস্‌জিদ তৈয়ারী হইল, দীঘির শীতল কাদার মধ্যে পলাতক পাষাণ-দেবতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অজ্ঞান-তন্দ্রায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পূর্ববঙ্গ—আরো বিশেষ করিয়া সমুদ্রের একেবারে কোল ঘেঁষিয়া এই যে অঞ্চলগুলি, ইহারা তখন সদ্যোজাত ক্লেদাক্ত শিশুর মতো জল-কাদা আর জঙ্গল মাথা তুলিতেছিল। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা চলিতে পারে। বনে হিংস্র জন্তু, জলে কুমীরের বিচরণ, ঝোপে জঙ্গলে বিষাক্ত সাপের সমুদ্যত ফণা...... উত্তর ও মধ্যবঙ্গ হইতে পলাতক একদল হিন্দু জমিদার পূর্ব বাংলার এই সমস্ত দুর্গম স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন—প্রকৃতি পরম যত্নে দুর্গের মতো তাহার নানা প্রতিকূলতার প্রাকার তুলিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। কিছুদিন এইভাবেই কাটিল। তার পর দেখিতে দেখিতে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যরাজ্য বর্তমানের গণ্ডিতে আসিয়া পা দিল, জল কাদা শুকাইল, বন জঙ্গল সমুদ্রের দিকে সরিতে লাগিল, হিংস্র জন্তুরা পথ করিয়া দিল মানুষকে! উত্তরবঙ্গবিজয়ী মুসলমানের তরবারি পূর্ববঙ্গের আকাশেও বিদ্যুৎশিখায় ঝল্‌সিয়া উঠিল।

মুসলমান রাজারাই যে কেবলমাত্র তখন দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন তাহা নয়। একদল ধর্মোন্মত্ত ফকির এই ভারটি গ্রহণ করিলেন। বিধর্মীদের ইসলামের ছত্র-ছায়ায় আনিয়া তাহাদের কল্যাণ-সাধন, ইহাই ছিল ফকিরদের ব্রত। কিন্তু ফকিরেরা বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবদের মতো অহিংস ছিলেন না—তাঁহাদের কোরাণ আর তরবারি পাশাপাশি চলিত। বাহুবলে তাঁহারা অবিশ্বাসী কাফের জমিদারদের পরাভূত করিয়া ইস্‌লামের দীক্ষা দিতেন। পূর্ববঙ্গে তাঁহাদের কীর্তি-কলাপের সীমা-সংখ্যা নাই। নিম্ন বাংলার দুর্গমতম স্থলেও অভিযান করিয়া এই ফকিরেরা যেভাবে তাঁহাদের ব্রত পালন করিয়াছেন—একমাত্র আফ্রিকার অরণ্যবাসীদের মধ্যে খৃস্টানধর্ম প্রচারকারী মিশনারীদেরই সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। বাংলা দেশের মুসলমান সংখ্যাধিক্যের বিরাট কৃতিত্ব বহু পরিমাণে এই ফকিরেরাই দাবী করিতে পারেন।

এই অসিধারী ফকিরেরাই সে যুগে গাজী নামে পরিচিত ছিলেন। ইহারা কেহ কেহ নিজেদের অসীম শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতার বলে পীরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। নিম্ন বঙ্গে হিন্দু দেবতা ব্যাঘ্রাচার্য দক্ষিণ রায়ের সহিত সমানভাবেই মুসলমানের পীর কোনো এক বড় খাঁ গাজীকে পূজা করা হয়। প্রচলিত মঙ্গল কাব্য ও লৌকিক সাহিত্যে দক্ষিণ রায়, কালু রায়, বড় খাঁ গাজী এবং মহিলা বনবিবির কীর্তিকথা বর্ণিত হইয়াছে। সে-সব কাহিনীতে রূপকথার খাদ আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বিস্মৃত যুগের এক অপূর্ণ অথচ অপূর্ব সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাস।

হুরুল গাজী ইহাদেরই কাহারও বংশধর।

নুরুল গাজীর উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ যখন ধর্ম প্রচারার্থ এদেশে আসিলেন, তখন স্বরূপ রায় নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার এদেশে কোথাও রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রচুর সৈন্যসামন্ত ছিল, বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন, অস্ত্র-শস্ত্র-হাতী-ঘোড়া ছিল এবং সর্বোপরি স্বরূপ রায় দুর্দান্ত বীর ছিলেন। তাঁহার নামে নিম্নবঙ্গ তখন তটস্থ থাকিত।

নুরুল গাজীর পিতৃপুরুষ সিকন্দর গাজী প্রচুর সেনা লইয়া স্বরূপরায়ের রাজ্য আক্রমণ করিলেন; কিন্তু স্বরূপ রায়ের দুর্ধর্ষ বাহিনীর কাছে সিকন্দর গাজীর সৈন্য দাঁড়াইতে পারিল না, স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভাসিয়া গেল তাহারা। বার বার তিনবার। রক্তে নদী বহিল, শবদেহে পাহাড় জমিল, স্বরূপ রায় নিজে যুদ্ধে আহত হইলেন, তবুও তাঁহার শক্তিক্ষয় হইল না!

উপায়ান্তর না দেখিয়া গাজী তাঁহার অলৌকিক শক্তির আশ্রয় লইলেন। তিনি কী মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন কে জানে, আশে পাশের জঙ্গলে যেখানে যত বাঘ ছিল, তাঁহার মন্ত্রের আঘ্রাণে পিল্ পিল্ করিয়া সুবোধ বালকের মতো গাজীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের লইয়া তিনি এক অভিনব সৈন্যদল রচনা করিলেন এবং পুনরায় বীরদর্পে রায়ের রাজ্য আক্রমণ করা হইল।

স্বরূপ রায়ের সৈন্যেরা মানুষের যুদ্ধ করিতেই অভ্যস্ত, রণক্ষেত্রে বাঘের আবির্ভাব দেখিয়া তাহাদের আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হইয়া গেল। সুন্দরবনের ডোরা-কাটা হলুদবর্ণের সমস্ত কেঁদো বাঘ—ভাঁটার মতো চোখগুলি পাকাইয়া হুঙ্কার করিয়া অগ্রসর হইতেছে, এ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের আর যুদ্ধ করিবার মতো মনের জোর অবশিষ্ট রহিল না। অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। স্বরূপ রায়ের সেনাপতি বিক্রম পাল নাকি বর্মচর্ম লইয়া বাঘ মারিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু তিন-চারিটি কেঁদো বাঘ একসঙ্গে পড়িয়া মুহূর্তে ঢাল-তরোয়াল সমেত তাঁহাকে রসগোল্লার মতো ফলার করিয়া ফেলিল।

অতএব একরকম বিনাযুদ্ধেই সমাপ্ত হইল বিজয়-পর্বটা। স্বরূপ রায় সপরিবারে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সিকন্দর গাজী স্বরূপ রায়ের একটি সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া খুলনা জেলার নিম্নাঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধর্মান্তরিত বৌদ্ধের দল এবং গাজীদের তরবারি বাংলার শেষ হিন্দুশক্তিকেও লুপ্ত করিয়া দিল।

তাঁহারই উত্তর পুরুষ নুরুল গাজী কেমন করিয়া এখানে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন, সে ইতিহাস স্বতন্ত্র। নূতন জাগা চরের ইজারা লইয়া তাঁহার পিতামহ প্রথম এদেশে আসেন। সেই হইতে গাজী সাহেবেরা স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস এবং ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন।

দিগ্বীজয়ীর বংশধর বলিয়াই বোধ করি, গাজী সাহেবের সঙ্গে ডি-সুজার হৃদ্যতাটা এত জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সে বন্ধুত্বটা আরো প্রগাঢ় হইল, যখন দুইজনেই একটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের চরম অধ্যায়।

গাজী সাহেবের কাজ অবশ্য একটা নয়। চরে জমিদারীটা তাঁহার উপলক্ষ্য মাত্র। সুযোগ পাইলে লোক নামাইয়া তিনি এখনো নদীতে ডাকাতি করান। তা ছাড়া পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যটাও একেবারে বিসর্জন দেন নাই তিনি। উপরের দিক হইতে কেহ নারীঘটিত ব্যাপার করিয়া পলাইয়া আসিলে গাজী সাহেব তাহাকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তারপর রাতারাতি মেয়েটাকে ইস্‌লামে দীক্ষিত করেন—পুলিশ সন্ধান না পাইলে ভালোই, পাইলেও সেটাকে ফাঁসাইয়া দিতে তিনি জানেন।

দিনকয়েক বাদে গাজী সাহেব আবার চর ইস্‌মাইলে আসিলেন। ডি-সুজার এখনও কোনো পরিবর্তন নাই, তাহার মাথা তেমনি অসংলগ্ন হইয়া আছে। দূর হইতেই একটা সহানুভূতির নিশ্বাস ফেলিয়া আজও তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা তাঁহার করিতেই হইবে। সে ওষুধটা না হইলে কোনমতেই চলিতেছে না। বয়স ষাট হইয়া গেছে, তবু গাজী সাহেব আরো অনেক বেশি বাঁচিতে চান, সতেজ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া জীবনকে উপভোগ করিতে চান একান্তভাবে।

কবিরাজকে কিন্তু বাড়ীতে পাওয়া গেল না। রাধনাথ বাহিরের রোয়াকে একটা মাদুর পাতিয়া নির্জন দুপুরে নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। তাহার হাঁ-করা মুখের একপাশ দিয়া লাল গড়াইয়া ওয়াড়হীন তেলচিটচিটে কালো বালিশটার উপর পড়িতেছিল; আর তাহারি গন্ধে নিমন্ত্রিত একপাল মাছি ঢুকিয়া পড়িয়াছিল তাহার উন্মুক্ত মুখ-গহ্বরের মধ্যে—যেন অভিযাত্রীর কৌতূহল লইয়া রহস্যপুরীর তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছিল।

গাজী সাহেবের জুতা আর কড়ির মালার খট্‌খট্ শব্দে রাধানাথের তন্দ্রা ভাঙিল। কপাৎ করিয়া হাঁ-করা মুখটা সে বুজিয়া ফেলিল, আর সেই সঙ্গে আট-দশটা অনুসন্ধিৎসু মাছিকেও উদরসাৎ করিল সম্ভবত। একহাত দিয়া মুখের দুর্গন্ধ লালাটা মুছিয়া লইয়া সে তন্দ্রাজড়িত রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া চাহিল। তারপর সসম্ভ্রমে কহিল, গাজী সাহেব যে! আদাব আদাব।

গাজী সাহেব দাড়ি-গোঁফের ভিতর হইতে নীরবে একটু হাসিলেন। রাধানাথ জিজ্ঞাসার আগেই সংবাদটা জানাইয়া দিল, বাবু নেই তো বাড়ীতে।

—কোথায় গেছেন?

—ওপারে, রুগী দেখতে। সন্ধ্যার পরে ফিরবেন।

—আমি তা হলে চললুম—গাজী সাহেব যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন। বলরামের ভৃত্য, অতএব স্বাভাবিকভাবে মনিবের মতো কতকগুলি গুণও আয়ত্ত করিয়াছে রাধানাথ। আপ্যায়নের ত্রুটি সে-ও করিল না। বলিল, বসুন না, তামাক সেজে দিই—

—না বসব না। কবিরাজ এলে খবর দিয়ো আমি এসেছিলুম—গাজী সাহেব চলিয়া গেলেন।

রাধানাথ বড় করিয়া একটা হাই তুলিল, তারপর একটা বিড়ি ধরাইয়া আবার যথাস্থানে চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। দিব্যি মিঠা বাতাস আসিতেছে—দিবা-নিদ্রাটি ভারী জমিয়া উঠিয়াছিল। মাঝখান হইতে গাজী সাহেব আসিয়া কাঁচা ঘুমটুকুকে মাটি করিয়া দিয়া গেল।

মধ্যরাত্রির মতো নিস্তব্ধ প্রশান্ত দুপুর। উষ্ণমণ্ডলের সূর্য মাথার উপরে জ্বলিতেছে প্রবলভাবে—আকাশটা পুড়িয়া যেন খাক্ হইয়া যাইবে। নীল আকাশটা অদ্ভুতভাবে নীল—এই অতিরিক্ত নির্মলতাকেই অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হয় এখানে। এমন এক একটি দিনেই কালবৈশাখীর আবির্ভাব ঘটে।

তেঁতুলিয়ার জলকণা লইয়া স্নিগ্ধ হাওয়া আসিতেছিল। মাথার উপর সুপারির পাতাগুলি থস্ থস্ শব্দে কাঁপিতেছে, পাখীর ঠোকর লাগিয়া একটা পাকা সুপারি পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। আর সেই সময় হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিতেই গাজী সাহেব আর একবার মুক্তোকে দেখিলেন। আপনা হইতেই তাঁহার পা দুটি থামিয়া আসিল, দৃষ্টি আট্‌কাইয়া রহিল দুর্লভ-দর্শন একটি অপূর্ব নারীমূর্তির দিকে।

সুপারিবনের একপাশে একটা ডোবা। সম্মান করিয়া পুকুর বলা চলিতে পারে। অনেকটা জায়গা লইয়া বলরামের বাড়ী আর বাগান, কাজেই ডোবাটাকে মোটামুটি নিরিবিলি ও নিভৃত বলিয়া মনে করিলে দোষ হয় না। তাই মুক্তো ঘাটে বসিয়া কী যেন করিতেছিল।

দূর হইতে অতৃপ্ত চোখে গাজী সাহেব তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। আঁচল খসিয়া-পড়া অনাবৃত পিঠের উপর কালো চুলের রাশি ছড়াইয়া আছে, অসতর্ক বেশ-বাসে সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত। চকিতের মতো সেদিন তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, আজ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ভালো করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী।

কে এ? বলরামের স্ত্রী নয় নিশ্চয়ই—অন্য কোনো আত্মীয়া হইলে এই দূরদেশে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বসবাস করিতে কেন রাজী হইবে? তবে কি—

মুহূর্তে ব্যাপারটার সমাধান হইয়া গেল। বলরাম সাধু সাজিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে এতটা শুদ্ধ সংযত কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রত্যাশাতে যেন গাজী সাহেবের মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলরাম যখন পাইয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষেও খুব দুষ্প্রাপ্য হইবে না হয় তো। তা ছাড়া বলরাম অপেক্ষা তিনি সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তিও বটেন।

চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় চুম্বকের মতো কী একটা ব্যাপার আছে। মুক্তো এক সময় পিছন ফিরিয়া তাকাইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই জলন্ত দুটি ক্ষুধার্ত চক্ষুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইয়া গেল।

মুক্তো চমকিয়া উঠিল! চকিতে নিজেকে সংযত করিয়া লইল, তারপর প্রকাণ্ড একটা ঘোমটা টানিয়া দিল মাথার উপর। গাজী সাহেব একবার চারিদিকে তাকাইলেন—কোনোখানে জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ কিছুই নাই। বাতাসে কেবল সুপারির পাতা কাঁপিতেছে।

গাজী সাহেব হাসিলেন, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে দু-একবার কাশিলেনও। মুক্তো কী ভাবিল কে জানে, ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই তড়িৎবেগে তিরোহিত হইল। গাজী সাহেব দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

বলরামের ফিরিতে রাত হইয়া গেল। গীর্জার ঘাটে আসিয়া যখন তিনি নৌকা ভিড়াইলেন, তখন রাত বারোটার ওপরে গড়াইয়া গেছে। নৌকার মাঝি আলো ধরিয়া তাঁহাকে আগাইয়া দিল। এইখানেই কয়েকদিন আগে জোহান খুন হইয়াছেন, কবিরাজের গায়ের মধ্যে ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

বাহিরের ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল—রাধানাথ খুলিয়া রাখিয়াছে। একটা লণ্ঠন জলিতেছে মিট্ মিট্ করিয়া। দেওয়ালে চীনা মেয়ের ছবি বাতাসে দোল খাইতেছে।

শাদা জিনের কোটটা খুলিয়া এবং পায়ের লাল কেড্স জোড়াকে একপাশে রাখিয়া বলরাম নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বিছানাটা পরিপাটি করিয়া পাতা—মাথার কাছে একটা বড় ঘটি এবং একগ্লাস জল কেরোসিনের কাঠের একটা টেবিলের ওপর বসানো রহিয়াছে। মুক্তোর হাতের স্পর্শ। সাংসারিক ভাবে মুক্তোর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল করিবার কোনো কারণ নাই। রান্না-বান্না হইতে শুরু করিয়া তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োজনটুকুও সে যেন আগে হইতেই বুঝিয়া রাখে, কখনো এতটুকু অভিযোগ করিতে হয় না। কিন্তু তা সত্বেও আজ সে কতখানি দূরে সরিয়া গেছে। অত্যন্ত কাছে টানিতে গিয়াই কি বলরাম মুক্তোকে হারাইলেন?

নৌকায় আসিতে আসিতে অনেক কথাই তাঁহার চিন্তার মধ্য দিয়া আনাগোনা করিয়াছে। আজ বলরাম বুঝিয়াছেন মুক্তোকে না হইলে তাঁহার চলিবে না। শুধু শারীরিক ভাবেই নয়—তাহাকে বাদ দিয়া তাঁহার মনও আজ কোনোখানেই দাঁড়াইতে পারিতেছে না। দশ বছর আগে বিপত্নীক হইয়াছিলেন—তারপর এতদিন কাটিয়াছে শান্ত আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যে। সংযমী ধীরচিত্ত মানুষ বলরাম, তাই বহুকাল পরে সেই স্থির সংযমে আসিয়া যখন তরঙ্গের দোলা লাগিয়াছে, তখন সেটা কোন-মতেই সংযত হইবার নয়।

কিন্তু তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এই অনাহূত শিশু—এই অবাঞ্ছিত আগন্তুক। দুটি অদৃশ্য অথচ দুর্বার বাহু প্রসারিত করিয়া সে বাধা রচনা করিয়া বসিয়া আছে। মুক্তো তাহাকে চায়—বলরাম তাহাকে চান না। তাই বলরামের প্রতি সন্দেহে মুক্তো ব্যাঘ্রীর মতো সতর্ক হইয়া উঠিতেছে বুঝি।

বলরাম বিছানায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলেন না। সেদিনকার মতো সর্বাঙ্গে অসহ্য উত্তেজনা। চোখের পাতা দুইটা বুজিলেও অন্ধকার আসে না—যেন আগুনের কতকগুলি ফুল সামনে নাচিতে থাকে। সমস্ত বিছানাটায় যেন বালি কিচ্ কিচ্ করিতেছে। বলরাম উঠিয়া বসিলেন!

মুক্তো আজকাল দরজায় খিল দিয়াই ঘুমায়। তা হোক। বলরাম জানেন একটু চেষ্টা করিলেই ও-ঘরের দুটি কবাটের জোড় অনেকখানি ফাঁক হইয়া যায় আর সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া খিল খুলিয়া ফেলা চলে সহজেই। যা হওয়ার হোক—এই আত্মনিপীড়ন অসহ্য।

বাহিরে অন্ধকারে প্যাঁচা ডাকিতেছে—নিম্-নিম্ নিম্। প্যাঁচার ওই ডাকটার সম্বন্ধে এদিককার লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে—ওরা নাকি মৃত্যুর সংবাদ বহন করিয়া আনে। কাহাকেও লইয়া যাইবার মতলবে আসিয়াছে, নিম্-নিম্ করিয়া সেই কথাটারই জানান দিতেছে। চর ইসমাইলের চারদিক ঘিরিয়া তেঁতুলিয়ার অতন্দ্র কল্লোল জাগিয়া আছে—আর থাকিয়া থাকিয়া কুকুরের অর্থহীন চিৎকার।

একটা টর্চ লইয়া বলরাম বাহিরে আসিলেন। রাধানাথ নাক ডাকাইতেছে—কট্‌কটে ব্যাঙের ডাকের মতো বিশ্রী একঘেয়ে আওয়াজ। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, তাহারি আলোয় বলরামের নিজের ছায়াটা যেন প্রেতমূর্তির মতো অতিশয় দীর্ঘ হইয়া বারান্দার উপর ছড়াইয়া পড়িল। নিজের ছায়া দেখিয়া তাঁহার নিজেরই ভয় করিতেছে যেন। প্যাঁচাটা ক্রমাগত শাসাইয়া চলিয়াছে—নিম্-নিম্-নিম্।

বলরাম মুক্তোর ঘরের খিল খুলিয়া ফেলিলেন। মুক্তোর ঘুম আজকাল যেন

আগের চাইতে ঢের বেশি বাড়িয়া গেছে। সেদিনের মতো বলরাম আজো আসিয়া আবার তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইলেন।

...মুক্তো উঠিয়া বসিল, এক ধাক্কায় বলরামকে ঠেলিয়া তিন-চার হাত দূরে ফেলিয়া দিল। তারপর পশুর মতো একটা আর্তনাদ করিয়াই টলিতে টলিতে ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। যেন পলাইতে চায়—পলাইয়া রক্ষা করিতে চায় নিজেকে। সজোরে এবং সশব্দে কবাটটাকে খুলিয়া অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেল সে।

আর পরক্ষণেই পতনের শব্দ আর সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার ভাসিয়া আসিয়া যেন বলরামের কানের মধ্যে বিঁধিয়া গেল।

নিজের মূঢ়তাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলরাম তড়িৎ বেগে বাহিরে আসিলেন। বেশি দূর আসিতে হইল না—পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় দেখা গেল একেবারে দাওয়ার সম্মুখেই কী একটা শুভ্র বস্তু মাটিতে পড়িয়া আছে।

ববরাম টর্চ জ্বলিলেন। মাটিতে পড়িয়া আছে মুক্তো। সিঁড়ি দিয়া তাতাতাড়ি নামিতে গিয়া সামলাইতে পারে নাই—পা ফস্‌কাইয়া আছড়াইয়া পড়িয়াছে। টর্চের আলোয় বলরাম দেখিলেন বড় বড় ক্লান্ত নিশ্বাসে তাহার উবুড় হইয়া থুবড়াইয়া পড়া দেহটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, আর গল্ গল্ করিয়া নামিয়া আসা কাঁচা রক্তে যেন স্নান করিতেছে সে।

এত করিয়াও মুক্তো তাহার সন্তানকে রাখিতে পারিল না।

৪

কালুপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া মণিমোহন আশে পাশে কালেক্‌শন মোটামুটি শেষ করিল। পনেরো-বিশটা দিন কাটিয়া গেল অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেই। সরকারী লোক এবং তাহার কালেক্‌শন—ইহা ছাড়া জীবনের আর কোনো রূপ যে থাকিতে পারে, সে কথা ভাবিবারই যেন অবকাশ ছিল না কয়দিন। রাণী নয়, বর্মী মেয়ে নয়, ডায়েরী পর্যন্ত নয়।

কিন্তু এবার ফিরিতে হইবে। বহু টাকা সঙ্গে জমিয়া গিয়াছে, এগুলি কাছারীতে জমা করিয়া দেওয়া দরকার। ওখান হইতে টাকা লইয়া লোক শহরে চলিয়া যাইবে। এতগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া নদীতে ঘুরিয়া বেড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। অভাবে অভিযোগে দেশের লোক কুকুরের মতো হন্যে হইয়া আছে —সরকারী বাবুকেও রেয়াত করিতে রাজী হইবে না তাহারা।

এত ধান—প্রকৃতির এমন দাক্ষিণ্য—এমন অপরিমিত ঐশ্বর্য। তবুও দুর্ভিক্ষ চলে। ডাকাতি কেবল লোকে যে স্বভাবের দিক হইতে করে তা নয়, অভাবের প্রশ্নটাও সমান জটিল ও নির্মম। পটুয়াখালি এলাকায় কয়েকখানা ধানের নৌকা লুট হইয়াছে। তা ছাড়া উপনিবেশের এই দুর্জয় মানুষের দল। একবার যদি কোনোক্রমে জানিতে পারে যে, মণিমোহন এই রাশি রাশি কাঁচা টাকা লইয়া নিশীথ রাত্রিতে নির্জন নদীতে চলা ফেরা করে, তাহা হইলে মরিয়া হইয়া একটা চেষ্টা হয়তো করিয়া বসিবে।

মণিমোহন কহিল, এবার তাহলে ফেরা যাক গোপীনাথ।

গোপীনাথের স্বরে নৈরাশ্য প্রকাশ পাইল, এত তাড়াতাড়ি ফিরবেন বাবু?

—দেরী করে আর কী লাভ? তশীল এর বেশি আর হবে বলে মনে কর নাকি?

—আজ্ঞে না, তা নয়—গোপীনাথ কথাটা স্বীকার করিয়াই ফেলিল, এই খাওয়া-দাওয়াটা আর কি। একরকম মন্দ তো চলছে না—পাঁঠা, মুরগী, ডিম—বেশ পাওয়া যাচ্ছিল। আর কাছারিতে ফিরে গেলে সেই ভাগাভাগির কারবার, খেয়ে পেট ভরে না।

মণিমোহন হাসিয়া বলিল, খাওয়াটা তো আসল ব্যাপার নয়, চাকরী করতেই আসা।

—তা বটে। কিন্তু খাওয়াটা যুৎসই না হলে আর চাকরীর মায়ায় এখানে কী আশায় পড়ে থাকি? আপনিই বলুন না।

মণিমোহন সহানুভূতি বোধ করিয়া কহিল, সে তো সত্যি। কিন্তু এতগুলো টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো—রাতে এসে যদি নৌকায় চড়াও হয়, তখন? একটা বন্দুক দিয়ে কী ঠেকানো যাবে?

গোপীনাথ সক্ষোভে বলিল, তা বটে।

কিন্তু কালুপাড়া হইতে বিদায় লইবার পূর্বে আর একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

সকাল বেলা বোটে বসিয়া মণিমোহন চা খাইতেছিল। যে কোনো অবস্থাতেই হোক, এই চা-টি না হইলে তাহার কোনক্রমেই চলিবার জো নাই। মহিষের দুধ প্রচুর মেলে, যদিও চিনি পাইবার সম্ভাবনা নাই সব সময়ে। অভাবপক্ষে গুড়ের চা খাইবার অভ্যাসটা সে মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আজও সকালে গোপীনাথের তৈরী খেজুরের গুড়ের উগ্রগন্ধী চা গিলিতে গিলিতে সে দেখিল গ্রামের একটা বিরাট জনতা তাহার বোটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মজাঃফর মিঞার মেহেদী রাঙানো দাড়িটাই তাহাদের সকলের আগে চোখে পড়িল।

মণিমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী ব্যাপার?

সম্মিলিত জনতার মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছিল। মেহেদী রঙীন দাড়ি লইয়া মজাঃফর মিঞাই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহাদের বক্তব্য ঘোষণা করিল, আমরা বিচার চাই হুজুর।

—কিসের বিচার?

তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া কলরব চলিতে লাগিল। তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হুজুর ভালোয় ভালোয় একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলে তো ল্যাঠা চকিয়াই গেল, নতুবা যাহা করিবার তাহারা নিজেরাই করিবে। বহুকাল ধরিয়া তাহারা সহ্য করিয়াছে কিন্তু আর নয়।

—আঃ, ব্যাপারটা কী, তাই শুনি না।

আবার কলরব। তবে তাহার মধ্য দিয়াও বক্তব্যের মর্মটি উদ্ধার করা গেল। এই বর্মী মেয়ে। তাহাদের গ্রামে শান্তিপূর্ণ জীবনে সে ধূমকেতুর মতো আসিয়া দেখা দিয়াছে। গ্রামের জোয়ান ছোকরাগুলির মতিগতি বিগড়াইয়াছে। কাজ নাই, কর্ম নাই, তাহারা ওই মেয়েটার পিছনেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুধু কি তাই! তাহাদের নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি এমন কি লাঠালাঠি পর্যন্ত হইয়া গেছে। সমস্ত গ্রামের বুকের মধ্যে ওই মেয়েটার রূপ প্রখর একটা অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বলিতেছে। আর শুধু যে জ্বলিতেছে তা নয়—সকলকে জ্বালাইতেছে সমান ভাবে।

শুনিয়া মণিমোহন স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত আসিয়া লাগিয়াছে। বর্মী মেয়েকে অবশ্য খুব চরিত্রবতী বলিয়া মনে করিবার মতো কোন কারণ কখনও ঘটে নাই। সেই ঝড়ের সন্ধ্যা কোনোদিন তাহার স্মৃতি হইতে মিলাইয়া যাইবে না—সেই অরণ্যমর্মরিত ভয়াল পরিবেশের মধ্যে, কালো অন্ধকারে বর্মী মেয়ের সর্বাঙ্গ যেন মশালের মতো শিখায়িত হইয়া জ্বলিতেছিল। আগুনের কাজই দাহন—প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্তেই নূতন করিয়া ইন্ধনের দাবী জানাইবে সে। মণিমোহন সেখানে একচ্ছত্র এবং অনন্য হইয়া থাকিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল কেন?

তবুও তাহার মন মৃদু একটা বেদনার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বর্মী মেয়ের রক্তে উপনিবেশের বর্বর যৌবন জাগিয়াছে—সে যৌবন সর্বগ্রাসী; কিন্তু তাহার মার্জিত দীপ্তি, তাহার চরিত্রে একটা রুচিসঙ্গত পরিচ্ছন্নতা—সবগুলি ভাবিয়া কথাটাকে যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

নিজেকে আত্মস্থ করিয়া লইয়া সে প্রশ্ন করিল, আমি এর কী বিচার করব?

মুখপাত্র মজাঃফর মিঞা কহিল, ডেকে এনে সমঝে দিন না হুজুর। নইলে আমরাই ওকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেব। ওই কস্‌বীটার জন্যে ছেলেগুলো সব জাহান্নামে গেল।

—তোমরা ওকে ডেকে নিয়ে এলে না কেন?

—ডেকেছিলাম হুজুর, এল না। ভারী মেজাজ। বলে কি জানেন? কোনো সরকারী বাবুকে আমি পরোয়া করি না। গরজ থাকে নিজেই যেন আসে।

কী হইল কে জানে, মণিমোহনের সরকারী পদমর্যাদাটা অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রখর ও প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল। এক মুহূর্তে তাহার মন অসহ্য ক্রোধ এবং অপমানবোধে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে শুরু করিয়া দিল।

—বটে! আচ্ছা যাও তোমরা—আমি দেখছি।

—ব্যবস্থা একটা করুন হুজুর, নইলে গাঁয়ে বাস করা কঠিন হবে আমাদের।

জনতা নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে বিদায় লইল।

তারা চলিয়া গেলে মণিমোহন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ওই মেয়েটা তাহাকে অপমান করিয়াছে, ঠকাইয়াছে তাহাকে। সেদিনকার সেই সন্ধ্যায় এত সহজেই তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, সেই গর্বেই অভিভূত হইয়া আছে তাহার মন। কিন্তু এ গর্ব ভাঙিতে হইবে।

ঘণ্টাখানেক পরে তুজন পেয়াদা সে পাঠাইয়া দিল। মেয়েটাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে।

পেয়াদারা ফিরিল দশ-পনেরো মিনিট পরেই। একরকম ঊর্ধ্বশ্বাসেই ছুটিতেছে তাহারা—তাহাদের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত। সমস্বরে কহিল, আসবে না হুজুর।

—আসবে না?

—না। শুধু কি তাই? মেয়েমানুষ নয় তো হুজুর, সাক্ষাৎ বাঘিনী। দা নিয়ে তাড়া করেছিল আমাদের, হাতের কাছে পেলে কেটে ফেল্‌ত।

বাঘিনী! তা বটে! একেবারে মিথ্যা নয়। প্রথম দিন যখন মা-ফুনের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল, সেই দিনটার কথা মনে পড়িল। সেদিনও সে এমনি আসামী হইয়াই আসিয়াছিল। থান ইটের ঘায়ে স্বামীর মাথাটা দিয়াছে ফাটাইয়া—আর যাহারা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, তাহাদের আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। তুটি ক্রুদ্ধ চোখ জ্বলিতেছে তীব্র ক্রোধ আর হিংসার আলোকে।

বাঘিনী—তা বাঘিনীকে সায়েস্তা করিতেও সে জানে। মণিমোহনের মনে হইল, তাহার সমস্ত পৌরুষ যেন একটা অসহ্য অপমানে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

কী মনে করিয়াছে এই মেয়েটা? পশ্চিমবঙ্গের ছেলে—কিন্তু তাই বলিয়া সে কি এখনো পিছাইয়া নাকি? উপনিবেশ প্রবেশ করিয়াছে তাহার রক্তে—উপনিবেশ সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার স্নায়ুতে। একান্ত ভাবে ইচ্ছা হইল, বন্দুকটা লইয়া সে নামিয়া পড়ে, একবার দেখিয়া আসে, বন্দুক অথবা দায়ের জোরটাই বেশি। বাঘের থাবার শক্তি যত প্রচণ্ডই হোক, তাহার নখ যতই ধারালো হোক, শিকারীর বন্দুক অথবা রাইফেলের মুখে চিরদিন তাহা গুঁড়াইয়া গেছে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বসিয়া রাণীকে চিঠি লিখিল সে। কেমন করিয়া এবং কেন যে কে জানে আজ রাণীকে চিঠি লিখিতে তাহার অত্যন্ত ভালো লাগিতেছিল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া সে রাতারাতি সুস্থ আর স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহনের ভাবিয়া হাসি পাইতে লাগিল, সত্যি সত্যিই বর্মী মেয়েটা তাহাকে পাকে পাকে অজগর সাপের মতো গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে যেন। তাহার নীল চোখ—তাহার চুনির মতো রঙীন ঠোঁটের বিভঙ্গ—তাহার দেহের প্রতিটি অণু পরমাণুতে যৌবনের অসংকোচ আত্ম-প্রকাশ—সবটা মিলিয়া তাহাকে যেন প্রত্যেক দিন জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল। আজ সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে—ফিরিয়া পাইয়াছে নিজেকে। উপনিবেশ তাহার গৃহ নয়—এখানকার শ্রীহীন আদিম নির্লজ্জতার মধ্যে কোনোদিন সে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিবে না। এই রাক্ষসী নদী, ঝড়ের মেঘে কালো হইয়া আসা বন্ধহীন আকাশ—এগুলি তাহার জীবনে সত্য নয়। প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখায় ছোট ঘরটি আলোকিত—মণিমোহনের ফোটোখানির উপর এক ছড়া মালা দুলিতেছে। জানালার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া আছে রাণী। বাহির হইতে আমের মুকুলের গন্ধ আসিতেছে। হরিসভায় কীর্তন চলিতেছে—বাতাসে খোল করতালের সঙ্গে সঙ্গে গানের শব্দ। সেই জীবন অনেকদিন পরে আবার হাতছানি দিয়া মণিমোহনকে ডাকিল। নদী—কিন্তু নদী বলিলে কি এই! এখন—এই ফাল্গুন চৈত্রে সে নদী হাঁটিয়া পার হয় লোকে। দুই তীরে তার ভাট ফুল মদির গন্ধ বিস্তার করে, আর প্রেমদাস বৈরাগী বাবাজীর যে সমাধিটা ঝাউ বনের অন্ধকারে লুকাইয়া আছে, একটা প্রদীপ নদীর বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে আলো ছড়াইতে থাকে।

এই বহুদূর বিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বসিয়া মণিমোহন আজ যেন নূতন করিয়া দেখিল তাহার গ্রামকে—নূতন করিয়া রাণীর কথা তাহার মনকে নাড়া দিতে লাগিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া সে চিঠি লিখিল। তারপর বাতি নিবাইয়া যখন সে ঘুমাইবার উপক্রম করিল, তখন নদী পর্যন্ত যেন রাত্রির তন্দ্রালু স্পর্শে নীরব হইয়া গেছে। দূরে

কোথাও গাঙ-শালিকের বাসায় কিছু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, সম্ভবত রাত্রির সুযোগ লইয়া ডাকাতের মতো সাপ আসিয়া হানা দিয়াছে তাহাদের গর্তে।

—বাবু, বাবু, সরকারী বাবু!

একটু তন্দ্রার আমেজ আসিয়াছিল, মুহূর্তে টুটিয়া গেল সেটা। ঘুমের ঘোরে ভুল শুনিল না তো? অথবা নিশির ডাক নয় তো? এ দেশে ভূত-প্রেত স্কন্ধকাটা কোনো কিছুতেই তো অবিশ্বাস করিবার নয়।

কিন্তু আবার স্পষ্ট ডাক আসিল—সরকারী বাবু!

বোটের মাঝিরা অসাড় হইয়া ঘুমাইতেছে। অস্বাভাবিক খাটে বলিয়াই অস্বাভাবিক ভাবে ঘুমায়। মড়া মনে করিয়া চিতায় তুলিয়া দিলেও তাহারা বোধ হয় জাগিবে না—ঘুমন্ত অবস্থাতেই স্বর্গলাভ করিবে। সুতরাং এ ডাকে তাহারা জাগিল না। মণিমোহনের অজানিতে মাঝিদের সহযোগিতায় খানিকটা তাড়ি যোগাড় করিয়া গিলিয়াছে গোপীনাথ—অবশ্য টের পাইয়াও মণিমোহন কিছু বলে নাই। নেশা না টুটিয়া যাওয়া পর্যন্ত গোপীনাথ পড়িয়া থাকিবে জগদ্দল পাথরের মতো অচল ও অনড় হইয়া।

সুতরাং মণিমোহন নিজেই বাহির হইয়া আসিল। ভুল হইবার কোনো কারণ নাই। জলের ধারে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। তারার আলোয় সে সাহসিকাকে চিনিতে কষ্ট হইল না।

অসীম বিস্ময়ে মণিমোহন কহিল, তুমি এখনে? এই সময়ে?

অন্ধকারে সে হাসিল কি না বোঝা গেল না। বলিল, হাঁ আমি; একটুখানি আশ্রয় দিতে হবে সরকারী বাবু।

—আশ্রয়! বিস্ময়ে আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না তাহার।

জোয়ারের জলে বোটটা অনেকখানি ভাসিয়া আসিয়াছে। পরনের ঘাঘ্‌রাটাকে হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া অভিসারিণী ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে জল ভাঙিয়া একেবারে বোটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, তুলে নাও আমাকে।

অবস্থাটা চিন্তা করিয়া মণিমোহন সংকুচিত হইয়া গেল—এই বোটে? এখন?

—ভয় পাচ্ছ?

—না, ভয় নয়—মণিমোহন আর বলিতে পারিল না।

—বড় বিপদে পড়েই এসেছিলুম। তা হলে আমি ফিরে যাই—

—বিপদ! দ্বিধা কাটিয়া গেল মুহূর্তে। একথা ভুলিলে চলিবে না এই এলাকায় আপাতত সে রাজ প্রতিনিধি, অনেক কিছু করিবার ক্ষমতাই রাখে।

—না, না, এসো তুমি। হাত বাড়াইয়া সে তাহার লঘু দেহটি স্বচ্ছন্দে বোটে

তুলিয়া লইল। তারপর বজরার মধ্যে আসিয়া দুজনে মুখোমুখি হইয়া বসিল—বসিল খানিকটা দূরত্ব রাখিয়াই। ঝড়ের রাত্রি আর আশ্রয়ের রাত্রি এক নয়। একটা সিগারেট ধরাইয়া মণিমোহন বলিল, কী বিপদ ?

ক্লিষ্ট জবাব আসিল, পরে বলব।

দেশলাইয়ের কাঠির ক্ষণিক আলোকে মণিমোহন দেখিল নীলার উপর যেন মুক্তার বিন্দু টলমল করিতেছে। এই মেয়ের চোখেও কি জল দেখা দিতে পারে! নীরব বিস্ময় এবং বেদনার অনুভূতিতে তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না, আর অনাহূতা দু হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল একটা ছায়ামূর্তির মতো।

*　　*　　*　　*

চর ইস্মাইলের কাজ ফুরাইয়াছে। এখানে পড়িয়া থাকিলে আর কী হইবে? ওদিকে ব্যবসার যারা দু-একজন অংশীদার আছে তারা যে এই সুযোগে দুহাতে লুটিয়া খাইতেছে তাহাও নিঃসন্দেহ।

কিন্তু লিসি। গঞ্জালেস অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া দেখিল লিসিকে না হইলে তাহার চলিবে না। পৃথিবীতে যাহাকে পাইবার কোনো সম্ভাবনাই নাই, একমাত্র তাহারই জন্য সমস্ত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করিতেছে গঞ্জালেসের। শরীরের দাবী মিটাইবার জন্য নারীর অভাব নাই, যতদিন অর্থ আছে ততদিন সে অভাব হইবেও না। তবু লিসিকেই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। মোহ বেশিক্ষণ থাকিবার কথা নয়, লিসির প্রতি তাহার যেটুকু চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, আজ বাদে কাল তাহার আন্দোলন অতি সহজেই যাইবে শান্ত এবং প্রশমিত হইয়া। কিন্তু আঘাত লাগিয়াছে তাহার পর্তুগীজ অহমিকায়। তাহার সম্মুখ হইতে তাহারই স্বজাতীয়া বাঞ্ছিতাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে কোথা হইতে একদল বর্বর রেঙ্গুনী আর আরাকানী আসিয়া!

গঞ্জালেসের প্রাক্-পুরুষেরা রচনা করিয়াছিল ইতিহাসকে আর আজ সেই ইতিহাসই নূতন করিয়া গঞ্জালেস্‌কে রচনা করিতেছে। পান্সী নৌকা নয়, যুদ্ধ জাহাজ। বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল সাতটা পালে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়াছে। নীল কেশর-ফোলানো সমুদ্রের ঘোড়ায় তাহারা আসোয়ার। সেদিন কোথায় ইংরাজ—কোথায় তাহার ম্যান্-অফ-ওয়ার! সপ্তগ্রামের বন্দরে চলিতেছে আকাশ-ছোঁয়া অগ্নিযজ্ঞ—সরস্বতীর কালো জলে সেই আগুনের ছায়া নাচিতেছে। মৃতদেহে ভাগীরথীর বুক পরিকীর্ণ।

গঞ্জালেস্ ডি-সুজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু ডি-সুজা তাহাকে চিনিল। শোকের এবং আকস্মিকতার ধাক্কাটা কিছু

পরিমাণে সামলাইয়া সে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছে বোধ করি। সমস্ত জীবন ধরিয়া একটা নির্মমতার ইতিহাস তাহাকে নির্মোকের মতো ঘিরিয়া আছে। শুধু নির্মোক নয়—চরিত্র এবং মনের উপর তাহা রচনা করিয়াছে লোহার মতো একটা দুর্ভেদ্য বর্ম। তাই এ আঘাতও সে সামলাইয়া লইল।

মাতালের মতো টলিতে টলিতে ডি-সুজা আগাইয়া আসিল সামনে। সম্বর্ধনা করিয়া বলিল, তুমি স্যামুয়েল !

—হাঁ, আমি স্যামুয়েল।

মমির হাতের মতো দুখানা কালো এবং শুকনা হাত বাড়াইয়া গঞ্জালেসের ডান হাতখানি টানিয়া লইল ডি-সুজা। তারপর যেন ঘুমন্ত দুটি চোখ মেলিয়া স্বগতোক্তি করিল, ডেভিডের ছেলে তুমি। মানুষ খুন করাই ছিল ডেভিডের আনন্দ। তোমাকে এর শোধ নিতে হবে।

—হাঁ, এর শোধ নেব।—লোহার মতো দুটি কঠিন হাতে ডি-সুজার শিরা-বাহির করা জীর্ণ হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল গঞ্জালেস্—এর শোধ আমি নেবই।

ডি-সুজার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

—খুঁজে বার করতে হবে ওদের।

—হাঁ, খুঁজে বার করবই। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান কদিনের পথ! তারপর বর্মা। তারপরে চীন। তারপরে পৃথিবী।

—ডি-সুজা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, সমস্ত পৃথিবী ?

—সমস্ত পৃথিবী।

কতটুকু এই পৃথিবী! সমুদ্র যাহাদের পায়ের তলায়, মৃত্যুকে যাহারা লইয়াছে মুঠোর মধ্যে আয়ত্ত করিয়া—ঝড়ের গতির তালে যাহাদের জাহাজ রাতারাতি মহাসাগর পার হইয়া যায়, তাহাদের কাছে পৃথিবী কয়দিনের পথ! কর্ণফুলীর তীরে নারিকেল-বীথির যে নীড়, তাহা তো পথের পাশে ক্ষণিকের ছায়া-শীতল আশ্রয় মাত্র। আকাশের আহ্বান আসিয়া সাড়া দিয়াছে—রক্তে রক্তে পাখা মেলিয়াছে যাযাবর পর্তুগীজের মন। কালো চামড়ার টুপি—বন্দুক—পায়ের তলায় শরণাগত পৃথিবীর ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

ডি-সুজা কহিল, কিন্তু লিসি ?

—তাকেও পাওয়া যাবে।

—পাওয়া যাবে ?

আবার অকারণ খানিকটা নির্বোধের হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ডি-সুজার মুখ।

পরের দিন সকালে ডি-সিল্‌ভার মনে হইল ডি-সুজার একটা সন্ধান লওয়া তার কর্তব্য। হাজার হোক প্রতিবেশী, দুঃসময়ে তাহার খোঁজ খবর না করাটা অত্যন্ত অমানুষিক ব্যাপার হইবে। যদিও লিসিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবটা লইয়া ডি-সুজা তাহাকে যা নয় তাই অপমান করিয়াছিল—কিন্তু এখন সেটা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত। তা ছাড়া জননী মেরী তাহার দর্পের শোধ তুলিয়াছেন—ডি-সুজা উচিত-মতো শিক্ষা পাইয়াছে। এখন আর পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

অনেকটা করুণার্দ্র বোধ করিয়া ডি-সিল্‌ভা দেখা করিতে আসিল ডি-সুজার সঙ্গে। পায়ের মচকানোটা এখনো সারে নাই, খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয় এখনো। ব্যাঙের মতো লাফাইতে লাফাইতে একটা লাঠি ভর করিয়া ডি-সিল্‌ভা আসিল। ডি-সুজাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।

কিন্তু কোথায় ডি-সুজা! বাড়িতে যে কখনো মানুষ বাস করিত, তাহারও তো চিহ্ন নাই কোনোখানে। শুধু কতকগুলি ভাঙা টুকরো টুকরো এলোমেলো জিনিস ছড়াইয়া আছে সমস্ত উঠানটাতে। মুরগীর খোঁয়াড়টা অবধি শূন্য—কতকগুলি পাখা আর আবর্জনাই সেখানে অবশিষ্ট! একটা ভাঙা ডিম খানিক নির্যাস লইয়া পড়িয়া আছে—দু তিনটা কাক তাহা ঠোকরাইয়া খাইতেছে। আর বাতাসে বেড়ার গায়ে ডি-সুজার একটা ছেঁড়া প্যান্টালুন নিশানের মতো দুলিয়া উঠিতেছে।

ধ্বক্ করিয়া ডি-সিল্‌ভার বুকটা একটা ধাক্কা খাইল। এ সমস্ত কী ব্যাপার?

লাঠি আর খোঁড়া পা একত্র করিয়া এক সঙ্গে আট দশটা কোলা ব্যাঙের মতো লম্বা লাফ লাগাইল ডি-সিল্‌ভা। আসিয়া দর্শন দিল একেবারে নদীর ধারে।

গঞ্জালেসের নৌকাটা যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে একটা নোঙরের মতো গর্ত এবং মোটা কাছির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নাই। নদীতে যতদূর তাকানো যায় শূন্য একটা শুভ্রতা কেবল ধূ ধূ করিতেছে। গঞ্জালেসের নৌকার আভাস কোনো-খানে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ডি-সিল্‌ভা হাঁ করিয়া দিগন্তের পানে তাকাইয়া রহিল।

ইহার পরে চর ইস্‌মাইলে ডি-সুজা আর কখনো ফিরিয়া আসে নাই। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিল—ডি-সিল্‌ভা এবং তাহার মতো আরো দু-চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আসিয়া রাতারাতি ডি-সুজার ভিটে খুঁড়িতে লাগিয়া গেল। অনেক টাকা করিয়াছিল তো লোকটা—ভুলেও কি তাহার দু-একটা ঘড়া মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখিয়া যায় নাই!

কিন্তু যাহা কিছু, পণ্ডশ্রম হইল মাত্র। মাঝে হইতে ডি-সুজার ভিটাগুলিতে

কয়েকটা বড় বড় কুয়ার সৃষ্টি হইল, তাহার বেশি কিছুই নয়। তারপর নিরাশ হইয়া অর্থলোভীর দল ডি-সুজার ঘরের টিন, বাঁশ দরজা, কবাট যাহা পাইল তাহা লইয়াই প্রস্থান করিল।

পাশাপাশি দুইটি ভিটা—জোহান আর ডি-সুজার। তাহাদের সমস্ত অপ্রীতি আর সন্দেহের মাঝখানে লিসি সেতু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন সে সেতু ভাঙিয়া গেল। তারপর কালো মৃত্যুর একটা আবরণ নামিল তাহাদের ঘিরিয়া—চর ইস্‌মাইলের পর্তুগীজ সংস্কৃতির উপর সময় ও শতাব্দীর নূতন হস্তাবলেপ।

৫

ওদিকে মণিমোহনের বোটের উপর রাত্রি শেষ হইয়া আসিল নক্ষত্র চক্রের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। কালো জলে ধূপছায়ার পাণ্ডুরতা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তেঁতুলিয়া কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে দূরে অরণ্য রেখার অর্থহীন জমাট রূপ এক একটা অবয়ব গ্রহণ করিতেছে ক্রমশ! নৈশ-পরিক্রমা শেষ করিয়া বাদুড়েরা ফিরিতেছে নিদ্রাতুর দেহ এবং মন লইয়া।

অর্থহীন চিন্তায় মণিমোহন এই দীর্ঘ সময়টা বসিয়া আছে অতন্দ্র চোখে। আর বর্মী মেয়ের মুখখানা তাহার হাতের মধ্যে লুকানো, ঘুমাইতেছে কিংবা জাগিয়া আছে বোঝা কঠিন। এত কাছে—অথচ এত দূরে! সেই ঝড়ের সন্ধ্যায় মনে হইয়াছিল সে বাঘিনী, সে বিষকন্যা। আর এখন মনে হইতেছে মাটির পুতুলের মতো ভঙ্গুর, স্পর্শমাত্রেই ভাঙিয়া লুটাইয়া পড়িবে মাটিতে। এমন অবসরে—এমন একটি সুন্দরী মেয়েকে কাছে পাওয়ার লোলুপতাটা করুণার বন্যায় কোথায় তলাইয়া গেছে।

তারপর মেয়েটি মাথা তুলিল। চুলগুলি চূড়া করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, তোমার অনেক ক্ষতি করলুম।

মণিমোহন অস্পষ্ট গলায় বলিল, ক্ষতি?

—ক্ষতি ছাড়া আর কী! লোকে তো সত্যি মিথ্যে জানবে না, নিন্দে রটাবে তোমার।

—রটাক গে।

—নিন্দে-কলঙ্কের ভয় করো না তুমি?

—করি বই কি। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি দাম আমি পেয়েছি।

বর্মী মেয়ে ক্ষীণভাবে হাসিল। কথাটা সে বুঝিয়াছে। এই সভ্যতাবর্জিত দেশের পটভূমিতে আজ আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার জীবন ও

শিক্ষাদীক্ষা ঠিক এই ধাঁচের নয়। বিশিষ্ট বর্মীর মেয়ে সে, মৌলমিনে তাহার বাবার কাঠের কারবার ছিল। মিশনারী স্কুলে সামান্য কিছু লেখাপড়া করিয়াছিল, সভ্যতার উপরকার স্তরটাকেও যে কিছু কিছু না দেখিয়াছিল তা নয়। কিন্তু আশৈশব অসংযত তাহার মন। ঘোড়ায় চড়িয়াছে, সমানভাবে মারামারি করিয়াছে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে। একদিন বাপ-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু ঝোঁকের মাথায় একটা ভ্যাগাবণ্ড্ যাযাবর লোককে সে বিবাহ করিয়া বসিল। তারপর—

তারপর নানা যোগাযোগে ঘুরিতে ঘুরিতে এই চর। অর্ধ সভ্য মানুষগুলির সঙ্গে মেলা-মেশার দৈনন্দিন ফলে সে সকলের সঙ্গে এক হইয়া গেছে, এদের নীচতা আর অসংযমকে লইয়াছে সমান আয়ত্ত করিয়া। কিন্তু রেঙ্গুন-মান্দালয়—পেগু-মৌলমিন। প্রকৃতি-ধর্মের অতিরিক্ত সে মন, সে মন তাহার জাগিয়া উঠিল মণিমোহনকে কেন্দ্র করিয়া।

মণিমোহন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। আবছায়া আলো পড়িতেছে বাহির হইতে। সে আলোয় তাহাকে চেনা যায় না—একটা আভাস পাওয়া যায় শুধু। করুণ আর শিথিল বসিবার ভঙ্গি। সমস্ত দেহটা ঘিরিয়া স্নিগ্ধ মধুরতা যেন অস্পষ্টভাবে সঞ্চারিত হইয়া আছে। নীলার উগ্র রশ্মিছটা নাই—যে আগুন প্রথম একটা অসহ্য জ্বালা লইয়া তাহার সামনে আসিয়া দেখা দিয়াছিল, সে আগুনই বা আজ কোথায়? একটা অর্থহীন বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন।

মা-ফুন কহিল, এবার আমি নেমে যাব।

—নেমে যাবে?

—হাঁ, মাঝিরা জেগে ওঠবার আগেই। হয় তো তা হলে ব্যাপারটা চাপা থাকতে পারে এখনো। আসাটাই অবশ্য অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু, না এসে আমার কোনো উপায় ছিল না যে।

মণিমোহন জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়াই রহিল।

—না এসে উপায় ছিল না। তোমার কাছে মিথ্যে দরবার করেছে ওরা সব। আমি ওদের ছেলেপুলের মাথা খাবার কোনো মতলব করি নি, ওরাই বরং—

—বটে!—মণিমোহন উঠিয়া বসিল—আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। এর একটা বিচার—

—কী লাভ? ওদের কোনো দোষ নেই। আমি একা—কেন ওরা সুযোগ নিতে চাইবে না? আজ রাতে ওরা সব দল বেঁধে আমার বাড়িতে হানা দেবার মতলব করেছিল, তাই তোমার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। কিন্তু এবার আমি চললুম সরকারী বাবু—এর পরে বেলা উঠে যাবে।

—না, না, দাঁড়াও।—মণিমোহন উত্তেজিত হইয়া উঠিল—বেলা উঠুক, কারো কথাতে আমি ভয় করি না। কিন্তু আজ বিকালে তো আমি চলে যাব, তারপর কোথায় আশ্রয় পাবে তুমি?

বর্মী মেয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিল, সে ভাবনা আমার।

মণিমোহন আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল মুহূর্তে। মা-ফুনের হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল সে। তোমাকে আমি নিয়ে যাব।

—কোথায়?

—যেখানে হয়। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

বর্মী মেয়ে শান্তকণ্ঠে বলিল, এসব কথার কোনো মানে নেই সরকারী বাবু। তোমার সমাজ আর জীবন আলাদা। কোনোখানে মিলবে না আমাদের। পথে যেতে যেতে যা পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ। কোথাও থেমে দাঁড়ালেই ঠকতে হয়।

আশ্চর্য পরিবেশ—আশ্চর্য জগৎ! ইহার মাঝখানে মণিমোহন এমনি একটি মেয়ের দেখা পাইবার কল্পনা কি স্বপ্নেও করিতে পারিত! অরণ্যের অন্ধকারে যেন অরণ্যলক্ষ্মী!

—এবার আমি চলি সরকারী বাবু। তুমি আমার বড় উপকার করেছ। তোমাকে আমি কখনো ভুলব না—মা ফুন্ উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু মণিমোহন তাহাকে ছাড়িল না।

বলিল, আজ থেকে তুমি আমার।

শিশুর নির্বোধ সারল্যে মানুষ যেমনভাবে হাসে, ঠিক তেমন করিয়াই সে হাসিল। বলিল, কিন্তু স্বামী?

—সে তো তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—আবার ফিরতেও তো পারে।

—না ফিরবে না। মণিমোহনের কণ্ঠস্বর দৃঢ় শুনাইল—তুমি বাজে কথা বলছ আমাকে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব কলকাতায়, সিভিল ম্যারেজের আইনে বিয়ে করব।

রাণী! পলকের জন্য মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল রাণীর ছায়াছবি। বিদায়ের আগে তাহার অশ্রুম্লান মুখখানি। দূর বিদেশে কতদূর যে যাইতে হইবে। তাহার কপালের সিন্দুর বিন্দুটি এবং হাতের শাখা যেন ঝল্মল্ করিয়া উঠিল একবার। তা ছাড়া এক স্ত্রী থাকিতে কি সিভিলম্যারেজ করা যায়? কিন্তু সে কথা পরে ভাবিলেও চলিবে।

এখানে বন্য-প্রকৃতির আদিম প্রেরণা। পাশে বসিয়া আছে বিদেশিনী বিচিত্র নারী—তাহার জলন্ত তীব্র রূপ লইয়া। পৃথিবী এখানে পরিপূর্ণ কোমলতার নির্যাস বহিয়া অনাবৃত লাবণ্যে দাঁড়াইয়া আছে—বর্বর উচ্ছৃঙ্খলতার নেশা আপনা হইতেই আচ্ছন্ন করে আসিয়া।

বর্মী মেয়ে মৃদু ভাবে কহিল, তোমার আত্মীর-স্বজন?

—কেউ বাধা দেবে না। তোমাকে আমি নিয়ে যাবই।

রাণী! কিন্তু রাণীর মুখখানা এবার সম্পূর্ণ করিয়া দেখা দিল না—ভাবনার পর্দার উপর ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিবার আগেই মিলাইয়া গেল ছায়ার মতো। মণি-মোহনের দৃঢ় ও লোভী মুষ্টির মধ্যে বর্মী মেয়ের কঠিনে কোমলে মিশানো হাতখানি ঘামে ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। হাতখানি ধীরে ছাড়াইয়া লইয়া বর্মী মেয়ে আরো দূরে সরিয়া বসিল।

বেলা বেশি হইবার আগেই মণিমোহন বোট ছাড়িয়া দিল।

মাঝিরা ভালোমন্দ কোনো কথা কহিল না—পরস্পরের দিকে একবার তাকাইল মাত্র। আর নেশা ছুটিয়া গেলেও গোপীনাথ চোখে মুখে খানিকটা জল দিয়া বসিয়া রহিল গুম্ হইয়া। এসব কী ব্যাপার? চাকুরী করিতে আসিয়াছে—সন্ন্যাসী সাধু হইয়া নাই থাকিলে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে উপসর্গ টাকেও কাঁধে করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, কোন্ দেশি বেহায়াপনা এসব? শিক্ষিত লোকগুলা কি একেবারেই নিরঙ্কুশ নাকি?

তা ছাড়া হিন্দুর ছেলে। শরীরে খানিকটা বিশুদ্ধ আর্যশোণিত বহিতেছে সেটা তো আর অস্বীকার করিবার জো নাই বাপু। একটা নাপ্পিখাওয়া থ্যাবড়া-মুখো মগের মেয়েকে কাঁধে তুলিয়া শোভাযাত্রা করা—এ যে মুসলমানের ভাত খাওয়ার চাইতেও বিপজ্জনক। মুরগী না হয় চলিতে পারে, এক-আধটা নষ্ট মেয়েকে বোষ্টমী রাখিলেও চলে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে এতটা—

কী একটা বইতে গোপীনাথ পড়িয়াছিল সত্যযুগ আসিল বলিয়া। আর এই সত্যযুগে আবির্ভূত হইতেছেন স্বয়ং কল্কি অবতার, যত ম্লেচ্ছ এবং ম্লেচ্ছভাবাপন্নদের তলোয়ার দিয়া কচুগাছের মতো তিনি কচাকচ্ শব্দে সাবাড় করিবেন। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা ঘুম ভাঙিয়া দেখিবে রাতারাতি তাহারা ষাট হাত লম্বা হইয়া গিয়াছে—সত্যযুগের মানুষ কিনা। আর পৃথিবীতে অসাধু, চোর, পাওনাদার কিংবা চৌকীদারী ট্যাক্স কিছুই নাই—একেবারে রামরাজ্য যাহাকে বলে।

উৎসাহিত হইয়া গোপীনাথ কথাগুলি শুনাইয়াছিল মণিমোহনকে। কিন্তু মণিমোহন বিশ্বাস করে নাই—গাঁজা বলিয়া এবং নানারকম কটুকাটব্য করিয়া

জিনিসটাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে। সেই হইতে গোপীনাথ মণিমোহনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরাপুরি নিরাশ হইয়া উঠিয়াছে। দু'দশটা অন্যায় কাজ কে না করে—পৃথিবীতে সবাই-ই আর এমন কিছু সাধুসন্ত জাতীয় জীব নয়, কিন্তু দু'চারটা মাস একটু শুদ্ধ-শান্ত থাকিয়া যদি কল্কি অবতারকে ফাঁকি দিয়া সত্যযুগের বাসিন্দা হইতে পারা যায় তো মন্দ কী। কিন্তু ও সম্বন্ধে মণিমোহনের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা বা চেষ্টা দেখা যাইতেছে না।

বোট চলিতে লাগিল। দিনের উজ্জ্বল আলো নামিয়া নদীর বুক হইতে অস্পষ্টতার শেষ আবরণ মিলাইয়া গেল। আবার সেই পুরাতন জল আকাশের জগৎ। মোহ নাই, আচ্ছন্নতা নাই—মৃত্যুর মতো নিঃসংকোচ ও নিরাবরণ। বোটের গায়ে জল বাজিবার শব্দ—মাঝে মাঝে কচুরিপানার পচাগন্ধ। বিরাট নদীর তলায় নূতন মাটির সূচনা—মাঝে মাঝে মধ্য নদীতেও লগি বাধিয়া যাইতেছে!

উত্তেজনা খানিকটা শিথিল হইয়া আসিতেছে মণিমোহনের। উপনিবেশের স্বপ্ন-কোমল রহস্য-উপন্যাসের মতো রাত্রি, আর খাসমহল কাছারীর তহশিলদারের হিসাবের কাগজ-পত্রে আচ্ছন্ন দিন এক নয়। তা ছাড়া দিনের আলো বড় বেশি প্রকট, বড় বেশি উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, কিছুই যেন প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার উপায় থাকে না। রাণীর ছায়ামূর্তি আবার আসিয়া উঁকি মারিতেছে।

বর্মী মেয়ে জড়োসড়ো হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সমস্ত ঘটনাটাই যেন মন্ত্রবলে ঘটিয়া চলিয়াছে। মণিমোহনকে তাহার ভালো লাগিয়াছে সত্য—কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে উপনিবেশের এই পটভূমিকা। এই বর্বরতার মাঝখানে সে সভ্য-জগতের আলো লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই সভ্য-জগতে? যেখানে মণিমোহন আর দশজনের মধ্যে একজন, যেখানে বহুর মধ্যে বৈশিষ্টহীন একটা বুদ্বুদ হইয়া মিলাইয়া যাইবে সে, সেখানে? নিজের বন্য মনকেই কি সে বিশ্বাস করে? রেঙ্গুন-মৌলমিন-পেগু হইতে নিজেকে সে একদিন ছিনাইয়া আনিয়াছিল —আজ আবার উপনিবেশকেও ছাড়াইয়া যাইতে চায়? নূতন জীবনেই কি বাঁধা পড়িবে সে? নদীর মতো সে বহিয়া আসিতেছে, পুরানো চর ভাঙিয়া নূতন চরকে সে রচনা করিতেছে প্রত্যহ—মণিমোহন কি অনড় হইয়া থাকিবে সেই স্রোতের মুখে? তাহার চাইতে—

সামান্য একটু হাসিয়া মা-ফুন্ বলিল, কেন মিথ্যে পাগলামি করছ সরকারীবাবু, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ঘর আছে, সংসার আছে তোমার। চরের জীবন চরেই শেষ হয়ে যাক, তার বাইরে তাকে টেনে নিতে চেয়ো না।

মণিমোহন বলিল, হুঁ।

অতি প্রত্যক্ষ দিনের আলো। প্রথম সূর্যের আলোয় নদীর মূর্তিটাকে শান্ত আর সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে! ভালো করিয়া তাকাইলে গাছ-পালার আভাসও সুদূর পরপার হইতে যেন হাতছানি দিয়া আহ্বান করে। সে আহ্বান এই রাক্ষসী নদীর মৃত্যু-সংকেত নয়—সে আহ্বান আসিতেছে সেখানকার বাণী লইয়া, যেখানে লাল-কাঁকরে প্ল্যাটফর্মের পাশে ছোট্ট একটি স্টেশন। কলিকাতার লোক্যাল আসিয়া মাত্র এক মিনিট দাঁড়ায়। কাঁচা মাটির পথের ধারে আমের বন ছায়া ফেলিয়াছে, আর—

বর্মী মেয়ে। রাত্রির একটি বিশেষ মুহূর্তে যে মহীয়সী, যাহার জন্য সে মুহূর্তে যত রকম অসাধ্য সব সাধন করিয়া ফেলা যাইতে পারে, দিনের বেলায় তাহার প্রয়োজন কতটুকু! লোলুপতার উপর নিশীথের রঙ লাগিয়া তাহাকে দেহের অতীত ভাবের জগতে লইয়া যায়, কিন্তু সূর্যের আলো উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় তাহার অনাবরণ রূপ।

বর্মী মেয়ে আবার কহিল, ফিরে যাবার সময় আছে এখনো। আমার জন্যে তুমি ভেবো না। আমরা মগের মেয়ে—নিজেদের ভার নিজেরাই নিতে জানি। তুমি আমার জন্যে কেন যেচে নিন্দের বোঝা মাথায় নিতে চাচ্ছ? মণিমোহন জোর করিয়াই হাসিল অনেকটা। বলিল, পাগল! নিয়ে চলেছি যখন, নিয়ে যাবই। নিন্দের বোঝা মাথায় বইতে ভয় করি না।

সত্যিই সে ভয় করে না। এই নদী, এই পৃথিবী, এই সব মানুষ। নিন্দা-প্রশংসা এখানে সমান অর্থহীন! কিন্তু সব কিছু তো এইখানেই শেষ হইবার নয়। পশ্চিম বঙ্গের ছেলে, পাকুড়-প্যাসেঞ্জার আর ধানক্ষেতের আওতায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, বি-এস্-সি পাশ করিয়াছে; মার্জিত আর পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বপ্ন তাহার সম্মুখে। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে তো আর সে স্থায়ী ঘর বাঁধিতে পারিবে না। তাই এখান হইতে যখন তাহাকে ফিরিতে হইবে তাহার নিজের পরিচিত গণ্ডিতে—কলিকাতার ট্রামে-বাসে, সিনেমার আলোয় আর প্রসাধনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখগুলির মধ্যে—তখন? তখন? তখনও কি সে ভয় করিবে না?

মণিমোহন ভাবিতে লাগিল।

দুদিন পরে মণিমোহনের বোট আসিল চর ইস্‌মাইলে। কিন্তু বর্মী মেয়ে সঙ্গে আসে নাই। পথেই রাত্রে কোথায় কোন অবসরে যে বোট হইতে নামিয়া গেছে মণিমোহন জানিতেও পারে নাই সেটা। রাত্রির অন্ধকারে আশ্রয় নিতে আসিয়াছিল, রাত্রির অন্ধকারেই ফিরিয়া গেছে আবার। জল, জঙ্গল, অন্ধকার আর অরণ্য-প্রকৃতির আদিম বর্বরতা নিঃশেষে নিজের মধ্যে তাহাকে লুপ্ত করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু সেটাই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। সব চাইতে বিস্ময়কর খবর এই যে মণিমোহন ফিরিয়া আর তাহাকে খুঁজিতে চায় নাই। এ মাসে তাহাকে দশহাজার টাকার কালেকৃশন দেখাইতে হইবে—বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তারপরে হয় তো ছুটি মিলিতে পারে। রাণীর সঙ্গে কতদিন যে দেখা হয় নাই। নদীতে অবশ্য রোলিঙের ভয় আছে কিন্তু সেজন্য দেশের ছেলে কি দেশে ফিরিবার চেষ্টা করিবে না?

প্রকৃতি আর মানুষ। প্রকৃতি মানুষকে জয় করিবার প্রত্যাশা লইয়া বসিয়া আছে—আশা করিতেছে, আবার সেই সৃষ্টির প্রথম দিনটির মতো তাহার সন্তানকে ফিরিয়া পাইবে নিজের বুকের ভিতর। কিন্তু, কালের বেলাভূমিতে পদচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া যে যুগ হইতে যুগান্তরের পারে চলিয়া গেছে—সে আর কোনোদিন তাহার শৈশবে ফিরিয়া আসিবে না।

বলরাম ভাবিয়াছিলেন, মুক্তো এ যাত্রা তাঁহাকে খুনের দায়েই ফেলিল বুঝি। কিন্তু পরম আশ্বাসের সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি দেখিলেন, মুক্তো মরিল না। কিছুদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

ব্যাপারটা বাহিরে কেউ জানিতে পারিল না, পারিবেই বা কে? বলরাম দিনকয়েক নিজের যথাসাধ্য কবিরাজী বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া মুক্তোকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় এই সামান্য কয়দিনের মধ্যেই তিনি যেন অর্ধেক আয়ুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছেন—এমন জানিলে কি আর—

মুক্তো ভালো হইয়া উঠিল, কিন্তু অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়া গেল তাহার ব্যবহারে। এতটুকু অভিযোগ সে জানাইল না বলরামের বিরুদ্ধে, যেন কিছুই হয় নাই, সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। অথবা জোর করিয়াই অতীতের ঘটনাটাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে সে। বলরাম অবশ্য এখনও তাহার কাছে আমল পাইতেছেন না, কিন্তু তাঁহাকে যে আজকাল সে অন্তত বাঘের মতো ভয় করিতেছে না, এইটুকু দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন তিনি।

সন্ধ্যার দিকে বলরাম ভাবিলেন, একবার খাসমহল কাছারী হইতে ঘুরিয়া আসা যাক। যোগেশবাবু লোকটির দাবা খেলিবার সখ প্রচণ্ড। প্রথম প্রথম এখানে আসিয়া তিনি বলরামের আস্তানায় তাস খেলিয়াছেন; দাবার সঙ্গী ছিল না। তবে সম্প্রতি বলরামকেও দাবায় খানিকটা দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন—মাঝে মাঝে খাসমহল কাছারীতে গিয়া তিনি আসর জমাইয়া তোলেন।

বলরাম বাহির হইবার উপক্রম করিতে মুক্তো প্রশ্ন করিল, কোথায় যাচ্ছ?

—যোগেশবাবুর ওখানে।

—ফিরবে কখন ?

—দেরী হবে !

বলরাম বাহির হইয়া গেলেন।

ফিরিলেন অনেক রাত করিয়া। দাবায় একবার জমিলে চট করিয়া উঠিয়া আসা কঠিন। তা ছাড়া খেলাটা এখনো শেষ হয় নাই। মাথার মধ্যে নৌকা, গজ আর মন্ত্রী সমানভাবে পরিক্রমণ করিতেছিল তাঁহার। কাল সকালেই আবার যাইতে হইবে। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নাই মনে। পথে আসিতে আসিতে হিসাব করিতে লাগিলেন, ঘোড়ার আগে গজের কিস্তিটা লাগাইলে—

বাহিরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। রাধানাথ চুপটি করিয়া বসিয়া। বলরামকে ঢুকিতে দেখিয়া সে হুড়্মুড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সর্বনাশ হয়েছে বাবু!

বলরাম সভয়ে কহিলেন, কী সর্বনাশ ?

—দিদিমণি চলে গেছে।

—চলে গেছে! চলে গেছে কি রে! বলরামের মাথায় যেন গোটা আকাশটাই ভাঙিয়া পড়িল সশব্দে :

কোথায় চলে গেছে ?

—গাজী সাহেব এসেছিল। তারই সঙ্গে।

শরীরে সমস্ত রক্ত উত্তেজনায় যেন শীতল হইয়া গেল বলরামের : ধরে নিয়ে গেছে! সশব্দে বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন তিনি—তোর চোখের সামনে থেকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গেল তাকে ? আর বসে বসে দেখলি তুই, বাধা দিতে পারলি নে ? লাঠির ঘায়ে দু-একটা মাথা নামিয়ে দিতে পারলি নে মাটিতে ? একটা খবরও দিলি নে আমাকে ?

থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল বলরামের সর্বাঙ্গ।

কিন্তু ঘৃণা আর হতাশা প্রকট হইয়া উঠিল রাধানাথের কণ্ঠস্বরে।

—বাধা দেব কি বাবু ? ইচ্ছে করেই তো চলে গেছে দিদিমণি। তোমাকে খবর দিতেও নিষেধ করলে। বললে, বাবুকে বলিস, আমি চলে গেলুম গাজী সাহেবের সঙ্গে। গলায় দড়ি! সকলের চোখের সাম্‌নে মুসলমানের সঙ্গে বেরিয়ে গেল—ছি—ছি—ছি—ছি!

বলরাম দারুমূর্তি বলরামের মতোই অনড় হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাধানাথ বলিয়া চলিল, ভয়ে তোমাকে বলি নি বাবু, দিদিমণি খুব খাতির জমিয়ে নিয়েছিল তোমার ওই গাজীর সঙ্গে। তুমি না থাকলেই গাজী যখন তখন যাতায়াত করত আর—

বলরামের মুখের দিকে তাকাইয়া কথার মাঝখানেই রাধানাথ থামিয়া গেল।

দেওয়ালের গায়ে অসম্বৃত-বসনা চীনা নারীমূর্তিটা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে অদ্ভুতভাবে। তাহার চোখে আচ্ছন্ন স্বপ্নাবেশ, তাহার মুখে লালসার মদির হাসি। কাচভাঙা ঘড়িটায় বড় কাঁটাটা কেমন করিয়া যেন বাঁকিয়া সামনের দিকে উদ্যত হইয়া আছে, আর পেণ্ডুলামের নিয়ন্ত্রিত আন্দোলনের তালে তালে হাতুড়ি ঠোকার মতো অস্বাভাবিক শব্দ হইতেছে—ঠক্—ঠক্—ঠকাঠক্—

* * * *

পৃথিবী বাড়িতেছে।

নদীর মুখে প্রতিদিন নামিয়া আসিতেছে বাংলার বুক-ধোয়া পলিমাটি, দিগন্ত-প্রসারিত নদীর নিভৃত গর্ভকোষে মৃত্তিকার ভ্রূণ-শিশু লালিত হইয়া চলিয়াছে। জন্ম লইবে নূতন আলোয়, নতুন আকাশের নীল-নির্মল স্নেহচ্ছায়ায়।

শিশু পৃথিবী। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো বর্বরতা লইয়া—সেদিনকার মত উচ্ছল অসংযম লইয়া। নিজের খেলনা সে নিজেই চূর্ণ করিয়া চলিবে কয়েকদিন। সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম—এগুলি এখনও তো তাহার দূর চক্রবালেই নিহিত।

কিন্তু চর পড়িতেছে নদীতে। গঙ্গার ব-দ্বীপের প্রাণ-প্রবাহিনী শিরা-উপশিরা-গুলিতে মৃত্যুর মন্থরতা। সামুদ্রিক বহুভুজের মতো, কালো কালো বাহু বাড়াইয়া দিতেছে নূতন সভ্যতা; কলে কারখানায় বন্দী বিদ্যুতের আর্তনাদ।

শাখায় পাতায় অন্ধকার করিয়া হিংসার গুহা এই যে সুন্দরবন, এ আর কতদিন দাঁড়াইবে কুঠারের মুখে! তেঁতুলিয়া কালাবদর কিংবা রামমঙ্গলের মুখের আর কি শরের জল তেমন পাহাড়ের মতো উঁচু হইয়া আসে? পর্তুগীজদের শেষ উপনিবেশ মিলাইয়া যায় নীলগর্ভে—সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালেসের রক্ত—ডি-সুজা, জোহান আর লিসি পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেছে। অবশিষ্ট আছে পেরিরা আর ডি-সিল্‌ভা, জমিতে লাঙল ঠেলে তাহারা, শুঁটকি মাছের ব্যবসা করে।

আরো দশবছর পরে যারা এখানে আসিবে, তারা দেখিবে কত বড় হইয়াছে চর ইসমাইল। সভ্য, শিক্ষিত মানুষ। নদী—শান্ত এবং অহিংস, এখানে ওখানে চর পড়িয়া গোটা চেহারাটাই তাহার বদলাইয়া গেছে। আর, এস, এন, কেম্পানির

নূতন লাইনে ষ্টিমার যাতায়াত করে, ফার্স্ট ক্লাশের ডেকে বসিয়া প্রেমালাপ জমায় আধুনিক তরুণ দম্পতী। শহর আর শিক্ষার প্রভাবে উপনিবেশ সমুজ্জ্বল। যদি সময় আসে তো সেদিনকার কাহিনী বলিব নূতন করিয়া।

কেবল আদিম পৃথিবীর সেই বর্বর দানবটার মৃত্যু হইয়াছে। আর কালের বালুবেলার পরপারে প্রতিদিন মিলাইয়া আসিতেছে বিদ্রোহী শিশুদের অস্পষ্ট পদচিহ্নগুলি।

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী

বন্ধুবরেষু

তৃতীয় পর্ব

সূর্য স্বপ্ন

এক

চর ইস্‌মাইল।

চারশো মাইল দূরে বসিয়া আজ স্বপ্ন দেখিতেছি। ছবির মতো মতো সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে একটা অপরিণত তটরেখা—নারিকেল আর সুপারীবনের ঠিক নীচেই যেখানে তেঁতুলিয়ার জল মাথা কুটিয়া মরিতেছে। যেখানে বোম্বেটে পর্তুগীজের শেষ চিহ্নও দিনের পর দিন অবলুপ্ত হইয়া আসিতেছে—জলের তলায় ছয় ফুট উঁচু মানুষগুলির শাদা কঙ্কালের পঞ্জরে জমিতেছে জলজ শৈবাল, মোটা মোটা হাড়ের রন্ধ্রগুলির মধ্যে কুচো চিংড়িরা নিরাপদ বাসা বাঁধিয়াছে। আর করোটির মাঝখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার আস্তানা—নীল রঙের দাঁড়াগুলি দিয়া যাহারা সন্ধানী বৈজ্ঞানিকের মতো দিগ্বিজয়ী জলদস্যুদের মস্তিষ্কে ছিদ্র করিতেছে। চর ইস্‌মাইলের বর্বর জীবনের উপর দিয়া যেমন করিয়া নামিয়াছে স্তিমিত আর নিরুত্তেজ সভ্যতা—আর যেমন করিয়া চারশো মাইল দূরের নাগরিক শান্তির নিরাপদ পরিবেষ্টনীতে বসিয়া আমি চর ইস্‌মাইলের গল্প লিখিতেছি। আমারি সিগারেটের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছে চক্রাকারে, নানা সম্ভব অসম্ভব মুখ সেই ধোঁয়ায় রেখায়িত হইয়া উঠিতেছে—ডি-সুজা, ডি-সিল্‌ভা, পোষ্টমাষ্টার—আরো কত কে?

একটা উপমা মনে পড়িতেছে। ছায়াছবির পর্দায় মৃত্যু-তরঙ্গিত রণক্ষেত্রের ছবি দেখিয়া যেন নিশ্চিন্তে রোমাঞ্চিত হইতেছি। কিন্তু ছায়াছবির আলোকে ছাড়া যাহারা বৃহত্তম জীবনের রূপ দেখিতে পায় না, স্বপ্ন ছাড়া তাহাদের আর সান্ত্বনা কোথায়।

*　　　*　　　*

চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়া কাটিয়া গেল দশটা বছর।

আদিম সমাজের গলিত লাক্ষাস্তূপের উপরে আরো ঘন হইয়া নামিতেছে সর্বগ্রাসী মৃত্তিকার আবরণ। জল আর মাটি—জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি যাহারা মূলহীন স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের শিকড় আরো নিবিড় হইয়া মাটির মধ্যে থিতাইয়া বসিয়াছে। পলি মাটি, মাখনের মতো কোমল আর স্নিগ্ধ

মাটি— নদীমাতৃক বাংলাদেশের সকরুণ ভালোবাসার মধু লইতেছে নির্যাস দিনের পর দিন বিদ্রোহীদের জীর্ণ করিয়া। রক্তের ফসল নয়—শস্যক্ষেত্রের সোনার ফসল। বোম্বেটে জাহাজের অভিযানস্বপ্ন নয়—আশু, আমন আর বোরো ধানের স্বপ্ন-কামনা। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মধ্যে অস্পষ্ট রূপ লইয়া যে মানুষগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বাংলাদেশের একটা পরিপূর্ণ রূপ আজ তাহাদের গ্রাস করিয়া লইতেছে।

দশ বৎসর।

কয়টাই বা পাতা ক্যালেণ্ডারের পাতায়! তবু এর মধ্যে অনেক নতুন তারার আলো আসিয়া পড়িয়াছে দূর আকাশের জ্যোতির্লোক হইতে, বহু সাইক্লোন বহিয়া গেছে পরমাণুর জগতে, আর চিড় খাইয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে বহু দিনের অনড় বনিয়াদ, সমাজ, রাষ্ট্র এবং জীবনের যাহা কিছু অসঙ্গতি—স্তরে স্তরে স্তূপাকারে সঞ্চিত হইয়া তাহারা গণিতেছে বিস্ফোরণের কোনো ভয়ঙ্কর লগ্ন। মাটির ফাটলে ফাটলে উঁকি মারিতেছে ধরিত্রীর গর্ভ-প্রবাহী ধাতব বহ্নির নীলিম দীপ্তি।

পৃথিবী জুড়িয়া জ্বলিতেছে যুদ্ধের আগুন। আর তাহারই ছোঁয়া লাগিয়া ক্ষুধার আগুন লেলিহ হইয়া শিখা মেলিয়াছে বাংলা দেশে।

দশ বৎসর বয়স বাড়িয়াছে বলরাম ভিষকরত্নের। টাকের আশে পাশে স্বল্পাবশিষ্ট চুলগুলিতে সাদা রঙ্ ধরিয়াছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়াছে—চোখের দৃষ্টি আসিতেছে কিছুটা ক্ষীণ হইয়া। গত বছর শহরে গিয়া বলরাম বাঁ চোখের ছানি কাটাইয়া আসিয়াছেন, চশমাও লইয়াছেন। তবু চোখ দিয়া মধ্যে মধ্যে জল পড়ে, আশংকা হয় দৃষ্টি হয় তো একদিন নিবিয়াই যাইবে চিরকালের মতো। ভাবিয়া বলরামের কান্না পায়। সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, সুদূর ফরিদপুরে আত্মীয় বান্ধব যাহা আছে, তাহারা দুঃসময়ে আসিয়া পাশে দাঁড়াইবে, আশ্রয় দিবে, এমন ভরসাও নাই বড়। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য বলরামের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি—কিছু সুযোগ পাইলেই দু হাতে লুটিয়া পুটিয়া লইবার সাধু-চেষ্টাতে ত্রুটি করিবে না এতটুকু। তাহাদের প্রতি বলরামের কোনো আশা বা বিশ্বাস নাই। কেমন করিয়া যে এই দূর বিদেশে এতগুলি বৎসর তাঁহার কাটিয়া গেল, কখনো কখনো ভারী বিস্ময় লাগে সে সব কথা ভাবিতে। আত্মীয়হীন, বান্ধবহীন। নিজের কবিরাজী, ধান-চাল-সুপারীর ব্যবসা—মহিষের বাথান, নোনা জলের পুকুর। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব দু চারজন কি একেবারেই মেলে নাই? মিলিয়াছিল বৈ কি। খাস মহলের যোগেশবাবু, সেই সরকারীবাবু মণিমোহন, আর সেই খেয়াল-ক্ষ্যাপা পোষ্ট মাষ্টারটা—

পোষ্ট মাষ্টার! মনের মধ্যে চমক লাগিল বলরামের। কী অদ্ভুত লোক—কী আশ্চর্যভাবেই যে বলরাম তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন! কালো কুশ্রী চেহারায়

মানুষটা, জিলজিলে বুকের চামড়ার নিচে হাড়গুলি যেন উজ্জ্বল হইয়া উঁকি মারে, হাতে গলায় একরাশি তাবিজ। হাঁপানির টান উঠিলে মুমূর্ষ কাত্‌লা মাছের মতো হাঁ করিয়া হাঁপাইত লোকটা। আর কত দেশ বিদেশই না ঘুরিয়াছে। অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলিত—শুনিয়া কখনো ভয়ে ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিত বুকের ভিতরটা। কত ঠাট্টাই যে করিত মুক্তোকে লইয়া!

সেই মুক্তো! আবার একটা চমক খাইলেন বলরাম। সমস্ত চেতনায় অন্তরাল হইতে উদ্গত হইয়া যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল একটা তীব্র গ্লানি আর বেদনার তরঙ্গ। হাঁ, একদিন বলরাম ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন—নিজের এলোমেলো, ছত্রিশভাবে ছড়াইয়া পড়া জীবনটাকে স্থির ও নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন এক মুক্তোকে কেন্দ্র করিয়াই। কিন্তু কি ফল হইয়াছিল তার? সেই ঝড়ের রাত্রি—সেই অবাঞ্ছিত সন্তান—দু জনের মাঝখানে ভাঙন ধরিল সেই প্রথম। তারপরের দিনগুলি ভালো করিয়া মনে পড়ে না, দুঃস্বপ্ন এবং অপমানের রাশি রাশি বিষাক্ত অন্ধকারে সেই সব দিনগুলি যেন ঘনীভূত আর ভারমন্থর হইয়া স্মৃতির উপরে চাপিয়া বসিয়া আছে।

বাঁধিবার আগেই ঘর ভাঙিল। কোথায় গিয়াছে মুক্তো? বলরাম জানেন না। নোনা জল নোনা মাটির দেশ, নদী প্রত্যেকদিন নতুন করিয়া পাড় ভাঙিতেছে, নতুন চড়া জাগাইয়া তুলিতেছে দিকে-দিগন্তে। সেই নদীর ভাঙন একদিন মুক্তোকেও ছিনাইয়া লইয়া গেছে, বলরামের বুকে ভাঙা গাড়ির মতোই রাখিয়া গেছে, খাঁ-খাঁ করা একটা শূন্যতা। নতুন চড়ার মতো কোথায় গিয়া যে নতুন ঘর বাঁধিয়াছে মুক্তো বলরাম তাহা জানেন না। জানিবার কৌতূহলও তাঁহার নেই, কেবল—

বলরাম জোর করিয়া ভুলিবার চেষ্টা করিলেন প্রসঙ্গটা। বুকের মধ্যে যে ক্ষত-চিহ্নটা জাগিয়া আছে। কী লাভ সেটাকে আঘাত করিয়া, নিষ্ঠুরভাবে. রক্তাক্ত করিয়া। অন্যমনস্ক হইবার একান্ত প্রয়াসে দেয়ালের দিকে তাকাইলেন বলরাম। সমস্ত ঘরটার চেহারাই বদলাইয়া গেছে বিস্ময়কর ভাবে। দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা প্রায় দু বৎসর যাবৎ স্তব্ধ হইয়া আছে—চলে না। কাচের উপর ধুলা জমিয়াছে, মাকড়সারা জাল বাঁধিয়াছে কায়েমী-স্বত্বের মতো। দেওয়ালের গায়ে গ্রুপ ফটোগ্রাফখানির একটি মানুষকেও আর চিনতে পারা যায় না। সেই রঙীন চীনা ছবিগুলি কবে ধূলার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেছে—শুধু গুপ্তপ্রেস কোম্পানীর একখানি দেওয়াল-পঞ্জী দুলিয়া দুলিয়া চর-ইস্‌মাইলের দিনগুলিকে গণিয়া চলিয়াছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলরাম গড়গড়ার নলটা টানিয়া লইলেন। রাধানাথ

ধরিয়া দিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ আগেই, বলরামের খেয়াল ছিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনা আপনি পুড়িতে পুড়িতে তামাকটা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। জোরে জোরে গোটা কয়েক ব্যর্থ টান দিয়া বলরাম নলটাকে বিরক্তভাবে দূরে সরাইয়া দিলেন। সময় পাইলে পৃথিবীর যা কিছু এক সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া শত্রুতা সাধে নাকি!

আবার রাধানাথ ঘরে ঢুকিল। দশ বছরেও তেমনি আছে লোকটা, উল্লেখ-যোগ্যভাবে এমন কিছুই বদলায় নাই। শুধু মাথার চুলগুলি এখানে ওখানে বিশৃঙ্খলভাবে এক একটি শাদা গুচ্ছে পাকিয়া উঠিয়াছে, যেমন কেউ একরাশ খড়ির গুঁড়া ছড়াইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টি তেমনি কৌতুক আর ধূর্ততায় উজ্জ্বল, শুধু চোখ দুইটার নিচে চামড়ায় দুই তিনটা করিয়া ভাঁজ পড়িয়াছে মাত্র।

রাধানাথ আসিয়া কহিল, বাবু?

—কী খবর?

—কালুপাড়ার মজঃফর মিঞা দেখা করতে এসেছে।

বলরাম নিজের মধ্যে, বর্তমানের মধ্যে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলেন। মনের সামনে হইতে যেন খানিকটা দুঃস্বপ্নের কুয়াশা আকস্মিক ভাবে মিলাইয়া গেল। বলরাম বলিলেন, ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

মজঃফর মিঞা একটা লাঠি-ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মণিমোহনের সেই মজঃফর, বেহেস্ত্ নিবাসী আস্রাফ্ মিঞার পুত্র। এখন সত্তরের সীমা ডিঙাইয়াছে। মেহেদী রাঙানো দাড়ির-বাহার আর নাই। অবিমিশ্র শুভ্রতা বুক পর্যন্ত নামিয়াছে। আর সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে না সে; চলিতে চলিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করে, হাত-পাগুলি কাঁপিতে থাকে শিশুর মতো অক্ষম অসহায়তায়। হাতের মধ্যে কম্পিত লাঠিটায় মেজেতে খট্ খট্ শব্দ হইতেছে, মুখটা নড়িতেছে অনবরত, মনে হয় গালের মধ্যে কী একটা পুরিয়া দিয়া সে প্রাণপণ চেষ্টায় সেটাকে চুষিয়া চলিয়াছে।

বলরাম বলিলেন, বোসো মিঞাসাহেব, বোসো।

লাঠির উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া, বাঁকা পিঠটাকে অতি কষ্টে সোজা করিয়া অষ্টাবক্র ভঙ্গিতে মজঃফর মিঞা আসন গ্রহণ করিল। বলিল, আদাব। কিন্তু দন্তহীন মুখের ভিতর হইতে শব্দটা স্পষ্ট ফুটিয়া বাহির হইল না—খানিকটা অর্থহীন ধ্বনির রূপ হইল শুধু। অভ্যস্ত কান বলিয়াই বলরাম মজঃফর মিঞার কথাগুলি বুঝিতে পারেন; সাধারণ লোকের কাছে সেগুলি আত্মপ্রকাশের খানিকটা জৈবিক কাকুতি ছাড়া আর কিছুই নয়—অনেকটা বোবার মর্মান্তিক বো-বো করার মতো!

বলরাম ভালো করিয়া একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন মজঃফর মিঞার!—প্রথমেই চোখে পড়িল অশোভন আকারের সুদীর্ঘ পায়ের পাতা দুইটার দিকে। বাদুড়ের ডানার মতো কালো কালো কুঞ্চিত চামড়া—ক্ষয় হইয়া আসা নোখগুলির আগায় আগায় লাল মাটি শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। গায়ের ময়লা জামাটা হইতে ঘামের একটা দুর্গন্ধ উঠিয়া আসিয়া ঘরটাকে ভরিয়া দিল।

বলরাম বলিলেন, ব্যাপার কী মিঞাসাহেব?

—ধানের দর তো খুব চড়েছে। এই বেলা সব বিক্রী করে দেব নাকি?

—কত চড়েছে?

—পনেরো।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলরাম চিন্তা করিলেন খানিকক্ষণ। এবারের ধানগুলি যেন লক্ষ্মীর হাতের ছোঁয়া বহিয়া আসিয়াছে। দর বাড়িতেছে—অবিশ্রান্ত আর অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়া চলিতেছে। গোলার মহাজনেরা প্রত্যেকদিন নতুন দর দিতেছে, চাহিদার আর বিরাম নাই। বাহিরের পৃথিবীতে কী যে ঘটিতেছে বলরাম তাহা ভালো করিয়া জানেন না, খবরের কাগজ মধ্যে মধ্যে কিসের যে বার্তা লইয়া আসে, তাহাও খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে না তাঁহার কাছে। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি গ্রাহক, তাহাতে আরও দশটা খবরের সঙ্গে বলরাম জানিতে পারিয়াছেন—পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। আর এবারে যুদ্ধটা কেবল সুদূর ইংলণ্ড আর জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই, তাহার তরঙ্গটা ভারতবর্ষের কূল-উপকূলেও আসিয়া ঘা মারিয়াছে। বার্মা নাকি বেদখল হইয়া গিয়াছে—কলিকাতায় বোমা পড়িতেছে। চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়াই আজকাল পাখির মতো ডানা মেলিয়া দিয়া সারে সারে বিমান উড়িয়া যায়—গুরু গর্জনে চর ইসমাইলের নারিকেল আর সুপারীর বন চমকাইয়া মর্মরিত হইয়া ওঠে। যুদ্ধ বাধিয়াছে বই কি। তেল পাওয়া যায় না, লবণ পাওয়া যায় না, কাপড়ের জোড়া দুই টাকা হইতে ছয় টাকায় উঠিয়াছে। চারিদিকে কিসের একটা সুনিশ্চিত সংকেত। দূরের নদী দিয়া সৈন্যবাহী ষ্টিমার চলিয়া যায়—ইহাও বলরামের চোখে পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে অত্যন্ত ভয় করে, যেন অনাগত বিপদের একটা মহাকায় কৃষ্ণচ্ছায়া সমস্ত চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে ধানের দর। অসম্ভবভাবে বাড়িতেছে—অশুভভাবে বাড়িতেছে। বলরামের অচেতন মন হইতে কী একটা যেন সাড়া দিয়া বলে, এ লক্ষণ ভালো নয়; এ যেন মরিবার আগে সান্নিপাতিক জ্বরের রোগীর হঠাৎ

ভালো হইয়া ওঠা—নিভিবার পূর্বে প্রদীপের একটা আকস্মিক অগ্নিময় অন্তিম উচ্ছ্বাস।

বলরামের চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া মজঃফর মিঞা প্রশ্ন করিল, কী করা যাবে বাবু?

অভিনিবেশ সহকারে আবার খানিকটা ধূমপান করিয়া লইলেন বলরাম। ভয়টাকে অতিক্রম করিয়া মনের মধ্যে লোভ আসিয়া উঁকি মারিতেছে। যাহা হইবার তাহা পরে হইবে, আপাতত সেজন্য আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছু লাভ নাই। আরো কিছুদিন দেখাই যাক না! ধান উঠিতে না উঠিতেই এই—গোটা বর্ষাকাল তো এখনো সম্মুখেই পড়িয়া আছে। ধৈর্য কিছুটা ধারণ করাই ভালো, ভবিষ্যতে অন্তত ঠকিতে হইবে না।

বলরাম বলিলেন, যাক না আর কদিন?

মজঃফর মিঞা যেন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইল—বলরামের কথাটা যেন তার ভালো লাগিল না। কম্পিত আঙ্‌লগুলিতে দাড়িটা আঁচড়াইয়া লইল একবার—নখের খড়ি-ওড়া দাগ টানিয়া টানিয়া চুলকাইয়া লইল বাদুড়ের ডানার মতো কালো কালো পা দুখানা। তারপর বলিল, কিন্তু কাজটা বোধ হয় ভালো হচ্ছে না বাবু। যাদের ক্ষেত-খামার আছে তাদের ভাবনা নেই, কিন্তু মুস্কিলে পড়েছে জন-মজুর আর ছোট ছোট আধিয়ারেরা। চালের দর অত বাড়লে ওরা খায় কি? তা ছাড়া শুনলাম জেলেরা নাকি এর মধ্যেই উপোস করতে শুরু করেছে। এমন চললে দেশে যে আকাল দেখা দেবে।

বলরাম উষ্ণ হইয়া কহিলেন, তার আমরা কী করব? আমরা তো দর বাড়াই নি। এখন অল্প দামে যদি গোলা খুলে সব ছেড়ে দিই, তা হলে শেষ নাগাদ নির্ঘাত পস্তাতে হবে এ তোমাকে বলে রাখলাম বড় মিঞা। তা ছাড়া অসুবিধে কি আমাদের নেই? তেল, নুন, চিনি কিছু পাওয়া যায় না—যা মেলে তার দাম পাঁচগুণ। কিছু বেশি পয়সা যদি না পাই, তা হলে কী খেয়ে বাঁচব, বলতে পারো?

—তা ঠিক।—কিছুক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল মজঃফর মিঞা। বলরামের প্রজা সে, তাঁহারই জোত-জমার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং কর্তার ইচ্ছার উপরে কথা কহিয়া লাভ নাই, সে ক্ষেত্রে তাহার নিজের স্বার্থও জড়াইয়া আছে। যা দিন আসিতেছে, কিছুই তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

আর এই তো, এতখানি বয়স হইল মজঃফর মিঞার। কিন্তু এবারের মতো এমন একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তি সে আর কোনোদিন অনুভব করে নাই। গতবার যে লড়াই লাগিয়াছিল—সেও খুব বেশিদিনের কথা নয়, তাহার বড় নাতির বয়স হইবে—তখনকার কথা তাহার ভালো করিয়াই মনে আছে। জিনিসপত্রের দাম

বাড়িয়াছিল, ধান-চালের দর বাড়িয়াছিল। কিন্তু এবারের মতো এমন একটা অশুভ সম্ভাবনা যেন আসিয়া দেখা দেয় নাই। এবারে কলিকাতায় বোমা পড়িয়াছে, মাথার উপর দিয়া বিমান উড়িয়া যায়, ধরণ-ধারণ সব কিছুই আলাদা। কাজেই আগে হইতে হুঁশিয়ার থাকা ভালো—যা পাওয়া যায় দুই হাতে কুড়াইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! কী হইবে জেলে আর জন-মজুরের জন্য দুর্ভাবনা করিয়া? যাহার কপালে যাহা আছে তাহা ঘটিবে—মাঝ হইতে নিজেরা ফাঁক পড়িলে কোনো লাভ নেই।

মজঃফর মিঞা জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে?

—তা হলে আর কি। যাক আরো কটা দিন।

তবুও মজঃফর মিঞা একটু ইতঃস্তত করিতে লাগিল: জমিরকে চেনেন বাবু, জমির?

—কে জমির? কাসেম খাঁর ব্যাটা?

—হাঁ, তার কথাই বলছি। বাঁদির বাচ্চা বড়ো গোলমাল শুরু করেছে।

—গোলমাল?—বলরাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন: কিসের গোলমাল?

—ভয় দেখাচ্ছে। বলছে এখন ধান চাল সব ছেড়ে না দিলে লুটপাট হয়ে যাবে। লোক ক্ষেপে উঠেছে—খেতে না পেলে—

তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা উঠিয়া বসিলেন বলরাম: লুটপাট হয়ে যাবে! গায়ের জোরের কথা আর কি! সে সব দিনকাল ছিল দশ বছর আগে, যখন চোত মাস পড়লে আর নৌকো আসত না এ তল্লাটে। এখন শহরে খবর দিলে দু ঘণ্টার মধ্যে ঠাণ্ডা মেরে যাবে সমস্ত। তুমি যাও বড় মিঞা, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, শেষ পর্যন্ত আমি তো আছিই।

—সেলাম।

লাঠিটায় ভর দিয়া ক্লিষ্ট ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল মজঃফর মিঞা। তারপর খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আরো কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দূরে চাহিয়া রহিলেন বলরাম। মজঃফর মিঞার কথা মুছিয়া গেল মন হইতে, মুছিয়া গেল চারিদিকে ঘনাইয়া আসা কী একটা অভিশাপের অনিবার্য সংকেত-বাণী। নারিকেল বীথি দুলিতেছে বাতাসে, সুপারীর সারি চামরের মত মাথা দুলাইতেছে, নিবিড় নীলিমার বুক জুড়িয়া অভিসার চলিয়াছে লক্ষ্যহীন মেঘে—শরতের শুভ্র হংস বলাকার মতো। নিচে নদীর ধূসর বিস্তারটা আবছায়া হইয়া চোখে পড়িতেছে। এই নদী, ঝোড়ো হাওয়ায় সিংহের মতো গর্জাইয়া ওঠা দুরন্ত নদী! শান্ত হইয়া গিয়াছে—মৃত্যুর মতো ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া নিশ্চুপ মারিয়া পড়িয়া আছে। বছর তিনেক আগে মস্ত বান ডাকিয়াছিল

একবার। দৌলত খাঁর বানের পরে এমন ভয়ংকর কাণ্ড আর দেখেন নাই বলরাম। এই চর ইস্মাইলেই কমসে কম দুশো মানুষ বেমালুম সাবাড় হইয়া গেল, জেলে-পাড়াটাকে মাটির বুক হইতে একেবারে মুছিয়া নিয়াছিল বলিলেই হয়।

সে কী দুঃস্বপ্ন!

মনে পড়িতেই বলরাম আতংকে চমকাইয়া উঠিলেন। কে ভাবিয়াছিল এমন হঠাৎ ওই রকম একটা মৃত্যুর তরঙ্গ আসিয়া সব কিছু ভাসাইয়া দিবে—নিশ্চিন্ত মানুষের উপর প্রলয়ের মূর্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে! মেঘলা ভোরে মানুষগুলি টোকা মাথায় পরিয়া যখন জাল লইয়া নামিল, অথবা এক মাইল নৌকা ভাসাইয়া রিড়ি টানিতে টানিতে দূরের চরে কাজ করিতে গেল, তখন কে জানিত তাহারা আর ফিরিবে না? সেদিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে অল্প অল্প। আর মেঘের ছায়ায় নদীর জল মেঘের রঙ মাখিয়াছে। দিনটা এমনি করিয়াই কাটিল! তারপর সন্ধ্যা যেই ঘনাইল অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়িতে লাগিল, বাতাস চঞ্চল হইয়া উঠিল, নদীর জল মাতলামি শুরু করিল। তারপরই পূর্ণ মূর্তি ধরিয়া ভাঙিয়া পড়িল সাইক্লোন। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—বাতাসের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া একটা প্রচণ্ড দমকা আসে, চাল উড়াইয়া দেয়, গাছ উপড়াইয়া ছুটিয়া যায় দিগন্তের দিকে। ভয়ার্ত মানুষ কল্পনা করিতে থাকে এইটাই শেষ দমকা, এইবার বুঝি বাতাস মন্দা হইয়া আসিবে। কিন্তু বৃথা আশা—বিলীয়মান গোঁ গোঁ শব্দটা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাওয়ার আগেই আবার দূরের নারিকেল বন হাহাকার করিয়া ওঠে, মানুষ চোখ বুজিয়া কান চাপিয়া বসিয়া থাকে—আর একটা। তারপরে আর একটা, আরো একটা বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কত মানুষ যে ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, তাহার হিসাব কে রাখে।

কিন্তু দেবতার অনুগ্রহ ওইখানেই থামিলে তবু কথা ছিল। রাত তখন কয়টা হইবে বলরামের খেয়াল নাই, হয়তো দুইটা হয়তো আরো বেশি। লোকে বলে: নদীর দিক হইতে অমানুষিক ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া আকাশটাতে যেন চিড় ফেলিয়া দিয়া গর্জন করিল বরিশাল 'গান'। দক্ষিণের দিগন্তটা একটা বিচিত্র অগ্নিলেখায় মুহূর্তে ঝলকাইয়া উঠিল। তারপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশটাতে হাজার হাজার ফেনার শুঁড় ছোঁয়াইয়া হাজার হাজার পাগলা হাতীর মতো ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে 'শরের' জল ছুটিয়া আসিল। কোথায় রহিল নদীর কূল, কোথায় বা রহিল গ্রাম, কালো আকাশের তলায় কালো জল যেন বিশ্ব-সংসারকে একেবারে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

উপরে ঝড়—ঘর ভাঙিতেছে, মড় মড় করিয়া গাছ নামিতেছে মাথার উপরে ; নীচে বন্যা—দশহাত প্রমাণ জলোচ্ছ্বাস মানুষকে ভাসাইবার জন্য কল্পনাতীত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। চর ইস্‌মাইল কিছুটা উঁচু—এদিকের ভদ্রপাড়া পর্যন্ত সে জলটা পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু নীচের দিকে বন্যা কোনোকিছুকে এতটুকুও ক্ষমা করিল না। দুদিন পরে যখন জল নামিল, তখন দেখা গেল হাজিয়া-যাওয়া ধান-ক্ষেতের রাশি রাশি কাদার মধ্যে ঢোলের মতো ফুলিয়া আছে মরা গোরু, মাথাভাঙা সুপারী গাছের আগায় বিকট-গন্ধ গলিত মানুষের দেহ আট্‌কাইয়া আছে। তারপর তিন মাস ধরিয়া চলিল রিলিফ, চলিল কত কী। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মধ্যে কতগুলা অমানুষিক দুঃস্বপ্নের দিন কাটাইয়া মানুষ আবার সুস্থ আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

বন্যা নাই, কিন্তু এ আবার কী! এ আবার কোন কালযুদ্ধ ঘনাইয়া আসিল! ঝড় নাই, দেবতাদের কোনো নিষ্ঠুর অকৃপা নাই এবারে। বরং অন্যান্য বছর যেমন হয় তেমনিই ক্ষেত ভরিয়া সোনার বরণ ধান ফলিয়াছে। তবু ভয় করে। মনে হয় কিছু একটা ঘটিবে—তেমনি দুর্যোগের মতো—তেমনি ভয়ংকর মৃত্যু-উৎসবের মতো। কিন্তু কী ঘটিবে ? বলরাম বুঝিতে পারেন না, কেবল থাকিয়া থাকিয়া সমস্ত চেতনাটা সন্ত্রাস্ত আর সংশয়-ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

না, না, ওসব কিছু নয়। কত আশা করিয়া কত স্বপ্ন দিয়া ঘর বাঁধিয়াছে মানুষ। চর ইস্‌মাইলের বর্বর জীবনের উপর নামিয়াছে মন্থর শান্তি—মধুর বিশ্রান্তি। দশ-পনেরো বছর আগে এরা মারামারি করিত, খুনোখুনি করিত—জমি লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবধি ছিল না। কিন্তু নদী মরিয়াছে, মানুষগুলিও বদলাইয়া গেছে আমূল। এখন দাঙ্গা করিবার আগে গ্রামের লোকে আদালতে মামলা করিতে ছোটে। আগে প্রতিপক্ষকে ল্যাজা দিয়া ফুঁড়িয়া ফেলিয়া লাস নদীর জলে ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হইত, এখন খুনোখুনির আগেই উকীলের পরামর্শ জোগাড় করিয়া আনে। তিন বছর আগে সেই যে ঝড় হইয়া নদী নিঝুম মারিয়াছে, তার পর হইতেই একটা যুতসই 'কাইতান' (কার্তিক মাসের তরঙ্গ-তাণ্ডব) আজ অবধি চোখে পড়িল না। এমন শান্তির রাজ্যে মানুষ সুখে থাকুক স্বস্তিতে থাকুক, আর দুর্বিপাকে কাজ নাই। বলরাম আবার তাকিয়ায় গা এলাইয়া দিলেন।

ডাকিলেন, রাধানাথ ?

বাঁহাত দিয়া মুখটা মুছিতে মুছিতে রাধানাথ অপ্রস্তুতভাবে আসিয়া দেখা দিল। রাঁধিতে রাঁধিতে ঝোলটা চাখিতেছিল সে—ডাক পড়াতে চটপট উটিয়া আসিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে গোঁফে কিছু ঝোল লাগিয়াছে। হাত দিয়া মুখ মুছিয়া

আবার হাতটাকে সে কাপড়ে মুছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলেন না কি, বাবু?

—হাঁ তামাক দে আর একটু। বেরুতে হবে—ওপাড়ার দিকে রোগী দেখবার তাগিদ। আর কী ম্যালেরিয়াই লেগেছে এবারে, দশ বছরে এমন জ্বর তো দেখি নি এখানে। এবারে জ্বরেই দেশ সাবড়ে যাবে দেখছি।

—আজ্ঞে, মারে কৃষ্ট রাখে কে? আপনি ভেবে আর কী করবেন?—অযাচিত-ভাবে খানিকটা ধর্মকথা আর সান্ত্বনা বাক্য শোনাইয়া রাধানাথ তামাক আনিতে গেল।

২

ম্যালেরিয়া!

বাস্তবিক এ দুর্গ্রহ যে কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন সে কথা। এই চর ইস্মাইল, সমাজ সভ্যতার বাহিরে এই দুর্গম দেশ—এখানে এসব বালাই তো ছিল না কোনকালেই। বিদ্রোহী মানুষ। পাশব বন্যতা, বলিষ্ঠ বর্বরতা—প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর মতো যোগ্যতমের উদ্বর্তন। কিন্তু নতুন পৃথিবী আর নতুন মাটি পুরানো হইয়া আসিল—নোনাধরা জমিতে ক্রমে পলিমাটির মিঠা ছোঁয়াচ লাগিয়া শস্যের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। বাহু বাড়াইতে লাগিল সভ্যতা, আর তাহারি সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তাহার ব্যাধিগুলিও যেন এখানকার জীবনের বিষ ছড়াইতে লাগিল—ঘূণ ধরাইয়া দিল। নদী মরিয়াছে—নানা কৌশলে সরীসৃপ গতিতে চড়া এড়াইয়া আর বাঁশের সংকেত লক্ষ্য করিয়া ষ্টিমারকে পথ চলিতে হয়। আজকাল প্রায় বারো মাসই সহর হইতে নৌকা আসে— যোগাযোগ সরল এবং নির্বাধ হইয়া আসিয়াছে। আর সেই সব নৌকাগুলিতে বোঝাই দিয়া নির্বিঘ্ন শান্তি আর সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া আসিয়া এখানে যেন বসিয়াছে কায়েমি হইয়া।

পর্তুগীজদের বংশধর ডি-সিল্‌ভা ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিল। জ্বরের উপর জ্বর আসিয়াছে আবার! সরকারী ডাক্তারখানার পাঁচ-ছয় শিশির ওষুধ গিলিয়াও কোনো লাভ হয় নাই—দশ-বারো দিন হইতে টানা জ্বর চলিতেছে সমানে।

ছেলে ডি-ক্রুজা ওরফে ক্রুজা ডাক্তারখানায় গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া ঠক্‌ করিয়া শূন্য শিশিটা রাখিল কুলুঙ্গির উপরে। কম্বলের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া কাঁপা গলায় ডি-সিল্‌ভা বলিল, ওষুধ আনলি নে?

ক্রুজা বিরক্ত গলায় বলিল, না।

—না ? না কেন ? জ্বরে ভুগে ভুগে মরে যাব নাকি ?

—আমি কী করব ?

—আমি কী করব ? তার মানে ? জ্বরের উপরে ক্রুদ্ধ ডি-সিল্‌ভার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল, উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে এখনি বেয়াদব ছেলেটাকে ঘা-কতক লাথি মারিত। কিন্তু উপায় যখন নাই, তখন কম্বলের তলা হইতেই যথাসাধ্য গর্জন করিয়া বলিল, ওষুধ আনলি নে কেন বদমাস ?

—খালি খালি গাল দিয়ো না। ওষুধ নেই।

—নেই ?

না। সব শিশিধোয়া জল। কম্পাউণ্ডার বললেন, যুদ্ধ লেগেছে, আর ওষুধ আসবে না। চুপচাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকো এখন। আর যদি শিশিধোয়া জলই খেতে চাও তা হলে কষ্ট করে আর ডাক্তারখানায় যেতে হবে কেন ? আমি তিন বাল্‌তি নদীর জল এনে দিচ্ছি, বাড়িতে যত শিশি বোতল আছে সব তার মধ্যে চুবোও আর খাও।

ছেলেটা দুর্বিনীত আর দুর্মুখ। বছর ষোল-সতেরো বয়স হইয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে না অর্জন করিয়াছে এমন বিদ্যাই নাই। মা মরা ছেলে, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়াই বড় করিয়া তুলিয়াছে ডি-সিল্‌ভা। ফলে যা হইবার তাহাই হইয়াছে—চূড়ান্ত ভাবে বখিয়া গিয়াছে হতভাগা। বাপ যতদিন এম্‌নি পড়িয়া থাকিবে ততদিনই তাহার সুবিধা—সের খানেক ভালো তামাক আছে বাড়িতে—নিশ্চিন্তভাবে সেইটাই সে টানিয়া টানিয়া শেষ করিয়া দিবে।

অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডি-সিল্‌ভা বলিল, সামনে থেকে দূর হয়ে যা শূয়োরের বাচ্চা।

—নিজেকেই শূয়োর বললে তো ?

—হারামজাদা উল্লুক গেলি এখান থেকে ?

—ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে গালাগালি করলেই কি ওষুধ আসবে নাকি ? এদিকে জ্বরে ভুগছ অথচ গলার জোরে তো কিছু কমতি নেই দেখছি !

শিস্ দিয়া ক্রুজা চলিয়া গেল।

ছেলের উপর রাগ করিয়া লাভ নাই! শরীরটা একটু সারিলে হয়—ধরিয়া কিছু লাগাইয়া দিলেই সায়েস্তা হইয়া যাইবে। দোষ যা অদৃষ্টের। তিন বছর ধরিয়া কী দুর্দিনই যে আসিয়াছে। সেই বন্যা—সেই ভয়ংকর দুর্যোগ। রাশি রাশি মানুষ মরিল—ডি-সিল্‌ভার দশ দশটা মহিষ বানের জলে ভাসিয়া গেল। তারপর

হইতেই এই চলিতেছে! দুই বছরে তবুও মানুষ যদিবা কিছুটা সামলাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু আবার যুদ্ধ বাধিল, জিনিষপত্রের দাম চড়িল পাঁচগুণ। সর্বোপরি বিষফোঁড়ার মতো দেখা দিল ম্যালেরিয়া। মানুষ দাঁড়াইবে কোন্‌খানে?

কী হইবে একমাত্র মাদার মেরীই বলিতে পারেন সে কথা। কী অপরাধ করিয়াছে পৃথিবীর মানুষ—তিনিই জানেন, কিন্তু মনে হইতেছে কাহারো আর বাঁচিয়া থাকিবার উপায় থাকিবেনা কিছুদিন পরে। দিনের পর দিন অবস্থা দুঃসহ হইতে দুঃসহতর হইয়া উঠিতেছে—ভবিষ্যৎটা অমাবস্যা রাত্রির মতো অন্ধকার।

অসহায় ভাবে হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া ডি-সিল্‌ভা গলায় কালো কারে বাঁধা ক্রশটা চাপিয়া ধরিল। মাদার অব্‌ মার্সি! সন্তানদের এ বিপদ হইতে উদ্ধার করো।

চিৎ হইয়া ডি-সিল্‌ভা উপরের চালটার দিকে চাহিল। টিনের এখানে ওখানে বড় বড় ছিদ্র দেখা দিয়াছে, তাহারি ভিতর দিয়া সূর্যালোক যেন এক একটা সোনার টুকরার মতো ঘরের মেজেয় আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। রোদের আলোয় চালের এখানে ওখানে সিল্কের মতো উজ্জ্বল হইয়া চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে মাকড়শার জাল। বর্ষা নামিলেই ওখানকার রন্ধ্রপথগুলি দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িবে। সারাইবার উপায় নাই। করোগেটেড্‌ টিন পাওয়াই যায় না, যাও বা পাওয়া যায় তাহার দাম এম্‌নি আগুন যে ঘর সারাইতে গেলে ঘর-বাড়ি নীলামে চড়াইতে হয়। সব টিন যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। অতএব যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত চালটা সারানোর কথা কল্পনাই করা চলে না—অবশ্য ততদিন বাঁচিয়া থাকিলে তবেই।

আচ্ছা: একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডি-সিল্‌ভা ভাবিতে লাগিল: টিন দিয়া কী হয় যুদ্ধে? বন্দুক, কামান না তরোয়াল? টিনের তরোয়াল দিয়া মানুষের কি গলা কাটিয়া ফেলা যায়? মাথার উপর দিয়া যে-সব এরোপ্লেন উড়িয়া যায় ওগুলি কিসের তৈরী? কে জানে?

পায়ের দিক হইতে বরফের মতোই একটা শীতলতা সমস্ত শরীরের মধ্যে শির্‌ শির্‌ করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। হৃৎপিণ্ড দুইটাতে সজোরে কাঁপুনি জাগাইয়া সেই ঠাণ্ডাটা গলায় আসিয়া পৌঁছিল। দাঁতে দাঁত বাজিতেছে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া। জরটা একটু কমিয়াছিল—আবার বাড়িল। একটা অসহায় নিশ্বাস ফেলিয়া কম্বলের মধ্যে আত্মগোপন করিল ডি-সিল্‌ভা। সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপাইতে কাঁপাইতে ম্যালেরিয়ার তরঙ্গ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল—ডি-সিল্‌ভা মূর্ছিতের মতো পড়িয়া রহিল।

চোখের সামনে এলোমেলো ছায়ার মতো কী কতগুলা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। জরের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে সে। কোথায় যেন ভয়ংকর যুদ্ধ চলিতেছে একটা।

কিন্তু এটা কেমন যুদ্ধ? ভারী বিস্ময় লাগিল ডি-সিল্‌ভার। কামান, বন্দুক, এরোপ্লেন কিছু নয়—খালি ঝন ঝন করিয়া শব্দ হইতেছে। চোখ মেলিয়া সে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল কতকগুলা করোগেটেড্ টিন। হাত পা কিছু নাই—কিন্তু কী যেন একটা মন্ত্রবলে তাহারা সবাই অদ্ভুতভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রখর রৌদ্রে টিনগুলা জ্বলিতেছে, তাহাদের দিকে তাকাইতে গেলে চোখে ধাঁধা লাগে। একটা টিন আর একটার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—যেটা পড়িল সেটা আবার লাফ মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে—ধুলায় যেন দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দড়াম করিয়া বিকট শব্দে কি একটা ফাটিয়া গেল—বুকের মধ্যে চমক দিয়া উঠিল ডি সিল্‌ভার। হাওয়ায় পাখা মেলিয়া ওগুলি কী উড়িতেছে? একটা নয়, দুইটা নয়, একশো, দুশো, হাজার! কুইনাইনের পিল নাকি? হাঁ—আশ্চর্য ব্যাপার, কুইনাইনের পিলই তো বটে।

বিকারের ঘোরে ডি-সিল্‌ভা খেয়াল দেখিতে লাগিল।

*   *   *

কিন্তু ক্রুজাকে সে যতটা অকৃতজ্ঞ আর পিতৃভক্তিহীন ভাবিয়াছিল আসলে সে তাহা নয়। মুখে যাহাই বলুক, ক্রুজা বাপকে ভালোবাসে। পথে বাহির হইতেই বলরামের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে এবং বাপকে দেখাইবার জন্য টানিয়া লইয়া আসিয়াছে তাঁহাকে।

বলরাম ডি-সিল্‌ভার বিছানার পাশে আসিয়া বসিলেন। নাড়ী দেখিলেন অনেকক্ষণ। ময়লা গেঞ্জীর উপরে কাঠের একটা ষ্টেথিস্‌কোপ লাগাইয়া হৃদ্‌স্পন্দনটা পরীক্ষা করিলেন। কবিরাজী করিলেও কিছু কিছু আধুনিকতা বলরামের আছে। তারপরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জ্বর ছাড়ে?

ক্রুজা খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিল, বোধ হয় না।

— বোধ হয় না? বেশ ছেলে যা হোক। বাপের জ্বর ছাড়ে কী না সে খবরটাও নিতে পারো নি?

লজ্জিত হইয়া ক্রুজা মাথা নীচু করিয়া রহিল।

—কি খাচ্ছে?

—মুরগীর ঝোল।

সর্বনাশ! বলরাম শিহরিয়া উঠিলেন: এত জ্বরের ওপর মুরগী ঝোল খাচ্ছে! মরে যাবে যে! কেন, সাবু খাওয়াতে পারো না?

—কোথায় পাওয়া যাবে?

কোথায় পাওয়া যাইবে? সে কথা ঠিক। কিছুই তো পাওয়া যায় না।

আরো বিশেষ করিয়া সাবু। এ বস্তুটাও যে সময় বিশেষে সোনার দানা হইয়া উঠিতে পারে, এমন কথা কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল কেউ? মহাজন আর দোকানদারেরা তো স্রেফ হাত গুটাইয়া বসিয়াছে। চাউলের দাম বাড়িয়াছে—চিনি পাওয়া যায় না, কেরোসিন মেলে না, ডাল বাজারে নাই। জীবনধারণের সমস্ত জিনিসগুলিই যখন দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেছে, তখন সাবুদানার জন্য দুশ্চিন্তা করিবার মতো মাথাব্যথা কাহারো নাই।

কিন্তু অত কথা ভাবিতে গেলে তো আর ডাক্তার কবিরাজের চলে না। পৃথিবীর উপরে চটিতে গিয়া বলরাম ক্রুজার উপরেই চটিয়া উঠিলেন।

—জোগাড় করো যেখান থেকে হোক। এতবড় ছেলে হয়েছ, এতটুকু করতে পারো না বাপের জন্যে?

একটা বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া ক্রুজা বলিল, আচ্ছা।

—আর ওষুধ একটা পাঁচন দেব—তৈরী করে রাখব দুপুরবেলা। আর মুরগীর ঝোলটোল খাইয়ো না, তা হলে কিন্তু বাপের চোখ উল্‌টে যাবে। মনে থাকে যেন।

বিবর্ণ মুখে ক্রুজা আবার বলিল, আচ্ছা।

বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। মস্তবড় একটা কাজ আছে হাতে—দেরী করিলে চলিবে না। কাল এখানে সস্ত্রীক আসিয়াছেন শহরের সার্কেল অফিসার। ডাক-বাংলোতে বাসা বাঁধিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীর শরীরটা নাকি একটু খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাঁহাকে একবার দেখিয়া আসিবার জন্য তিনি লোক পাঠাইয়া বলরামকে খবর দিয়াছেন। মনে মনে গর্বিত বোধ করিয়াছেন বলরাম। তাঁহার কদর বাড়িয়াছে এখন, সাহেব-সুবোরা এখানে আসিলেও তাঁহার ডাক পড়ে আজকাল। আর না পড়িয়াও উপায় নাই। সরকারী ডাক্তারখানা বছর দুই আগে একটা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানকার নতুন গোঁফওঠা ছোকরা ডাক্তারকে লোকে বড় আমল দিতে চায় না—তাঁহার প্রবীণ অভিজ্ঞতাকেই বিশ্বাস করে বেশি।

নদীর ধার দিয়া বলরাম হাঁটিয়া চলিলেন। একটু দূরেই সার্কেল অফিসারের শাদা বোটখানা বাঁধা। শান্ত আকাশে গাংচিল উড়িতেছে—মাছরাঙারা ঝপাং ঝপাং করিয়া ছোঁ মারিতেছে জলে। পর্তুগীজদের বিলুপ্ত গীর্জাটার ওখানে খাড়া পাড়ির চূর্ণ-বিচূর্ণ বুকের মধ্যে নারিকেলের শিকড় নিরবলম্ব হইয়া দুলিতেছে। ইলিশ মাছের নৌকা দূরে দূরে ভাসিতেছে মন্থর গতিতে—বেড়াজালের কালো কালো খুঁটিগুলি জলের বুকে অনেকটা জুড়িয়া কতগুলা মানুষের মাথার মতো বৃত্তাকারে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিতেছে।

এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে বলরাম সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন : কী দ্রুতবেগেই না বড় হইতেছে চর ইস্‌মাইল। একটা ছোট ইস্কুল হইয়াছে, হইয়াছে সরকারী ডাক্তারখানা, ডাকবাংলো। ছোট একটি বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে, মানুষ যে কত বাড়িয়াছে তাহার আর সীমা সংখ্যাই নাই।

অথচ!

এই তো সেদিনের কথা। সমুদ্রের মত নদী। শহর হইতে যাহারা আসিত, আসিত হাতে প্রাণ লইয়া। যে কয়জন মানুষ ছিল, মুখচেনা ছিল তাহাদের সকলের, ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশির ভাগের সঙ্গেই। আর আজ।

এই চর ইস্‌মাইল যেন শহর উঠিতেছে।

নদীর তীর ছাড়াইয়া আর একটু আগাতেই লাল ইটের তৈরী সরকারী ডাকবাংলো। একটা উঁচু টিলার উপরে চমৎকার সুন্দর বাড়িটা—বহুদূর হইতেই চোখে পড়ে। বছর দুই আগে মাত্র তৈরী হইয়াছে বাড়িটা—এখনো নতুন। দ্বিধা-কম্পিত পায়ে বলরাম আগাইতে লাগিলেন।

বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়া সাহেব খবরের কাগজ পড়িতেছেন। কাগজের বিপুল ব্যাসের অন্তরালে মুখটা ঢাকা। খাকী প্যাণ্টের নীচের দুখানা কালো কালো পা দেখা গেল—যাক, বদমেজাজী গোরাচাঁদ নয় তাহা হইলে। খানিকটা নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন বলরাম।

ডাকিলেন, হুজুর?

সাহেব মুখের উপর হইতে খবরের কাগজ সরাইয়া হাসিলেন। নমস্কার করিয়া কহিলেন, আসুন, আসুন, কবিরাজমশাই। চিনতে পারলেন?

বলরাম হকচকিয়া গেলেন। উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিলেন, কই আমি তো—

—কী আশ্চর্য, ভুলে গেলেন এরই মধ্যে। হাকিম প্রাণ খোলা ভাবে হাসিয়া উঠিলেন : আপনার চেহারা তো প্রায় একই রকম আছে, আমি দেখেই চিনেচি। কিন্তু আমি কি এর মধ্যে এতই বদলে গেলাম নাকি। সেই খাসমহল কাছারীর তশীলদার মণিমোহন বাঁড়ুয্যেকে ভুলে গেলেন! আমিই মণিমোহন।

—তাই তো, তাই তো। বিস্ফারিতদৃষ্টিতে বলরাম চাহিয়াই রহিলেন।

৩

বিস্ময়ের ভাবটা কিছু পরিমাণে কাটিলে আত্মস্থ হইয়া বলরাম বসিলেন। খাসমহল কাছারীর সেই তরুণ তহশীলদার মণিমোহনই বটে। এতটা আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জীবনটা ঘুরিয়া চলিয়াছে চক্রবৎ গতিতে—মণিমোহনেরও পদোন্নতি হইয়াছে। বলরামের মনটা অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল। আহা, উন্নতি হোক, সব দিক দিয়াই উন্নতি হোক! বড় ভালো ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একটা অবচেতন গর্বের অনুভূতি আসিয়া তাঁহাকে দোলা দিয়া গেল। মণিমোহন—সাধারণের চোখে আজ সে হাকিম, অসংখ্য লোকের দণ্ডমুণ্ডের সে বিধাতা। কিন্তু বলরামের কাছে দশবছর আগেকার সেই ছেলেমানুষ সরকারী বাবুটি ঠিক তেমনিই রহিয়া গিয়াছে—এতটুকু ইতর-বিশেষ হয় নাই, একবিন্দু রূপান্তর ঘটে নাই। কেশীকংসজয়ী সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও কি যশোদা এমনি করিয়াই ভাবিতেন?

প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখে বলরাম মণিমোহনের দিকে নির্নিমেষ ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

—কবিরাজমশাই, একটু চা খাবেন নাকি?

বলরাম ভাবিতে লাগিলেন—হাঁ, বয়স একটু বাড়িয়াছে বইকি মণিমোহনের। গলার আওয়াজটা বেশ গভীর আর গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে—জাঁদরেল একটা হাকিম হইতে গেলে যা দরকার হয়। গায়ের রঙ্ আরো একটু কালো হইয়াছে—লাবণ্য শুকাইয়া গিয়া যেন একটা রুক্ষ বাস্তবতার ছাপ পড়িয়াছে সর্বাঙ্গে; চোখের দৃষ্টিতে আজ যেন খানিকটা দাম্ভিকতা আর আলস্যের স্তিমিত ছায়া; অথচ সেদিন এই দুটি মধ্যে মধ্যে যে স্বপ্নের ঘোরে পিছাইয়া পড়িত. শাণিত বুদ্ধিতে চিকচিক করিত। হাঁ, বয়স নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে মণিমোহনের। একটা দশাসই দস্তর মাফিক হাকিম হইতে গেলে যা দরকার সবই।

—কবিরজমশাই, একটু চা দিতে বলি?

কবিরাজ ভাবনার অতলতা হইতে ভাসিয়া উঠিলেন। গর্বে গৌরবে মনটা ভরিয়া উঠিতেছে। বড় ভালো ছেলে মণিমোহন, নহিলে এতদিন পরে, এতটা বড় হইয়াও তাঁহাকে কেমন মনে রাখিয়াছে! আদর অভ্যর্থনা করিতে এতটুকু ত্রুটি নাই কোথাও। বলিলেন, চা? না, চা তো বিশেষ—

—খান না এক পেয়ালা। চায়ের মতো কী আর জিনিষ আছে? গ্রীষ্মকালের

শীতল পানীয়, আর শীতের দিনে গরম পানীয়—বিজ্ঞাপনে পড়েন নি? আপনার মৃত-সঞ্জীবনী সুরার চাইতে অনেক বেশি ফলদায়ক, কী বলেন?

—যা বলেছেন।

ভারী খুশি হইয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন। মাথার তৈল-মসৃণ সুডোল ইন্দ্রলুপ্তটির উপরে রোদের একটি ফালি পড়িয়া চিকমিক্ করিয়া উঠিল; বলরাম যদি গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী হইতেন তাহা হইলে শিষ্য-সামন্তেরা অনায়াসেই মনে করিতে পারিত যে একটা অশরীরী জ্যোতির্ময়তা বলরামের মাথা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে বাহিরে।

—ওরে, দু পেয়ালা চা দিয়ে যাস্ এখানে—হাঁকিয়া চাকরকে বলিয়া দিল মণিমোহন। সত্যিই হুকুম করিবার মতো গলার আওয়াজটা বটে। পদ-মর্যাদার চাপে যথোচিত ভারিক্কী আর গুরুভার যে হইয়া উঠিয়াছে, এ সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় পোষণ করিবার কারণ নাই কোনোদিক হইতে। সেদিনের তরলোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর দশ বছর আগেকার খরস্রোতে তেঁতুলিয়ার জল-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কালের দিগন্তে ভাসিয়া গেছে। তা যাক, সবই তো যায়, কিছুই কাহারো জন্যে অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকে না। কত লোকই তো এমন করিয়া চলিয়া গেল। সেই ডি-সুজা—বাঘের মতো দুঃসাহসী মানুষটা; সেই হরিদাস—যাযাবর আপনভোলা একটা বিশৃঙ্খল মানুষ; সেই জোহান—বর্মীরা যাহার গলা কাটিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল; সেই লিসি—যাহার শোকে পাগল হইয়া গিয়াছিল ডি-সুজা; সেই মুক্তো—

নামটা মনে করিতেই বলরাম আবার চমকিয়া উঠিলেন, মুখের উপর বেদনার কতগুলি রেখা বিকীর্ণ হইয়া গেল নিজের অজ্ঞাতেই। দশবছর সময়টা কি এতই দীর্ঘ দূরান্তব্যাপী? যদি তাহাই হয়, তবে এতদিনে কেন সেই দুঃস্বপ্নটাকে তিনি ভুলিতে পারিলেন না? কেন এখনো মুক্তোর কথাটা বুকের মধ্যে আঘাত করিয়া করিয়া তাঁহাকে এমন ভাবে রক্তাক্ত করিয়া দেয়?

—তারপরে কবিরাজমশাই, দেশের খবর কী আপনাদের?

কবিরাজ আপদমস্তক শিহরিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মণিমোহন মুক্তোর কথাটা ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে নাকি? কিন্তু মুক্তোর সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু একটা সে তো জানিত বলিয়া মনে পড়ে না। তবু অপরাধী মনে আশংকাটা সময়ে উদ্যত হইয়া আছে—ব্যথার জয়েগাটাতে পাছে ঘা লাগিয়া বসে, সেই জন্য সদাসর্বদা সেটাকে দুহাতে আগলাইয়া রাখিতে চান বলরাম।—অ্যাঁ খবর? কী খবর জিজ্ঞেস করছিলেন?

মণিমোহন খবরের কাগজটা উল্টাইতে উল্টাইতে প্রশ্ন করিয়াছিল—কিছু একটা জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই। তাই বলরামের এই চমকটা তাহার চোখে পড়িল না। একটা কোণে দৃষ্টি রাখিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, এই দেশের গাঁয়ের।

ওঃ। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন বলরাম: দেশের খবর তো নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। ধান-চালের বাজার বড় খারাপ। তা ছাড়া ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া এসেছে এবারে। দশবছর আগে তো লোকে এসব বালাইয়ের কথা ভাবতেই পারে নি। হালে দু চারটে করে জ্বরে ধরেছিল বটে, কিন্তু এবারে একেবারে মড়কের মতো জাঁকিয়ে বসেছে।

—লোক মরছে নাকি?

—মরেছেই তো দু দশটা। এক জেলেপাড়াতেই তিন চারটে সাবড়ে গেল কদিনের মধ্যে।

—হুঁ, কুইনাইন আসছে না।—গম্ভীর মুখে কাগজটা ভাঁজ করিয়া পাশের টিপয়টার উপর নামাইয়া রাখিল মণিমোহন: ওষুধ-বিষুধের চালান সব বন্ধ। যা যুদ্ধ লেগেছে।

—যা বলেছেন, যুদ্ধ!—আগ্রহে বলরামের চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে কৌতূহলী মনের খোরাকটা পুরোপুরি মিটিতে চায় না—লোভ বাড়াইয়া দেয়। সাগ্রহে বলরাম বলিলেন: এই যুদ্ধই যত গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আচ্ছা, যুদ্ধের ব্যাপারটা কী, বলুন তো? জার্মানী এবার লড়াই জিতে নেবে, তাই নয়?

—কী বললেন, জার্মানী লড়াই জিতে নেবে?—মণিমোহন হাসিয়া বলরামের দিকে তাকাইল: খবরদার, ও সব কথা আর ভুলেও মুখ দিয়ে বের করবেন না কোনদিন। যুদ্ধের সময়, কোন্ দিকে যে কার কান খাড়া হয়ে আছে ঠিক নেই। গভর্ণমেণ্ট এ সব কথা জান্‌তে পারলে আপনাকে ডিফেন্স্ অফ ইণ্ডিয়া আইনে ধরে নিয়ে যাবে।

সর্বনাশ! সভয়ে বলরাম বলিলেন, না, না, ও সব কথা আমি বলতে যাব কেন। কী দরকারটা পড়েছে আমার। ওই ওরা সব আলোচনা করছিল—

—ওরা কারা?

মণিমোহন অনেকটা যেন ধম্‌কাইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি কঠোর হইয়া আসিল খানিকটা। বলরাম আবার অনুভব করিলেন মণিমোহন এখন অনেকটা বদলাইয়া গেছে, আজ অনেকটা দূরত্ব রাখিয়া এবং অনেকখানি সতর্ক হইয়াই কথা বলিতে

হইবে তাহার সঙ্গে। গর্ব ও আনন্দের যে তরঙ্গটা একটু আগেই মনের মধ্যে উছলাইয়া উঠিতেছিল, মুহূর্তে সেটা স্তিমিত সংকোচে শান্ত হইয়া আসিল।

জ্যোতির্ময় টাকটা একটুখানি চুলকাইয়া লইয়া বলরাম কহিলেন, এই খাসমহলের যোগেশবাবু, হালদার মিঞা, গালু বিশ্বাস—

—নিষেধ করে দেবেন, সবাইকে নিষেধ করে দেবেন। সুখে থাকৃতে ভূতে কিলোচ্ছে, তাই না? শুধু জেনে রাখবেন আমরা জিতছি, আমরা জিতবই। বেশী কৌতূহল ভালো নয়, সময় বিশেষে সেটা দস্তুরমতো মারাত্মকও হয়ে উঠতে পারে—জানেন তো?

মণিমোহন আবার বলরামের দিকে চাহিয়া হাসিল। কিন্তু এবারে তাহার হাসিটা আর তেমন করিয়া বলরামের ভালো লাগিল না। কোথায় কী একটা যেন খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে, একটা অকারণ বেদনার বোঝায় সমস্ত মনটা ভারী হইয়া রহিল।

—যা বলেছেন।

বলরামের তরফ হইতে হাসিবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে সমস্ত মনটা। যে দিনগুলি যায় তাহারা আর ফিরিয়া আসে না নতুন করিয়া। কাল বদলায়, পৃথিবী বদলায়। চর পড়িয়া তেঁতুলিয়ার উদ্দাম করাল স্রোত মন্থর হইয়া আসে। সেদিনের সেই তরুণ শান্ত মণিমোহন আজ রাশভারী একটা হাকিম হইয়া ফিরিয়াছে চর ইস্মাইলে।

চা আসিল।

মণিমোহন একটা পেয়ালা আগাইয়া দিয়া কহিল, খান কবিরাজমশাই।

সোনালি ফুল-কাটা পেয়ালাটায় সোনালি রঙের চা কবিরাজ মুখের সামনে তুলিয়া লইলেন। অত্যন্ত গরম। খানিকটা চা ডিসে ঢালিয়া বলরাম এক মনে চুমুক দিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন শুধু এই জন্যেই তিনি এখানে আসিয়াছেন —হাকিমের সঙ্গে বসিয়া এক পেয়ালা চা খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যই তাঁহার নাই। সোনালি পেয়ালার সোনালি চা-টা বেশ ভালো লাগিতেছে, ঘরের মধ্যে জমিয়া থাকা অস্বস্তিকর বোঝাটা যেন সরিয়া যাইতেছে একটু একটু করিয়া।

মণিমোহন বলিল, হাঁ, যে জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার স্ত্রীর ভারী সখ, এই সব নদীনালার দেশে একটু বেড়িয়ে যাবেন। তাই তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কী বিভ্রাট দেখুন, পথে আসতে আসতেই ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়েছেন। আপনি একটু দেখে যান তাঁকে। ডাক্তারখানায় খবর

পাঠিয়েছিলাম, ওষুধ-বিষুধ কিছু নেই সেখানে। মহা মুস্কিলেই পড়া গেছে। আপনার কথা শুনে তো আরো বেশি ভয়ে ধরে গেল। আপনি একটু দেখুন দিকি।

—বেশ তো—চায়ের ডিসে শেষ চুমুক দিয়া বলরাম বলিলেন, বেশ তো।

চাকরটা সামনেই দাঁড়াইয়া ছিল। মণিমোহন বলিলেন, মেমসাহেবকে তৈরী হতে বল, কবিরাজমশাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন ভেতরে।

মেমসাহেব! আর একটা অপরিচিত শব্দ বলরামের কানে আঘাত করিল। চাকরটা চলিয়া গেল খবর দিতে।

বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্বরটা বেশি নাকি?

—না, তেমন বেশি নয়। তবে যা দিনকাল—বোঝেন তো।

—তা তো বটেই।

চাকর আসিয়া জানাইল মেমসাহেব তৈরী হইয়াই আছেন, কবিরাজমশাই স্বচ্ছন্দে ভেতরে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতে পারেন। মণিমোহন কহিল, চলুন। সংশয়-গ্রস্ত পা দুইটাকে টানিয়া বলরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরের মধ্যে একখানা ডেক-চেয়ারে গলা পর্যন্ত শাল টানিয়া দিয়া মেমসাহেব চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হইবে, শ্যামবর্ণ সুশ্রী মুখখানি দেখিলে তাঁহাকে কিছুতেই হাকিমের গৃহিণী বলিয়া কল্পনা করা চলে না, অথবা মেমসাহেব বলিয়া ডাকিতেই ইচ্ছা হয় না। অসুস্থতার ছোঁয়াচ আসিয়া মুখের উপর বিষন্ন ক্লান্তির পাণ্ডুর একটা ছায়া পড়িয়াছে। ডেক-চেয়ারের হাতলের উপরে উঠিয়া বছর চারেকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছেলে বসিয়া আছে; অত্যন্ত গম্ভীর মুখ—যেন মায়ের অসুখ দেখিয়া নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে এবং এ অবস্থায় কী যে করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আমসত্তর টুকরোর মতো কী একটা কালো জিনিস দুই হাতে প্রাণপণে চাটিতেছে, কনুই পর্যন্ত আঠা আর লালা জমিয়াছে।

—আমার স্ত্রী। আর ইনি আমার পুরোণো বন্ধু—এখানকার কবিরাজমশাই।

মেমসাহেব দু হাত তুলিয়া কবিরাজকে নমস্কার জানাইলেন। চেয়ারের হাতলে বসিয়া থাকা ছেলেটি কী ভাবিল কে জানে, সেও মার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করিল। খাদ্যের টুকরাটা হাত হইতে পড়িয়া গেল মেঝের উপরে।

—দ্যাখো, দ্যাখো, কাণ্ড দ্যাখো ছেলের! কী রকম অসভ্য একটা চাষার মতো চকোলেট খেয়েছে। রাগ করিতে গিয়া মণিমোহন হাসিয়া ফেলিল।—ওরে পিয়ারী, বাইরে নিয়ে গিয়ে ঝিণ্টুর হাত মুখ ভালো করে ধুইয়ে দে তো।

মেমসাহেব মৃদু সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন, ওর কাণ্ডই তো এই।

চাকর আসিয়া ঝিণ্টুকে কোলে তুলিয়া লইয়া গেল। একটা তীব্র প্রতিবাদ

জানাইবার ইচ্ছা ছিল ঝিণ্টুর, কিন্তু সামনে অপরিচিত লোক দেখিয়া সে আত্মসংবরণ করিল।

—হাতটা দেখাও রাণী।

মেমসাহেব হাত বাহির করিয়া দিলেন। সুডোল আঙুলে লাল পাথরের একটি আংটি। মুখের তুলনায় হাতখানির রঙ্ যেন বেশি ফর্সা, যেন আংটির সোনার রঙ্টা দেহের রঙের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গেছে, আর লাল পাথরটা দীপ্তি পাইতেছে একবিন্দু রক্তের মতো। চারগাছি চুড়ি এক সঙ্গে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিয়া মিষ্ট খানিকটা আওয়াজ দিল।

নরম সুডোল হাতখানি মুঠোর মধ্যে টানিয়া লইলেন বলরাম। মনের মধ্যে একটা অলক্ষ্যে তন্ত্রী কী যেন মীড় মূর্ছনায় থাকিয়া থাকিয়া অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে। এই রকম একখানি হাতের স্পর্শ একদিন তাঁহারও জীবনকে মধুময় সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত জানাইয়াছিল, কিন্তু—সে স্পর্শ কার? সেই বা আজ কোথায়?

নিজের ভাবনার মধ্যে তলাইয়া থাকিয়াই বলরাম কিছুক্ষণ অনুভব করিলেন নাড়ীর স্পন্দনটা। তারপর হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, কিছু ভয় নেই, সামান্য কফাশ্রিত জ্বর। আমি গিয়ে একটা পাঁচন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—তাড়াতাড়ি সেরে যাবে তো? যা চারদিকের অবস্থা, তাতে—

—না, না, কোনো ভয় নেই। কালই ছেড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি বরং এখন আসি তা হ'লে—নমস্কার করিয়া কবিরাজ বাহির হইয়া পড়িলেন: বিকেলেই আবার না হয় খবর নেবো এসো।

মণিমোহনও কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা বাহির হইয়া আসিল।

—আচ্ছা কবিরাজমশাই!

—বলুন!

—এখানকার-পোস্টমাস্টারটিকে মনে নেই আপনার? সেই যে কী রকম একটা পাগল লোক—কী নাম?

—হরিদাস সাহা।

—হাঁ, হাঁ, হরিদাস সাহা। এখানে আছেন তিনি?

—নাঃ।—বলরাম একটা দৃষ্টি মেলিয়া আকাশের দিকে তাকাইলেন। উজ্জ্বল নীল আকাশে সাদা মেঘ যাযাবরের মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অমনি করিয়াই একদিন দূর-বিস্তৃত পৃথিবীর উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে কোন শূন্য দিগন্তে মিলাইয়া গেছে সেই ঘরছাড়া ক্ষ্যাপা খেয়ালী লোকটা?

হরিদাস। বলরাম আবার বলিলেন, নাঃ অনেকদিন আগেই চলে গেছে।

—বেশ লোকটা ছিল, তাই নয়? ভারী অদ্ভুত।

—হুঁ।—হরিদাসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যেন বলরামের ভালো লাগিতেছিল না। অত্যন্ত অকারণে মনটা ব্যথাতুর আর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে—ওই যোগাযোগে বড় বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে মুক্তোকে—বড় বেশি করিয়া যন্ত্রণা জাগাইয়া তুলিতেছে দশ বৎসরের পুরোনো ক্ষতটাকে।

বলরাম বলিলেন, তা হলে আমি যাই। অনেক কাজ আছে। চারদিকে জর-ব্যারামের জন্মে ডাকের আর কামাই নেই কি না।

—আচ্ছা আসুন। বিকেলে মনে করে একবারটি খবর দেবেন কিন্তু। আর একটা কথা। নাঃ, থাক, আসুন আপনি।

টাকের উপরে রৌদ্রের আলোটা জ্বালা করিতেছে। ছাতাটা খুলিবার জন্য দাঁড়াইতেই বলরামের কানে ভাসিয়া আসিল মায়ের গলায় সস্নেহ তিরস্কার: ছিঃ ঝিন্টু, এখন কোলে উঠবার জন্মে দুষ্টুমি করতে নেই। আর ওই ভদ্রলোকের সামনে কী অভদ্র ভাবে তুমি চকোলেট খাচ্ছিলে বলো তো? উনি কী যে ভাবলেন—

পলকের জন্মে কী একটা অর্থহীন আকর্ষণে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার দ্বিগুণ বেগে চলিতে সুরু করিলেন বলরাম। এ একটা স্বতন্ত্র জীবন—এ একটা প্রেম এবং আনন্দের নূতন অমৃতলোক। এখানে বলরামের অধিকার নেই, এই স্বর্গ হইতে তিনি নির্বাসিত। কিন্তু কেন? কেন এমন হইল? কেন আজ রাধানাথকে আশ্রয় করিয়া নিঃসঙ্গ দিন তাঁহাকে কাটাইতে হয়? মরিয়া গেলে মুখে একটুখানি আগুন ছোঁয়াইবে এমন লোকও তো আশে পাশে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এ অধিকার হইতে কে তাঁহাকে বঞ্চিত করিল। ইচ্ছা করিলে একটার জায়গাতে তিনটা বিবাহ অত্যন্ত অনায়াসেই কি তিনি করিতে পারিতেন না? আর তাহা হইলে এমনি করিয়াই তাঁহার ঘর ভরিয়া সন্তান দেখা দিত, এমনি করিয়াই সব কিছু—

—কিন্তু! কিন্তু বলরাম আলেয়ার পেছনে ছুটিয়াছিলেন। ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন মিথ্যার উপরে। তাহার শাস্তি তিনি পাইয়াছেন। এই শূন্যতা, এই নিঃসঙ্গতা, এগুলি তাঁহার অপরিহার্য কর্মফল। অকস্মাৎ নিজের উপরে একটা সুতীব্র অর্থহীন বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হইয়া গেল বলরামের মনটা। দ্রুতবেগে তিনি চলিতে লাগিলেন—অনেকগুলি রোগী পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, এ সব অবান্তর ভাবনায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সময় কাটাইলে তাঁহার চলিবে না।

আর ওদিকে মণিমোহনও তাঁহার গন্তব্য পথের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

একটা কথা তাহার মনে পড়িতেছিল, ভাবিতেছিল একবার বলরামকে জিজ্ঞাসা

করিয়া লয় ব্যাপারটা। কিন্তু প্রশ্ন করিতে গিয়াই খেয়াল হইল সে সব বলরামের জানিবার কথা নয়। কিন্তু কথাটাকে ভোলা যাইতেছে না কিছুতেই।

সে কি ভুলিবার। দশবছর আগেকার কথা—কিন্তু মনের দিকে চাহিলে মনে হয়, এই তো সেদিন। কষ্টিপাথরে সোনার দাগ পড়িয়া যেমন জল্ জল্ করিতে থাকে, তেমনি করিয়া স্মৃতি-বিস্মৃতির পটভূমিকার উপরে সেই লেখাটা ক্ষয়হীন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

…সেই ঝড়ের রাত্রি। দুটি নীলার মতো চোখ হইতে বিষাক্ত কামনার আলো যেন ছুরির ফলার মতো বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। বাহিরে গর্জন করিতেছে ঝড়। ধূলার ঘূর্ণিতে বাগানটা অন্ধকার হইয়া গেল। মড় মড় শব্দ করিয়া কী একটা ভাঙিয়া পড়িল—একখানা ডাল অথবা আস্তো গাছই একটা। তার ঝাপ্টায় জানালার পাল্লা দুইটা হতাশভাবে বারে বারে আছড়াইয়া পড়িতেছে। বড় বড় ফোঁটায় শব্দ করিয়া ডানায় বৃষ্টি উড়িয়া আসিতেছে—চড়বড় চড়বড়—যেন একদল ঘোড়সোয়ার আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ছুটিয়া গেল। তারপর দুইটা কঠিন আর কোমল বাহুবন্ধন—যেন সাপের আলিঙ্গনের মতো। চুলের গন্ধটা ক্লোরোফর্মের কাজ করিয়া তাহাকে যেন ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়াছিল। ছোরা দেখাইয়া সেদিন সেই ভালোবাসা আদায় করিয়া নেওয়া। প্রেম নয়—কামনা! সুধা নয়—মদিরা।

তারপরে আর একটি রাত। সেদিনকার সেই বিজয়িনীই সেই রাত্রে আসিয়াছিল আশ্রয়ার্থিনী হইয়া। বোটের মধ্যে আরো নিবিড় অন্ধকার। নীচে নদীর জল যেন কল কল করিয়া কাঁদিতেছে—কোথায় চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল নিশাচর পাখী; হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে মেয়েটি, তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না, চেনাও যায় না। অসংলগ্ন মন লইয়া সেদিন কত কী ভাবিয়াছিল মণিমোহন—কত কী বলিয়াছিল। নিজের জীবনের সঙ্গে ওই বিচিত্ররূপা বিদেশিনীকে সে জড়াইয়া লইতে চাহিয়াছিল একান্ত করিয়া। কিন্তু মেয়েটি কর্ণপাত করে নাই সে কথায়। অন্ধকারের মধ্যে যেমন রহস্যময়ী হইয়া সে দেখা দিয়াছিল, তেমনি রহস্যময়ীর মতোই মিলাইয়া গেছে।

যদি সেদিন সে রাজী হইয়া যাইত মণিমোহনের প্রস্তাবে? যদি সেদিন সত্যিই বাস্তবীরূপে আসিয়া তাহার জীবনকে অধিকার করিয়া বসিত, তাহা হইলে? তাহা হইলে আজকের এই মণিমোহন সম্পূর্ণ নতুন রূপ লইয়া দেখা দিত। সংগ্রাম আসিত, সংঘাত আসিত। কর্মজীবনের ধারা উল্টা দিকে বহিত, বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইত অভ্যস্ত সংসার হইতে, কোন্ একটা অনিশ্চয়তার কণ্টকাকীর্ণ অলক্ষ্যে কোথায় সে ভাসিয়া যাইত কে জানে। তার চাইতে এই তো ভালো। উন্নতির বাঁধা

পথ—জীবনের সুনিশ্চিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিসমাপ্তি। নিঃশঙ্ক, নিরুপদ্রব, নির্ধারিত।

ঘরের মধ্যে ঝিণ্টু হাসিতেছে—রাণী হাসিতেছে। সুখের জীবন, পরিতৃপ্তির জীবন। এই ভালো, এই ভালো। রাণী সুখী হইয়াছে, সবাই সুখী হইয়াছে!

সে সুখী হইয়াছে?

এই নদীর দেশ—প্রাগৈতিহাসিক দেশ। এখানে আসিয়া মনের সুরটা যেন অন্যভাবে বাজিয়া উঠিতে চায়। সৃষ্টিছাড়া দেশে আসিয়া সৃষ্টির নিয়মটাকে যেন বদলাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। ভালোমন্দের সংজ্ঞাটা নতুন করিয়া বিচার করিতে ইচ্ছা হয় একবার।

মণিমোহনের ডায়েরী হইতে

"বহুদিন পরে ডায়েরীর পাতা খুলিলাম।

মলাটের উপরে ধূলা জমিয়াছে, পাতাগুলির রঙ ক্রমশ হল্‌দে হইয়া আসিয়াছে। লিখিতে গেলে অক্ষরগুলি জাবড়াইয়া যায়; যেন বলিতে চায়, ওর কাজ ফুরাইয়াছে, এতদিন পরে আবার ওকে আলোতে টানিয়া আনা ওর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের উপরে খানিকটা উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই নয়। মনটাও আজ কিছু ভাবিতে চায় না—নিরুত্তাপ ও নিরুত্তেজ শান্তিতে ঝিমাইয়া পড়িতে ভালোবাসে—মনের প্রতিলিপিও বুঝি তেমনি করিয়া মুছিয়া যাইতে চায় স্মৃতির পাণ্ডুলিপি হইতে। যা গিয়াছে, তাহাকে যাইতে দাও। যে তুমি আজ বাঁচিয়া নাই, নতুন করিয়া ডায়েরী লিখিতে বসিলেই কি আজ আবার তাহাকে পুনর্জীবন দিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? কোন লাভ হইবে না, কেবল অনর্থক হতাশায় ভরিয়া যাইবে সমস্ত।

ডায়েরীর পাতা খুলিয়া লেখাগুলি পড়িতেছি। সেই আমি, পশ্চাতের আমি। কত কল্পনা, কত আশা, কত আত্মবিশ্লেষণ। এই ডায়েরীর পাতায় যেন একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলাম। সেই জগতে আমি স্রষ্টা, আমি সর্বময়, সেখানে আমার একচ্ছত্র রাজত্ব। কত সহস্র রূপে নিজেকে বিচার করিয়াছি, রচনা করিয়াছি, ভাঙিয়া ফেলিয়াছি। সেই আমি কি এই? আজ আমার সমস্ত কিছু সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বৃহত্তর ভাবনা নাই, মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মনের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রয়াস নাই। আমার

মধ্যে সেদিন কত অসংখ্য কাহিনীর নায়ককে পাইয়াছিলাম, কত অগণ্য সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেদিনের আমি আজ কী হইয়া দাঁড়াইয়াছি ভাবিতে ভয় পাই। জীবনের এই নির্দিষ্ট গতিপথ ছাড়া চলার যে আর কোনো দিক আছে, এটা কল্পনা করিতেই মন আতংক এবং আশংকাগ্রস্ত হইয়া ওঠে।

মপাসাঁর একটা উপদেশ মনে পড়িতেছে ? No man should read his old letters ; পুরানো চিঠি পড়িলে একান্ত সার্থক জীবনকেও মূল্যহীন এবং মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, সমগ্রব্যাপী একটা শোচনীয় ব্যর্থতার সুস্পষ্ট রূপ তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় আত্মহত্যার পথে। কিন্তু আত্মহত্যা আমি করিব না—অতখানি মনো-বিলাস বা মনের প্রবণতা আমার নাই। আমি বাঁচিতে চাই, জীবনকে আমি ভালোবাসিয়াছি। শুধু পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলির দিকে চাহিয়া কৌতূহল আর বিস্ময়বোধ হইতেছে। আমি কী হইতে পারিতাম—কী হইয়াছি।

কেন এত সব কথা মনে পড়িল ? মনে পড়িল এই চর ইস্মাইলে আসিয়া। জীবনের সব চাইতে মূল্যবান অভিজ্ঞতা আর সব চাইতে বিস্ময়কর অনুভূতি আমি এখানেই লাভ করিয়াছি। সেই মেয়েটি সেই বর্মী মেয়েটি। নাম ভুলিয়া গিয়াছি। কী হইবে তাহার নাম নিয়া ? নাম তাহার পরিচয় নয়, তাহার পরিচয় রুদ্র-মধুরে অপরূপ এই চর্ ইসমাইল। সে যেন এখানকার আদিম প্রকৃতির মূর্ত প্রতীক। এখানকার ঝড় আর হিংস্র সৌন্দর্যের উচ্ছল তরঙ্গ লইয়া আমাকে গ্রাস করিয়াছিল, আবার তেম্নিভাবেই রিক্ত গম্ভীর ঔদাসীন্যে আমাকে পিছনে ফেলিয়া সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

কী হইত সেদিনের স্রোতে ভাসিয়া পড়িলে ? কী হইত সেদিন সেই বন্য সৌন্দর্যের করাল গ্রাসে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিলে ? পশ্চাতের আমি লোভ দেখাইতেছে। বলিতেছে : তাহা হইলে সহস্র সংঘাতের মধ্য দিয়া তুমি বাঁচিয়া থাকিতে—নিজেকে সহস্র সত্তায় বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিতে, অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া সার্থক হইতে পারিতে। এমন করিয়া জীবনের একমুখী আলস্যমন্থর গতির মধ্য দিয়া তোমার সমস্ত সত্তার মৃত্যু ঘটিত না।

না, না, এভাবে নিজেকে লোভ দেখাইয়া লাভ নাই। দশবছর বয়স বাড়িয়াছে, পদোন্নতি হইয়াছে, উন্নতির শীর্ষশিখর তো এখন সম্মুখেই পড়িয়া ; তা ছাড়া পাশেই রাণী ঘুমাইতেছে। ওর শান্ত কোমল মুখের উপরে আলো পড়িয়া অপরূপ শ্রীতে ওকে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ও যেন পূর্ণ বিশ্রাম—সমস্ত সংগ্রাম ও ক্লান্তির একান্ত শান্তিময় অবসান। নীড় আর ভালোবাসা। ঝিণ্টুর মুখখানা ওর মায়ের

বুকের মধ্যে লুকাইয়া আছে। আমার সন্তান আমার সজীব দেহ ও মনের ধারা-বাহক। এই ভালো। যা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি পথের ধূলাতেই তাহার শেষ চিহ্নটুকু মিলাইয়া যাক। চর ইস্‌মাইল আজ আর আমার রক্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।—তাহার ডাকিনীমন্ত্রকে আমি জয় করিয়াছি।"

৪

চর ইস্‌মাইলের বাহিরে বৃহত্তর পৃথিবী ঘুরিয়া চলিয়াছে।

দিগ্‌দিগন্ত জুড়িয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মানচিত্রে রেখাগুলি প্রত্যেকদিন বদলাইয়া চলিয়াছে নূতন করিয়া—ইয়োরোপে, চীনে, প্রশান্ত মহাসাগরে, ভারতবর্ষে। চর ইস্‌মাইল কি তাহার স্পর্শ পায় নাই? পাইয়াছে বই কি। মাথার উপর দিয়া বিমান ওড়ে, নদীর জলে ফেনিল তরঙ্গ জাগাইয়া সৈন্যবাহী জাহাজ ভাসিয়া যায়। ভারত মহাসাগরে জাপানী মানোয়ার হানা দিয়া ফিরিতেছে, বর্মা, আরাকান শত্রুপক্ষ গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। আসামের সীমান্তে কামানগর্জন—খাসিয়া, জয়ন্তী, লুসাই পাহাড়ের চূড়াগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কাঁপিয়া উঠিতেছে। চট্টগ্রামে বোমা পড়িতেছে।

উন্মাদ ডি-সুজাকে লইয়া গিয়াছিল গঞ্জালেস্‌। লিসিকে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবে—উদ্ধার করিবে। যেমন করিয়া হোক, যতদিনেই। কতটুকু এই পৃথিবী, কতখানিই বা এই মহাসাগরের ব্যাস? তাহাদের দিগ্বিজয়ী জলদস্যু পূর্বপুরুষেরা একদিন সাতটি সাগর চষিয়া বেড়াইত, তাহাদের ড্রাগন আঁকা রক্তপতাকা সমুদ্রের নীল জলে রক্তের ছায়া ফেলিত। সন্ধান সুরু হইল্। চট্টগ্রাম হইতে আরাকান খুব বেশি দিনের পথ নয়—ডি-সুজাকে লইয়া গঞ্জালেস্‌ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইল সমস্ত। কিন্তু লিসির সন্ধান পাওয়া গেল না—না পাওয়া গেল বর্মীদের কাহাকেও। তারপর একদিন সকালে উঠিয়া গঞ্জালেস্‌ দেখিল ঘরের চালে একটা দড়ি ঝুলাইয়া তাহার সঙ্গে ডি-সুজাও ঝুলিতেছে। গলাটা সারসের গলার মতো লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মানুষের জিভ যে অতখানি বড় হইতে পারে, এর আগে সেটা কোনোদিন কল্পনাই করিতে পারে নাই গঞ্জালেস্‌। নাকের ফাঁক দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িয়া বুকের উপরে কালো হইয়া জমিয়া আছে। আত্মহত্যা করিয়াছে ডি-সুজা। এতবড় বীর, এমন দুঃসাহসী পুরুষ। তাহার অমিত শক্তিমান জীবনকে সে আর কাহারো হাতেই শেষ করিতে দেয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যুকেও মানিয়া লয় নাই। যে আলো সমস্ত জীবন ধরিয়া সে সহস্র ছটায় জ্বালাইয়া দিয়াছিল—নিজের হাতেই সে আলোক সে নিবাইয়া দিয়া গিয়াছে।

তারপরেই ক্রমে কেমন একটা প্রতিক্রিয়া আসিয়া দেখা দিল গঞ্জালেসের মনে! লিসির জন্য সে উদ্দামতাটা যেন আস্তে আস্তে শান্ত হইয়া আসিল। ডি-সুজার মৃত্যুটা একখণ্ড পাথরের মতো হইয়া চাপিয়া বসিল তাহার চেতনায়। মনে হইল, তাহারও শেষ পরিণতি হয়তো বা এমনি করিয়াই ঘনাইয়া আসিবে। তাহার শিরায় শিরায় অতীতের সেই সংস্কারবাদী হিন্দুরক্ত ক্রিয়া করিল।

গঞ্জালেস্ ফিরিয়া আসিল বাড়ীতে।

কাজ কারবারে মন দিল, কিন্তু মন বসিল না। জীবনটা যেন অদ্ভুতভাবে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেছে। যে বিদ্রোহী বহু দিনের ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, সে কিছুই করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই অস্বস্তির একটা তীব্র জ্বালায় নিজেকে যেন জ্বালাইতে থাকে। অথচ, কাজ কারবারও দেখিতে হইবে। জোর করিয়া মনটাকে বাঁধিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে পুরাণো অভ্যাসগুলিকে ঝালাইয়া লইতে সুরু করিল সে। তারপরে মদ টানিতে লাগিল অশ্রান্তভাবে। ডেভিড গঞ্জালেসের মতো বেপরোয়া হইবার ক্ষমতা তাহার নাই, কিন্তু কপালে বাপের দেওয়া সেই কাটা চিহ্নটার জয়-তিলক বহন করিয়া সে পূর্ণ উদ্যমে নেশার সেবায় লাগিয়া গেল। ভাব-সাব দেখিয়া পাকা হুইস্কিখোর বন্ধু পেরিরাও তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

একদিন পেরিরা ঠাট্টা করিয়া মন্তব্য করিল: হ্যাঁ, বাপের নাম রাখতে পারবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

আরক্ত চোখ দুইটা পাকাইয়া গঞ্জালেস্ পেরিরার দিকে তাকাইল: বাপের নাম? বাপকে ছাড়িয়ে যদি যেতে না পারি, তা হলে আমার নাম স্যামুয়েলই নয়। সে ব্যাটা ধেনো পেলে ধেনোই টানত, আমি হুইস্কির নীচে নামব না—এ তোমাকে বলে রাখলাম।

পেরিরা খুশি হইয়া গঞ্জালেসের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া কহিল: সাবাস ভাই, সাবাস। বুকের পাটা আছে তোমার।

অবশ্য খুসি হইবার কারণ আছে তাহার যথেষ্টই। নেশার জন্যে অনেকগুলা কাঁচা পয়সা তাহার বাহির হইয়া যাইত, সেগুলি বাঁচিয়া গেল আপাতত। তা ছাড়া গঞ্জালেসের কারবারে সেও অংশীদার; লোকটা যতদিন নেশার মধ্যে তলাইয়া থাকিবে, ততদিনই সে নিজের জন্য কিছু করিয়া লইবার সুযোগ পাইবে। অবশ্য, কৃতঘ্নতা বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু ব্যবসা করিতে বসিয়া যখন দুনিয়া শুদ্ধ লোককেই ঠকানো চলিতেছে, তখন অংশীদারকেও কিছু ঠকাইলে তাহাতে পাপের মাত্রাটা এমন ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিবে না। মাতা মেরী তো আর একেবারে

হৃদয়হীনা নন, একটা গতিও তিনি করিয়া দিবেনই পেরিরার। সংসারে নিজের কাজ নিজে গুছাইয়া না নিলে তোমার জন্যে কে আর হাত বাড়াইয়া বসিয়া আছে বলো।

গঞ্জালেস্ তলাইয়া গেল মদের বোতলের মধ্যে, তলাইয়া গেল তাহার রক্ষিতা সেই মেয়েমানুষটার মধ্যে। বাহিরের ব্যর্থ সন্ধান যেন অন্তরের মধ্যে আসিয়া তাহার অবলম্বন খোঁজে। মদের বোতলের মধ্যেই কি সে তাহার উদগ্রজ্বালাকে নির্বাপিত করিতে চায়? পণ্য নারীর ভ্রূ ভঙ্গির মধ্য দিয়াই কি গঞ্জালেস্ খুঁজিয়া পায় লিসিকে।

আর তাহারি আড়ালে আড়ালে স্রোতের মতো দিন বহিয়া চলে—বয়স বাড়িয়া চলে গঞ্জালেসের। ছয়—সাত—আট—নয়—দশ বৎসর।

স্রোতের মতো দিন বহিয়া চলে—বহিয়া চলে বৃহত্তম পৃথিবীর বিবর্তনশীল দিনগুলি। তারপর শোনা গেল বোমা পড়িয়াছে রেঙ্গুনে। তারপর একদিন চট্টগ্রামের আলো নিভিল। অজানা আংশকা এবং ভবিষ্যতের একটা অনিবার্য মৃত্যু তরঙ্গ যেন দিকে দিগন্তে তাহার সুনিশ্চিত আবির্ভাবের সংকেত জানাইল। পালাও—পালাও। উদীয়মান সূর্যের পাখা মেলিয়া জাপানী বোমারু আসিতেছে। আরাকানের পাহাড় হইতে তাহাদের কামানের বজ্র-গর্জন।

মুহূর্তে পৃথিবীর রঙ বদলাইয়া গেল। সহরে মিলিটারী আসিয়া বাঁধিয়াছে আস্তানা; বিমানধ্বংসী কামানগুলি ডকে, পাহাড়ের টিলায় মাথা উঁচু করিয়া শত্রুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর দিয়া বিমান ঘুরিতেছে চক্রাকারে। এ-আর-পির অসংখ্য সতর্ক বাণী। স্লিট-ট্রেঞ্চের সমারোহ। বাংলার ফ্রন্ট লাইন।

সমস্তমানুষগুলির মুখ লেপিয়া মুছিয়া এককার হইয়া গিয়াছে। আশা নাই, আনন্দ নাই, একটা আতংকের কালো ছায়া আসিয়া ভিড় করিয়াছে সকলের মুখে। যখন তখন তীব্র স্বরে কাঁদিয়া ওঠে সাইরেন। ট্রেনে ষ্টিমারে আশ্রয় লইয়া উর্ধশ্বাসে পলাইতেছে মানুষ। সময় নাই—সময় নাই। তাহারা আসিয়া পড়িল।

সারাটা রাত নেশা করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল গঞ্জালেস্। পেরিরা আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল।

—এখানো চুপ করে পড়ে আছো যে?

—গঞ্জালেস্ পাশ ফিরিয়া বলিল, কী করতে হবে?

—প্রাণে বাঁচতে হলে এইবেলাই সরে পড়তে হবে। চাঁটি বাটি এবারে তোলা।

গঞ্জালেস্ যেন এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিল কথাটা। কেন, কী হয়েছে?

পেরিরা চটিয়া উঠিল: হয়েছে মাথা আর মুণ্ডু। আচ্ছা লোক তো তুমি। ওদিকে যে কী কাণ্ড ঘটেছে খেয়াল নেই বুঝি? জাপানীরা যে এসে পড়ল।

—বেশ তো, আসুক না।

—আসুক না? বিস্ফারিত চোখে পেরিরা বলিল: ভেবেছ কি তুমি? ওরা কি তোমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে আসছে নাকি? বোমা দিয়ে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। শোনোনি, বর্মা যে বেহাত হয়ে গেল। এখনও সময় আছে, চলো—কলকাতার দিকে সরে পড়ি।

—আর কাজ কারবার?

—কাজ কারবার? প্রাণে বাঁচলে ওসব ঢের হবে। এখন মানে মানে তো প্রাণ নিয়ে সরে পড়ো আগে।

—ধ্যাৎ—ধ্যাৎ! অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে গঞ্জালেস্ বলিল, এইজন্যে তুমি আমার নেশাটা চটিয়ে দিলে! যে জাহান্নামে খুসি তুমি যেতে পারো, আমি এখান থেকে নড়ব না।

—মরবার বুদ্ধি হয়েছে, তাই না?

—তাতে তোমার কী? আমি মরলে তো আর তোমাকে চ্যাংদোলা করে কবর দিয়ে আসতে হবে না। যে চুলোয় ইচ্ছে যাও, আমাকে খাম্‌কা জালাতন কোরো না।

—বটে বটে? পেরিরা চটিয়া আগুন হইয়া গেল: ভালো কথা বললে মন্দ হয় কিনা। আচ্ছা, তুমি থাকো এখানে। বোমা খেয়ে যদি উড়ে না যাও তো—

—হুইস্কি খেয়ে তো খুব উড়লাম, একবার বোমা খেয়েই দেখি না—গঞ্জালেস্ বোকার মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিল: একটা নতুন রকমের নেশার স্বাদ অন্তত পাওয়া যাবে। শুনেছি হুইস্কির চাইতে বোমার ঝাজটা অনেক বেশি, নয় কি?

—চুলোয় যাও। তোমার আত্মাটা শয়তানে একেবারেই খেয়ে ফেলেছে দেখছি—পাদরী সাহেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া এবং সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পেরিরা বাহির হইয়া গেল। এমন একটা পাঁড় মাতালের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া তর্ক করা নিছক সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পিছন হইতে গঞ্জালেস্ ডাকিয়া বলিল, পারো তো যাওয়ার আগে বোতল তিনেক হুইস্কি বিদায়ের উপহার দিয়ে যেয়ো বন্ধু। আমার তো ঢের খেয়েছ, এখন—

পেরিরা জবাব দিল না, বাকীটা শুনিবার জন্যে দাঁড়াইলও না। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা নিজের যথাসর্বস্ব গুছাইয়া লইয়া সে কলিকাতার ট্রেণ ধরিল।

কিন্তু গঞ্জালেস্‌ও আর বেশিদিন নিজের নির্বিকার ঔদাসীন্যের মধ্যে ঘুমাইয়া থাকিতে পারিল না।

বাহিরের অতি বাস্তব পৃথিবীর স্পর্শও সে অনুভব করিল একদিন। দোকানে গিয়া মদ পাওয়া গেল না—চালান বন্ধ। প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া এক বোতল ধেনো সে সংগ্রহ করিল, তারপর চলিল তাহার প্রিয়তমার সন্ধানে। কিন্তু সেখানে গিয়াও আজ তাহাকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। শুধু তাহার প্রিয়তমাই নয়, সমস্ত ঘরের দরজাই বন্ধ। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যাহারা এই দূর বিদেশের রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে আসিতেছে, তাহাদের প্রয়োজনটা সকলের চাইতে বেশি এবং এ ক্ষেত্রেও তাহাদের দাবী অগ্রগণ্য। গঞ্জালেস্ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সব কিছু বিস্বাদ আর নিরর্থক হইয়া গেছে। আজ সে প্রথম অনুভব করিল যুদ্ধ আসিয়াছে—দিকে দিকে তাহারা বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিয়া খানিকটা আগুন জ্বলিয়া গেল। মদের বোতলটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তারপর লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটিয়া চলিল।

যুদ্ধ আসিয়াছে। সমস্ত শহরটা অন্ধকার। শুধু মাথার উপরে অনেকগুলি লাল নীল আলো মৃদু গর্জনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিমান।

গঞ্জালেস্ চলিতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা ল্যাম্প পোষ্টে ধাক্কা খাইল সে, একটা নেড়ী কুকুরের লেজ মাড়াইয়া দিল—কুকুরটা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া সমস্ত শহরটা যেন মাথায় করিয়া তুলিল। তীব্র আলোর জোয়ারে চারিদিক ভাসাইয়া দিয়া ছোটখাটো একটা লোহার ঝড়ের মতো মিলিটারি ট্রাক নক্ষত্রবেগে বাহির হইয়া গেল—একটুর জন্যে চাপা পড়িল না গঞ্জালেস্।

চলিতে চলিতে কখন যে পথ শেষ হইয়া আসিয়াছে সে নিজেও টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন আর আগাইয়া আসিবার উপায় নাই। কালো অন্ধকারে টানা স্রোতের মতো সামনে কর্ণফুলী বহিয়া চলিয়াছে অবিশ্রাম কলচ্ছন্দে। হাওয়ায় তীরের নারিকেল বীথি মর্মরিত হইতেছে। অনেক দূরে ডকের একরাশ অস্পষ্ট আলো। জাহাজ নোঙর করিয়া আছে। গঞ্জালেস্ চুপ করিয়া নদীর ধারে বসিয়া রহিল।

সত্যিই যুদ্ধ দেখা দিয়াছে—যুদ্ধ প্রবেশ করিয়াছে রক্তে। কোনোদিক হইতেই তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। সব কিছুতেই সে তাহার দাবী জানাইতেছে নিষ্ঠুর ভাবে, মর্মান্তিক ভাবে। নদীর বাতাসে অনেকদিন পরে যেন গঞ্জালেসের উত্তপ্ত মাথাটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিল। মনে পড়িয়া গেল: গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। শহরের পথে দুটি একটি করিয়া মড়া ছড়াইয়া থাকে আজকাল। শুধু মদ নয়, চাল ডাল-আটা নুন-তেল সব কিছুই দিনের পর দিন হাওয়া হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। আজ একমাত্র যুদ্ধটাই সত্য এবং তাহার চাইতেও কঠিনতর সত্য যুদ্ধের নির্মম দাবী, অনিবার্য প্রয়োজন।

গঞ্জালেসের চেতনা নিজের মধ্যে নাড়া খাইয়া যেন জাগিয়া উঠিতেছে। এতদিন কোথায় ছিল, কিসের মধ্যে তলাইয়া ছিল সে? সে তো এমন ছিল না। ডেভিড্ গঞ্জালেস্‌কে তাহার মধ্যে কে জাগাইয়া দিল? বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়িল ডি-সুজাকে, মনে পড়িল লিসিকে। ডি-সুজা। গলায় দড়ি আঁটিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছিল—তাহার জিভটা দুহাত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। আর লিসি? কোথায় সে? কোন সাতসমুদ্রের ওপারে সে চিরদিনের মতো হারাইয়া গেছে?

ঘাসের জমির সামান্য নীচেই কর্ণফুলীর কালো জল কলকল করিয়া বহিতেছে। মৃত্যুর প্রবহমান করাল ধারার মতো কালো। নারিকেল-বীথি যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। ওখানে বনের মাথায় খানিকটা রক্ত মাখাইয়া দিল কে? চাঁদ উঠিতেছে নাকি ওখানে? সমস্ত পৃথিবীটা যেন মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

অসহ তৃষ্ণায় যেন পুড়িয়া যাইতেছে গলাটা। গঞ্জালেস্ জলের কাছে নামিয়া গেল। আঁজলা আঁজলা জল খাইতে সুরু করিল। কী ঠাণ্ডা জলটা—নেশা হয় না, জুড়াইয়া যায় শরীরটা।

হঠাৎ কান্নার মতো একটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক আর্তনাদ উঠিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে সমস্ত শহরটাকে যেন চকিত করিয়া দিল। নদীর জল শিহরিয়া উঠিল। এখানে ওখানে যা দু'একটা ক্ষীণ আলো জলিতেছিল দপ্ দপ্ করিয়া, অতল অন্ধকারে তাহারা নিবিয়া গেল। বনের প্রান্তে যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল চাঁদটা।

এর আগে আরো অনেকবার বাজিয়াছে, কিন্তু আজকের এই দীর্ঘায়ত অবিশ্রাম কান্নার মধ্যে কিসের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন আছে। গঞ্জালেস্ ঘাসের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া পড়িয়া রহিল নিঃসাড় হইয়া। কতক্ষণ? এক মিনিট, দুই মিনিট, হয়তো বা পাঁচ মিনিট! তারপরেই শোনা গেল দূরের আকাশে এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জন। উপরের তারকা-খচিত পটভূমির নীচে লাল আলোক-বিন্দু দিয়া গড়া একটা তীরের ফলার মতো 'ভি' রচনা করিয়া শত্রু-বিমান উড়িয়া আসিতেছে।

সার্চ লাইটের তীব্র আলো আকাশের তামসচক্র উদ্ভাসিত করিয়া ছিল—পাহাড়ের টিলা হইতে গর্জন করিল অ্যান্টি এয়ার-ক্রাফ্ট। অন্ধকারের শূন্যতায় আলোর ফুলঝুরি ছড়াইয়া দিয়া শেল্ ফাটিয়া পড়িল। বোঁ-ও-ও। মৌমাছির ঝাঁকটা বাজ পাখীরমতো ছোঁ দিয়া নামিল, আবার সার্চ লাইটের তীব্র আলো প্রলয়ের বিদ্যুৎ চমকের মতো উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল সমস্ত।

—বুম্ বুম্—কট্-কট্-কট্—

বিদ্যুৎ চমক—মাথার উপরে আলোকের ফুলঝুরি। অ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্ট অবিশ্রান্ত গর্জন করিতেছে। পেটের নীচে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে মাটিটা —যেন মুহূর্তে দু ফাঁক হইয়া গিয়া গোটা শহরটাকেই তলায় টানিয়া লইবে। কর্ণ-ফুলীর জলে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ—অন্ধকারের মধ্যেও দেখা গেল অনেকটা জুড়িয়া একটা শাদা ফেনার বিশাল ঘূর্ণি জলস্তম্ভের মতো দাঁড়াইয়া উঠিল। কট্ কট্ বুম্ বুম্। মাটিটা কি চড়্ চড়্ করিয়া ফাটিতেছে নাকি? হঠাৎ ডকের দিক হইতে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিয়া সব কিছুকে যেন ডুবাইয়া দিল। একটা বিরাট আগুনের শিখা আকাশকে ছড়াইয়া আরো উপরে লক্লক্ করিয়া উড়িয়া গেল—গঞ্জালেসের চোখের সামনে নামিল মূর্ছার অন্ধকার।

টলিতে টলিতে সে বাড়ি ফিরিল—সে একটা নরকের মধ্য দিয়া। আগুন —রক্ত। ধ্বংসস্তূপ। এই জাপানী বোমা! হুইস্কির চাইতে কড়াই বটে, একটু বেশি পরিমাণেই কড়া। গঞ্জালেসের মতো পাঁড় মাতালেরও অতটা বরদাস্ত হইবে না।

একবার—দুইবার—তিনবার। শহরে আর মানুষ নাই। দোকানপাট প্রায় বন্ধ—খাবার মেলে না। চাকরটা পালাইয়া বাঁচিয়াছে। শ্মশানের একটা প্রেতের মতো এভাবে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগে না। গঞ্জালেস্ ভাবিল, এইবার এখান হইতে সত্যিই সরিয়া পড়া দরকার।

কিন্তু কোথায় যাইবে সে? কলিকাতায়?

না, কলিকাতায় নয়। চোখের সামনে একটা অপরিণত তটরেখা ভাসিয়া উঠিতেছে। যেখানে পর্তুগীজদের ভাঙা গীর্জাটার তলা দিয়া খরস্রোতে নোনা গাঙের জল বহিয়া চলিয়াছে; বালির মধ্যে পুঁতিয়া থাকা লোহার কামান আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনশো বছর আগেকার স্বপ্ন দেখিতেছে; জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিক্ষণে গাঙের জল যেখানে জ্যোৎস্না রাত্রিতে থামিয়া থম্থম্ করিতেছে আর তাহার উপর চিত্র-বিচিত্র ডানার ছায়া ফেলিয়া বুনো হাঁসের দল উড়িয়া চলিতেছে—সেইখানে।

সে চর ইস্মাইল।

৫

খুব ভোরে ওঠাই মণিমোহনের অভ্যাস। আজও যখন তার ঘুম ভাঙিল, ঘড়িতে পাঁচটা বাজে নাই তখনও। কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অনুজ্জ্বল আলো ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকারটাকে যেন সবুজ আর স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। পাশে রাণী ঘুমাইয়া আছে, ঝিণ্টু দু হাত দিয়া একান্ত করিয়া আঁকড়াইয়া আছে মা-কে।

রাণীর বিস্রস্ত চুল হইতে একটি স্তবক আসিয়া ঝিণ্টুর নিদ্রিত মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে—মায়ের উপর স্পর্শ সুগভীর ভালোবাসার মতো।

এই তো জীবন! পরিপূর্ণ—সমস্যাহীন, সংঘাতহীন। বংশচক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, মানুষের বিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে—বিস্তার ঘটিয়া চলিয়াছে জৈব-প্রবাহে। প্রাণ হইতে প্রাণে, রূপ হইতে রূপে। কী প্রয়োজন বিপ্লব ঘটাইয়া, উল্কার আলোকে জীবনে আহ্বান করিয়া? যা কখনো সত্য হইয়া উঠিবে না—একটা প্রখর আলোর বিচ্ছুরিত রশ্মিধারায় জ্বালাইয়া দিয়া যাইবে শুধু?

স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিল মণিমোহন। ভোরের আলোয় তন্দ্রাচ্ছন্ন পৃথিবী। চর ইস্‌মাইলের নোনা মাটিতে প্রাণের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই তো পরিণতি। অসীম উন্মুক্ততার যাযাবর বৃত্তি হইতে নীড়ের সংকীর্ণ সীমানাতে—সংঘাত হইতে সন্ধিতে।

রাণী ঘুমাইতেছে—ঝিণ্টু ঘুমাইতেছে। পায়ের কাছ হইতে র‍্যাগটা তুলিয়া আনিয়া দুজনকেই সযত্নে ঢাকিয়া দিল মণিমোহন। এপাশের জানালা দিয়া ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। এই ঠাণ্ডাটা ভালো নয়, রাণীর জ্বর আবার বাড়িতে পারে। টেবিলের উপরে ম্লানাভ লাল আভা বিকীর্ণ করিয়া একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, পোড়া কেরোসিনের লঘু বিস্বাদ গন্ধ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মণিমোহন লণ্ঠন নিবাইয়া দিল।

পায়ের মধ্যে চটিটা টানিয়া আনিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল সে। আবছায়া আলোয় গ্রাম এবং অরণ্য যেন অবসিত স্বপ্নের রেশ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। সামনের বাব্‌লা গাছটায় দু তিনটা কাক একসঙ্গে পাখা ঝাড়া দিয়া কা কা করিয়া প্রভাতী ঘোষণা করিল, বৈতালিক মুরগীর উদাত্ত আহ্বান ভাসিয়া আসিল গ্রামের দিক হইতে। ওপাশে নদীর উপরে খানিকটা হালকা কুয়াশা জমিয়া আছে, ভালো করিয়া নজর চলে না, শুধু কতগুলি নৌকার দীর্ঘ মাস্তলকে অনুমান করিয়া লওয়া চলে মাত্র।

বারান্দায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে। ভারী ভালো লাগিতেছে—এই অপূর্ব ব্রাহ্ম মুহূর্তে মনের উপর হইতে সমস্ত দ্বন্দ্ব—সমস্ত সংশয়ের জালটা যেন সরিয়া গিয়াছে। ঝির ঝির করিয়া হাওয়া আসিয়া যেন উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে রাত্রির সমস্ত জড়তা—সমস্ত ক্লান্তি।

একটা দাঁতন করিতে করিতে পিয়ারী দেখা দিল। মণিমোহন বলিল, কোটটা বার করে দে তো, দু পা হেঁটে আসা যাক।

নদীর ধার দিয়া মেটে পথটায় সে চলিতে লাগিল। একটু একটু করিয়া প্রসন্ন

উজ্জ্বল দিন দিগন্তে ফুটিয়া উঠিতেছে। আকাশের নীলিমা এখানে স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই—ধূসরতার একটা আচ্ছাদন পূর্বাচলকে সমাবৃত করিয়া আছে। তাহারি মধ্য দিয়া উজ্জ্বল রক্তবিন্দুর মতো সূর্য দেখা দিল—সেদিকে তাকাইয়া মণিমোহনের মনে হইল যেন ভস্মভূষণা গৌরীর সীমন্তে সিন্দুরের একটি বিন্দু জ্বলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন একনিষ্ঠ হইয়া তপস্যা করিতেছে—যেন স্থিরব্রতা পার্বতীর মতো বরাভয় কামনা করিতেছে জীবনের জন্য, কল্যাণের জন্য, সন্তানের জন্য।

পায়ের নীচে ঘাসের উপর শিশির বিন্দু চিকচিক করিতেছে। নদীর গেরিমাটি-রঙা জল লাল হইয়া উঠিল। এক একটি করিয়া নৌকা ভাসিয়া পড়িল—পূবের কোনো চরে কাজ করিতে চলিল হয়তো।

—সেলাম হুজুর।

সামনে একটি মুসলমান যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে একটা কালো ভাঁড়ের মধ্যে খানিকটা দুধ। বলিষ্ঠ বুক, বলিষ্ঠ পেশী। হাতটা আর একবার কপালে তুলিয়া বলিল, হুজুর, সেলাম।

মণিমোহন দাঁড়াইয়া পড়িল।

—কী চাই তোমার?

—একটা কথা বলব হুজুর।

—বলো।

রূপার সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া মণিমোহন সিগারেট ধরাইল, তারপর লোকটির মুখের দিকে তাকাইল। ঠিক মুখের দিকে নয়—মুখের পাশ দিয়া তির্যক ভঙ্গিতে আকাশের এক প্রান্তে একখণ্ড শাদা মেঘের দিকে। অধস্তনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার ইহাই আভিজাত্যসম্মত প্রথা—বহুদিনের অভ্যাসে এই আর্টটা মণিমোহন আয়ত্ত করিয়াছে। নীচের দিকে চাহিলে দীনতা, পাশের দিকে তাকাইলে অন্যমনস্কতা, ঠিক মুখোমুখি তাকাইলে একটা অবাঞ্ছিত সাম্যবোধ। অতএব ঠিক কানের পাশ দিয়া এমনভাবে উপরের দিকে চোখ তুলিয়া রাখিবে যে তোমার মুখের পানে চাহিলেই মনে হইবে তুমি নিতান্তই এই পৃথিবীর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নও—তোমার সহিত উর্ধ্বের কোনো একটা স্বর্গলোকের নিবিড় আত্মীয়তা আছে। একজন সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এই সমস্ত মূল্যবান মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক উপদেশ দিয়া মণিমোহনকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করিল—নিজের মনের সংকোচ ও সংশয়টাকে জয় করিবার চেষ্টা করিল বার কয়েক। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলিল, আপনি হাকিম, আপনাদের হাতেই সব। জুলুমবাজি বন্ধ করার একটা ব্যবস্থা করুন হুজুর।

—জুলুমবাজি? কিসের জুলুমবাজি?

—মহাজনের, আড়তদারের।

কথাটা তীরের মতো তীক্ষ্ণ হইয়া মণিমোহনের কানে আসিয়া আঘাত করিল। এই সুরটা ভালো নয়—সাধারণ একজন মুসলমান চাষা প্রজার মুখ হইতে কথাগুলি যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি অস্বস্তিকর। জমি লইয়া ঝামেলা নয়, নারীঘটিত ব্যাপারও কিছু নয়, নজরটা সোজা গিয়া পড়িয়াছে মহাজন আর আড়তদারদের উপরে। অবচেতন চিন্তাকে চকিত করিয়া দিয়া মনে হইল, লোকটা যাহা বলিতেছে, এইখানেই তাহার শেষ নয়—ইহার মূল দূরদূরান্তব্যাপী—ইহার জটিল শিকড়ের জাল আরো অনেকখানি গভীরে গিয়াই ঠেকিয়াছে। সহরের পথে ঘাটে বজ্রকণ্ঠে 'শ্লোগান' শুনিলে ভয় করে না—পতাকাবাহী জনতার চলন্ত মিছিলটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ভালোই লাগে একরকম। কিন্তু চর ইস্‌মাইলের এই প্রত্যন্তে এমনি একটা সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যেই যেন আসন্ন বৈশাখী ঝড়ের সংকেত লুকাইয়া থাকে।

উর্ধচারী দৃষ্টিটা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল—সোজা আসিয়া পড়িল লোকটির মুখের উপরে। যেন তাহার ভিতরের সবটাই মণিমোহন দেখিয়া ফেলিতে চায়। খানিকটা সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশব্দে নদীর হুহু বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে জমির। কলুপাড়ায় আমার বাড়ী—হাটবাজার করতে প্রায়ই এখানে আসতে হয় আমাকে। কাসেম খাঁর ব্যাটা বললেই লোকে চিনবে আমাকে।

—হুঁ। তা আড়তদার মহাজনের ওপরে এত চটেছ কেন?

—তা ছাড়া আর কার ওপরে চটব হুজুর? আপনি তো হাকিম—প্রজার মা বাপ, নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছেন। যুদ্ধের জন্যে আকাল দেখা দিয়েছে চারভিতে। কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না—আধপেটা খেয়ে কোনোমতে দিন কাটাচ্ছে মানুষ। ওদিকে অসুখ বিসুখ—সরকারী দাওয়াই-খানাতে এক ফোঁটা ওষুধ নেই যে—

যেমন অস্বস্তি, তেমনি বিরক্তি বোধ করিল মণিমোহন। যেন বক্তৃতায় পাইয়াছে লোকটাকে। কখন যে সংকোচ আর ছায়ার আবরণটা তাহার সরিয়া গেছে—একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা পড়িয়াছে চোখে মুখে—কঠিন হইয়া উঠিয়াছে খাড়া চোয়ালে; হ্রস্ব ভ্রূ রেখাতে। প্রসারিত বুক আর সুগঠিত মাংসপেশীতে যেন শক্তির তরঙ্গ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। চকিতে একটা তীব্র সন্দেহে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। লোকটা পলিটিক্স করিয়া বেড়ায় না তো? গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়িয়া যাহারা—

হাতের সিগারেটটাকে জুতার নীচে মাড়াইয়া সে অসহিষ্ণুভাবে বলিল, আমার সময় নেই, সংক্ষেপে বলো।

—আজ্ঞে, সংক্ষেপেই বলব। আপনি হাকিম—কত কাজ, কত ভাবনা আপনার—সে কি আর জানি না। যেন বিনয়ে গলিয়া গেল জমির।

কিন্তু এই বিনয়টাও তেমন প্রীতিকর লাগিল না। ইহার মধ্যে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাস আছে—একটা বিদ্রূপের খোঁচা আছে। হঠাৎ মনে হইল সরকারী বাবু কিংবা হাকিমদের সে সব দিন যেন আর নাই। মাটির তলায় কোথায় বাসুকীর ফণা আর ভার বহিতে পারিতেছে না—বহুদিনের আদায় করিয়া লওয়া সম্মান আর আভিজাত্যের সিংহাসনটা যেন কিসের স্পর্শে টলমল করিয়া নড়িতেছে।

—বলো, বলো, কী বলছিলে বলো।

—আজ্ঞে চাল তো ক্রমেই আক্রা হয়ে উঠছে। বেশি দর পেয়ে যারা ধান বেচে দিয়েছিল, তাদের ঘরের খোরাক ফুরিয়ে গেছে। আধিয়ার আর জনমজুরদের তো কথাই নেই। চাল কিনতে পারছে না কেউ। সব গিয়ে জমেছে আড়তদার আর মহাজনের গোলায়। ধান কিনতে গেলে পনেরো ষোলো টাকা দর হাঁকে তারা। অথচ হুজুর—বোঝেন তো—

—বুঝি।—মণিমোহনের গলার স্বরে এবারে আর স্বচ্ছন্দ ঔদার্য প্রকাশ পাইল না : তা আমাকে কী করতে হবে ?

জমির কিন্তু দমিল না : আপনিই তো সব করবেন হুজুর। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সকলকে চাল ছাড়তে বলে দিন, নইলে মানুষ না খেয়ে মরে যাবে !

লোকটা যেন হুকুম করিতেছে !

চড়া গলায় মণিমোহন বলিল : চাল ছাড়তে বলব ? আমার কথা কেন শুনতে যাবে ওরা ? মহাজনের ধান—সে যদি বিক্রী করতে না চায়, তা হলে কার কী বলবার আছে ?

জমির আবার হাসিল : আপনার কথা শুনবে না ? এও কি একটা কথা হল হুজুর ? আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনাকে মানবে না—কার ঘাড়ে এমন কটা মাথা গজিয়েছে ?

শেষ কথাগুলির মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা আছে, তবু মণিমোহন খুশি হইয়া উঠিতে পারিল না। বলিল, আমি তো বললাম তবু ওরা যদি চাল ছেড়ে না দেয় ?

জমিরের চোখ ঝকঝক করিয়া উঠিল : তা হলে বাকীটা আমাদের ওপরেই ছেড়ে দেবেন। আমরাই দেখব কিছু করতে পারি কি না ! বড়লোক হলেই গরীবকে মারবার এক্তিয়ার কারো জন্মায় না হুজুর।

কিন্তু মণিমোহনের প্রসঙ্গটা আর ভালো লাগিতেছে না। প্রসন্ন সকাল—নদীর জলে প্রথম সূর্যের আলো পড়িয়াছে। ভিজা বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে মাটির

মিষ্টি গন্ধ। সমস্ত পৃথিবীটার যেন স্বর কাটিয়া গেছে—আকাশ বাতাস খিরিয়া একটা আসন্ন দুর্যোগের কালো ইঙ্গিত যেন ছায়া ফেলিয়াছে লোকটার সর্বাঙ্গে। অধীরভাবে মণিমোহন বলিল, আচ্ছা, পরে আবার দেখা কোরো। এখন সময় নেই আমার।

—সেলাম হুজুর।

জমির আর দাঁড়াইল না। দুধের ভাঁড়টা মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

মণিমোহন যখন ডাক-বাংলোয় ফিরিয়া আসিল—তখন রোদ বেশ চড়িয়াছে। চারিদিকের জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে প্রতিদিনের চিরন্তন কর্মকুশলতা লইয়া। জেলেপাড়ায় কালো প্রকাণ্ড কড়াইগুলিতে গাবের রস জাল দেওয়া হইতেছে—রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া অতিকায় বেড়াজাল শান্ত রোদে শুকাইতেছে—ফাঁসের এখানে ওখানে রূপোর টুকরার মতো চিক চিক করিতেছে মাছের আঁশ। নেংটি পরা এবং উলঙ্গ একপাল ছেলেমেয়ে বিহ্বল ভীত চোখে মণিমোহনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কতকগুলি মাথা-ভাঙা সুপারীর গাছ এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া, তিনবছর আগে যে সাইক্লোন বহিয়া গেছে তাহারি চিহ্ন বহন করিতেছে যেন। আদিম বর্বরদের উত্তর পুরুষেরা মাথায় টোকা পরিয়া, হাতে হাঁসুয়া লইয়া এবং কাঁধে লাঙ্গল তুলিয়া নিরীহের মতো কাজ করিতে চলিয়াছে। একজনের হাতে একটা হুঁকা, চলিতে চলিতেই সে তাহাতেই গোটাকতক টান মারিল। সব যেন নিজের চক্রপথে ঘুরিতেছে নির্ভুল নিয়মে, এতটুকু ছন্দোপতন হইবার আশংকা বা সম্ভাবনা নাই কোনখানে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ছয় ফুট উঁচু যে সমস্ত মানুষের পায়ের চাপে মাটি টলমল করিত, আজ তাহারা কোথায় গেল?

তাহারা নাই—কিন্তু একেবারেই কি নাই? সময় যখন আসে, তখন তাহারাও কি ধূলা-হইয়া-যাওয়া কবরের তলা হইতে ঠেলিয়া ওঠে না নতুন সাড়া লইয়া, নতুন মত্ততা লইয়া? তাহা হইলে জমিরের চোখে কিসের আগুন দেখিল সে? ওই যে মানুষগুলি অহিংস অনাসক্তভাবে মন্থরগতিতে পথ চলিতেছে—সময় আসিলে ওরা কি অমনি প্রশান্ত স্তিমিত চোখ মেলিয়াই তাকাইয়া থাকিবে? ইহাদের সকলের কাছ হইতেই কি বিন্দু বিন্দু করিয়া আগুন লইয়া জমিরের চোখ অমন দপ দপ করিয়া শিখায়িত হইয়া ওঠে নাই?

ডাক বাংলোর বারান্দায় রাণী বসিয়া আছে। রোগক্লান্ত মুখশ্রীতে একটা শান্ত কমনীয়তা—একটা অপরূপ মাধুর্য। এই তো বাংলা দেশ—করুণ আর স্নিগ্ধ। বর্ধমানের ধানক্ষেত্রের পাশ দিয়া দ্রুতগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চলিবার সময়

চারিদিকের পৃথিবীকে যেমনটা মনে হয়, ঠিক তেমনই। এখানে ওখানে বিল আর মরা-নদীর জল ঝলমল করিতেছে, তাহার উপরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে খণ্ড চন্দ্রের মধু জ্যোৎস্না। ছোট ছোট গ্রামগুলি আমবাগানের অন্ধকারে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে। কতগুলি লাল নীল আলো হাতছানি দিয়া ডাকিল—কালো-কাঁকর ফেলা টিনের শেড দেওয়া নগণ্য একটি ষ্টেশনে আসিয়া দম লইল রেলগাড়ি। সেখান হইতে এক ফালি মেটে পথ দিয়া বাজারটি পার হইলে ডেলিপ্যাসেঞ্জারের আশ্রয় মিলিবে। পথের ধারে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া গন্ধ ছড়াইতেছে—সান্ধ্য-শৃঙ্গারকে উপলক্ষ করিয়া বৈরাগীর আখড়া হইতে উঠিতেছে কীর্তনের সুর। বাড়ীর সদর দরজায় একটুখানি ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল দরজাটা। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গলবস্ত্রে একটি মেয়ে প্রণাম করিতেছে—তাহার সীমন্তে এয়োতির চিহ্ন গৃহস্থের মঙ্গল আর কল্যাণের বার্তার মতো জাগিয়া আছে। এই রাণী, আর এই বাংলা দেশ।

সপ্রেমে মণিমোহন রাণীর দিকে তাকাইল: এই সকালে উঠেই বাইরে এসে বসেছ যে! ঠাণ্ডা লাগবে না?

রাণী হাসিল: এত রোদ—সকাল কোথায়? ঠাণ্ডা লাগবে না—ভয় নেই তোমার। কী সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে দেখেছ? ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে?

—জ্বর নেই তো?

—না।

রাণীর হাতটা টানিয়া লইয়া মণিমোহন নাড়ী পরীক্ষা করিল, হুঁ, ছেড়ে গেছে। কবিরাজ চিকিৎসা করে ভালো, পাঁচনের গুণ আছে দেখছি। ঝিন্টু কোথায়?

—ওই তো।

একটু দূরেই একটা ঝোপ। নাম-না-জানা একরাশ বেগুনী-রঙের ফুলে আকীর্ণ হইয়া আছে। ছোট বড় কতগুলি প্রজাপতি সকালের আলোয় উল্লসিত পাখা কাঁপাইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরই দু একটাকে ধরিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছে ঝিন্টু।

—প্রজাপতির সন্ধানে আছে বুঝি! কিন্তু এদিককার ঝোপ জঙ্গল বড় খারাপ, সাপ-খোপ থাকতে পারে। আর ছিনে-জোঁক তো কি কি করছেই। ঝিন্টু, ঝিন্টু!

—আসছি বাপী!

—না, এক্ষুনি চলে এসো!

অপ্রসন্ন হইয়া ঝিন্টু ফিরিয়া আসিল—একেবারে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল বাবার

কোলের কাছে। ছোট মাথাটির চুলগুলি আঙুল দিয়া আঁচাড়াইতে আঁচড়াইতে মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল—শিকার মিলল? ধরতে পারলে প্রজাপতি?

—না বাপী, ভারী দুষ্টু ওরা। ধরা যায় না।

—ধরতে নেই ওদের। ঝিণ্টুকে দুহাত দিয়া হাঁটুর উপর তুলিয়া আনিয়া মণিমোহন বলিল, আমি তোমাকে খুব মস্ত একটা ঘোড়া কিনে দেব, আর একটা মোটর। কেমন, তা হলে তো হবে?

পিয়ারী চা আর টোস্ট্ লইয়া দর্শন দিল। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা টোস্ট্ অধিকার করিল ঝিণ্টু। রাণী হাসিয়া বলিল, ঝিণ্টু কী বলেছে জানো না বুঝি? ও আর মোটর কিংবা ঘোড়ায় চড়বে না। একেবারে এরোপ্লেনে উঠে কোথায় যেন যুদ্ধ করতে যাবে।

—সত্যি নাকি? তা হলে পুরোদস্তুর পাইলট?

ঝিণ্টুর সমস্ত মনোযোগ হাতের পাঁউরুটির টুকরোতেই সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপে জবাব দিল, হুঁ। রাণী বলিল, বেশ, তাহলে এই কথাই ঠিক রইল। কালই, তোমার জন্যে এরোপ্লেন আনা হবে, তাইতে চড়ে তুমি যুদ্ধ করতে যেয়ো। কিন্তু একটা কথা আছে। সেখানে মাও থাকবে না, বাপীও থাকবে না। কার কোলে উঠবে, কার বুকের মধ্যে ঘুমোবে, শুনি? আর পিয়ারীও যাবে না—আমাদের চা করে দিতে হবে তো। তা হলে যুদ্ধটা কার সঙ্গে হবে?

ঝিণ্টু বিশ্বাস করিল না, ভয়ও পাইল না। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, তারপরে বলিল, ঈস্!

রাণী ছেলেকে বুকের মধ্যে টানিল, দুষ্টু!

মণিমোহন সস্নেহে গভীর দৃষ্টিতে ঝিণ্টুর কচি কোমল মুখের দিকে তাকাইল, তাকাইল রাণীর স্নেহ সুকুমার নিবিড় দুইটি কালো চোখের দিকে। তাহার সন্তান, তাহার স্ত্রী, তাহার সংসার। বর্ধমানের পল্লীপ্রান্তে সেই শঙ্খধ্বনিমুখরিত বিরাম মধুর সন্ধ্যাটির বার্তা যেন ইহারা বহন করিয়া আসিয়াছে। এই চর ইসমাইলে ইহাদের মানায় না—এই খাপছাড়া জগতের বন্যতার মাঝখানে একান্তভাবেই অনাহূত আগন্তুক।

—আর না রাণী, চলো, এখান থেকে ফিরে যাই।

—কেন, কাজ কি শেষ হয়ে গেছে তোমার?

—কাজ তো শেষ করলেই শেষ হয়ে যায়, আবার বাড়ালেই বাড়ে। আরো পাঁচ সাতদিন থাকতে পারলে অবশ্য ভালো হত, কিন্তু তোমার শরীর টিকছে না

এখানে। যা হতভাগা দেশ, একটু ওষুধ বিষুধের ব্যবস্থাও তো করা যায় না দরকার হলে। তা ছাড়া আমারও ভালো লাগছে না।

—বেশ তো, তোমার ভাল না লাগে, চলো।

—হুঁ, তাই ভাবছি। দেখি, কাল পরশুর মধ্যেই—

বাংলোর কম্পাউণ্ডের বাহিরে একটা সাইকেল দ্রুতগতিতে আসিয়া থামিল। নামিল ইউনিফর্ম-পরা একটি মূর্তি—পুলিশের লোক নিঃসন্দেহে। চোখে মুখে তাহার একটা জলন্ত ব্যস্ততা। কিন্তু বাংলোর বারান্দায় রাণীকে দেখিয়াই সে চমকিয়া থামিয়া গেল।

—কে আবার এল এই সময়? একটু বিশ্রাম করতেও এরা দেবে না নাকি? ভেতরে যাও তো রাণী। লোকগুলো জ্বালাতন করে মারলে একেবারে। নাঃ, কালই পালাতে হল এখান থেকে। ঝিণ্টুকে টানিয়া লইয়া রাণী ভিতরে চলিয়া গেল।

—পিয়ারী, ছাখ তো কে এসেছে। ডেকে নিয়ে আয়।

যিনি আসিলেন, তিনি পুলিশের দারোগা। সশ্রদ্ধভাবে একটা নমস্কার করিয়া সবিনয়ে বলিলেন, একটু জরুরি তাগিদেই আপনাকে বিরক্ত করতে হল স্যার, কিছু মনে করবেন না।

পলকের জন্য জমিরের আগ্নেয় দৃষ্টিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। নতুন প্রাণ, নতুন অন্তঃপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বলিষ্ঠ বুকের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কোন্ অনাগত কালের সুনিশ্চিত পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে যেন। আর দারোগার মুখে যা প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তা কি রাশীকৃত ক্লান্তি আর অবসাদ? যেন বোঝা টানিতে টানিতে নিজের সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে অনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যাক, পৃথিবী যেমন করিয়া চলিতেছে, তেমনি ভাবেই চলুক। তাহার জীবনটা যেন নিমিত্ত মাত্র—তাহার বেশি এতটুকু কোথাও কিছুই নাই। পুলিশের চাকুরী আর ফকিরিটা তাহার কাছে একই পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রয়োজন হইলেই সব ছাড়িয়া ছুঁড়িয়া কম্বল অবলম্বন করিতে পারে।

মনিমোহন বলিল, বলুন, কী দরকার?

অত্যন্ত সংকোচে দারোগা বসিলেন। ঘর্মাক্ত মলিন টুপিটা রাখিলেন টেবিলের উপরে—শ্রান্তস্বরে বলিলেন, আমি মামুদপুর থানার দারোগা।

—চা খাবেন এক পেয়ালা?

—না, থাঙ্কস স্যার। চা আমি খাই না।

—তা হলে কী বলছিলেন, বলুন।

দারোগা বড় করিয়া একটা নিশ্বাস টানিলেন—যেন বাতাস হইতে খানিক অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করিয়া লইতে চান। আবার জমিরের ছায়ামূর্তিটা মণিমোহনের চেতনার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। ইহারা দুইজন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমানে সমানেই তো? একজন নতুন জীবনের আলোকে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, আর একজনের সর্বাঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু শ্রান্তির দ্যোতনা। জয় হইবে কার?

দারোগা বলিলেন, আগস্ট্ মুভমেন্টের ব্যাপার আশা করি জানেন স্যার।

—জানব না কেন, ভারতবর্ষের মানুষ তো। কিন্তু কী হয়েছে, এখানে আবার নতুন করে একটা ওইরকম আন্দোলন দেখা দেবে নাকি?

—কী যে বলেন স্যার।—গর্বে গৌরবে দারোগা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের স্বর লাগিল: আমার এলাকায় ট্যাঁ ফোঁ করতে আমি দেব না, সেদিক দিয়ে শক্ত আছে বনোয়ারী দারোগা।

অকারণেই মণিমোহনের ঠোঁটের আগায় সূক্ষ্ম একটুকরা হাসি খেলিয়া গেল: তা হলে তো আর কথাই নেই; কিন্তু আপনার সমস্যাটা কোথায়?

—তাই বলছিলাম স্যার। আমার এলাকায় না হলেও আমাদের জেলাতে নানা রকম ট্রাবল্স হয়ে গেছে, আপনি বোধ হয় সবই জানেন। খবর পেয়েছি, ওখান থেকে জনকয়েক অ্যাবস্কণ্ডার এসে কালুপাড়ায় লুকিয়ে আছে। সদরে খবর দেওয়ার সময় নেই, তার আগেই হয়তো পালাবে। তাই আপনি একটু হেল্প করবেন, মানে লীড্ করবেন আমাদের। একজন রেস্পন্সিব্ল অফিসার যখন আছেন—

মণিমোহন অপ্রসন্ন হইয়া গেল। বড় ঝামেলা—অত্যন্ত বিরক্তিকর। তা ছাড়া এ তার কাজও নয়। বলিল, আপনারাই যান না। আমাকে আবার এর ভেতরে কেন?

বুঝতে পারছেন না স্যার। রিস্কি ব্যাপার তো—হয়তো ফায়ার করতে হবে। আপনি থাকলে আমার দায়িত্বটা কমে, সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়।

—আচ্ছা বেশ যাব আমি।—মণিমোহনের মুখের উপর দিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল: কখন যেতে চান?

—শুভস্য শীঘ্রম স্যার—এক সারি দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন দারোগা: একটা পাকা খবরের জন্য অপেক্ষা করে আছি। লোকও পাঠিয়েছি। যদি ডেফিনিট্ হতে পারি, তা হলে কাল রাত্রেই রেইড্ করব। আজ আমি সদরে একটা টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি—দেখি কী জবাব আসে। ওখান থেকে লোক পাই ভালোই, নইলে যা করবার আমাদেরই করতে হবে।

—তা হলে আগেই আমাকে খবর দেবেন।

—দেব স্যার, নিশ্চয় দেব। সে আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আর আপনার কোনো অসুবিধেই হবে না—সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই ঠিক করে রাখব আমরা। আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে থাকবেন, তা হলেই জোর পাবো আমরা—বুঝতে পারছেন না ?

—বুঝতে পারছি।—ক্লান্তি-তিক্ত মণিমোহন প্রসঙ্গটা থামাইয়া দিবার জন্যই যেন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, তাই হবে।

দারোগা টুপিটা তুলিয়া লইলেন টেবিলের উপর হইতে। এত উৎসাহ উদ্দীপনা সত্ত্বেও মণিমোহনের মনে হইল দারোগার চোখের কোণায় ক্লান্তির মসীরেখাটা যেন গাঢ়তর হইয়া পড়িতেছে।

—তা হলে আসি স্যার, নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—না, না, মনে করবার কী আছে। এ তো আপনার ডিউটি—আমারও। আচ্ছা, নমস্কার।

প্রত্যুত্তরে দারোগা আবার খানিকটা বিগলিত হাসি হাসিলেন, তারপরে সাইকেলে উঠিয়া বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার অনেক কাজ—এতটুকু সময় নাই।

রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া শূন্য চোখে নদী আর দিগন্তের দিকে তাকাইল মণিমোহন। আবার এক নতুন বিড়ম্বনা দেখা দিল—ফেরারী ধরিয়া বেড়াইতে হইবে তাহাকে। যাহারা দেশে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, যুদ্ধকালীন নিরাপত্তায় বিঘ্ন সঞ্চার করিয়াছে—অপরাধী তাহারা নিশ্চয়ই—শাস্তি তাহাদের পাইতেই হইবে।

কিন্তু ইহারা কাহারা ? পলকের জন্য তাহার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল : কী ধাতু দিয়া এই ছেলেগুলি তৈরি হইয়াছে ? ঘর থাকিতেও ঘর ভাঙিয়া মৃত্যু এবং রাজরোষের অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল কী কারণে এবং এই সর্বনাশা প্রেরণাই বা পাইল কোথা হইতে ?

মানস-দৃষ্টির সামনে ভাসিয়া গেল আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দী শিবির। রুগ্না পত্নীর মৃত্যু-শয্যার পাশে ধ্যান-স্তিমিত নেত্র মেলিয়া বসিয়া আছে Half naked Fakir of India—তাহার মুখের উপরে প্রসন্ন সূর্যালোক স্বর্গ-কিরণের মতো বিচ্ছুরিত হইতেছে।

৬

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলরাম ঘরে ফিরিলেন। কিছুই বোঝা যাইতেছে না—কেমন একটা অনিশ্চয়তায় ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে মন। কেন এই যুদ্ধ? মানুষ এমনভাবে কিসের জন্য লড়াই করিয়া মরে? বোমা আর কামানের মুখে ঘর বাড়ি উড়াইয়া দেয়, রক্তে ভাসাইয়া দেয় মাটি? দেশ আর গ্রাম শ্মশান হইয়া যায়। কীই বা হয় যুদ্ধে একটা বিরাট জয়লাভ করিয়া? যে জিতিল, মড়ার হাড়ের উপরে সিংহাসন বসাইয়া এমন কোন্ অপূর্ব স্বর্গসুখটা সে ভোগ করে।

কে যুদ্ধ চায়? বলরাম চান না—মণিমোহন চায় না, চর ইস্‌মাইলের কেউ চায় না, এমন কি নির্বোধ রাধানাথ পর্যন্ত চায় না। তবু কেন এই যুদ্ধ?

সমস্ত ব্যাপারটাকে সমাধানহীন একটা বিরাট গোলকধাঁধার মতো মনে হয় তাঁহার! কিছুদিন আগে এই প্রশ্নটাই তিনি করিয়াছিলেন মণিমোহনকে।

অত্যন্ত করুণাভরে মণিমোহন হাসিয়াছিল। অনেকগুলি কথাই সে বলিয়াছিল—উপনিবেশ, বাণিজ্য-বিস্তার, আর্থিক একচেটিয়া সুবিধা—বলশেভিক বিনাশ, গণতন্ত্রের প্রসার ও রক্ষা এবং আরো অনেক কঠিন কঠিন ব্যাপার!

বলা বাহুল্য, বলরাম কিছু বুঝিতে পারেন নাই। চরক-সংহিতা, ভেষজ-বিজ্ঞান, নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা অথবা নিদান-তত্ত্বে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ছাগলাদ্য ঘৃত তিনি নির্ভুল-ভাবে তৈয়ারী করিতে পারেন, সহস্রবার পারদকে জারিত করিয়া লইবার প্রক্রিয়া তাঁহার জানা আছে, রস-সিন্দুর আর মকরধ্বজের তফাৎটা বলিয়া দিতে পারেন একবার চোখ দিয়া দেখা মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ-বিজ্ঞান নিদান-তত্ত্বের চাইতেও কঠিন বলিয়া তাঁহার মনে হইল।—তা ছাড়া, মণিমোহন হাসিয়া শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিল, যুদ্ধটা হচ্ছে একটা জৈবিক প্রয়োজনে—দার্শনিকদের এই মত।

বলরাম হাঁ করিয়াই ছিলেন। বলিলেন, তাই নাকি? তা বেশ। কিন্তু যারা যুদ্ধ করছে না তাদের এত কষ্ট দেওয়া কেন। ভাত নেই, কাপড় নেই—

—তারও দরকার আছে। একজন ডাচ্ দার্শনিক—ডাচ্ বোঝেন, ওলন্দাজ?

বলরাম বোঝেন না। তবু মাথা নাড়িতে হইল।

—ষ্টিন্‌মেৎস্ তাঁর নাম। তাঁর বই আছে একটা—ফিলসপি অব্ ওয়ার! তাতে তিনি বলেছেন, যুদ্ধের সময় অসামরিকদের খুব বেশি করে কষ্ট দাও; খেতে দিও না—শুধু চোখ দুটো রেখে দাও জল ফেলবার জন্যে। কেন, জানেন?

—কেন ?

—যাতে তারা মনে করতে পারে যে তাদের এই দুর্গতির জন্যে শত্রুরাই দায়ী। ফলে শত্রুপক্ষের প্রতি তাদের মন বিদ্বেষ ও হিংসায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আর তা হলেই যুদ্ধ জয় অনিবার্য। মুসোলিনীও এই কথাই বলেছেন। বুঝলেন তো ?

বলরাম বুঝিলেন না। বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও লাভ নাই। যাহারা পণ্ডিত, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব অনুকূল নয়। কোনো একটা জিনিসকে তাহারা সহজ করিয়া বুঝাইতে পারে না। কোথা হইতে শক্ত শক্ত ব্যাপার আমদানী করিয়া আগাগোড়া সব কিছুকে দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য করিয়া তোলে। যুদ্ধ কেন হয়, তাহার পিছনে এই যে বিরাট তত্ত্ব আর তথ্যের অরণ্য লুকাইয়া আছে একথা কোনদিন বলরামের কল্পনাতেই আসিয়াছিল নাকি !

কিন্তু সেই হইতে মণিমোহনকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা তিনি ছাড়িয়াই দিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যে কাগজটা তিনি পড়েন, তাহার পাতায় পাতায় প্রতিদিন দেখা দেয় অস্পষ্ট আর রহস্যময় রাশীকৃত খবর। পৃথিবীতে এত জায়গা, এত বিচিত্ররকমের নাম আছে, এও কি কোনদিন কল্পনায় আসিয়াছিল। কোনো-কোনো নাম এমন উৎকট যে উচ্চারণ করিতে গেলে মানুষের আক্কেল-দাঁত অবধি খট খট শব্দে নড়িয়া ওঠে। অথচ এই দুইটা বছরে বিরাট দুনিয়ার ভূগোল বলরামের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান-ভাণ্ডার যে পুরাদমেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবে কে ?

কিন্তু কী হবে ! জ্ঞান বাড়িতেছে বাড়ুক, দৈনন্দিন সমস্যার কোনো সমাধানই তো চোখে পড়িতেছে না। যুদ্ধটা যেন বাধিয়াছে প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিসপত্রের সঙ্গে। কামানে বন্দুকে মানুষ মরিতেছে, মরিতেছে চাল, ডাল, নুন, আটা, তেল, কয়লা আর কুইনিন।

ভাবিয়া বলরাম আর থই পান না। চুলকাইতে চুলকাইতে টাকের উপরে খানিকটা রক্তপাতই করিয়া ফেলিলেন তিনি। অত্যন্ত বিব্রত আর বিপন্ন মুখে তাকিয়াটায় তিনি ঠেসান দিয়া বসিলেন। দেওয়ালের গায়ে কাঁচ-ভাঙা ঘড়িটা স্তব্ধ হইয়া আছে—একটা বড়সড়ো টিকটিকি পোকার সন্ধানে পেণ্ডুলামটার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই সেটা যেন কুম্ভকর্ণের মতো অকস্মাৎ যুগনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। অত্যন্ত বিরক্তভাবে মিনিটখানেক কটাকট্ শব্দ করিয়া এলোমেলো খানিকটা সময় জানাইয়া দিয়া আবার অনন্ত নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল ঘড়িটা।

অন্যমনস্কভাবে সেদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন বলরাম। বড় একটা হাই তুলিয়া

তাকিয়া হইতে পিঠ খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিলেন। যেন কী একটা ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া হাঁক দিলেন, রাধানাথ?

—যাই বাবু—বাহির হইতে সাড়া দিয়া রাধানাথ প্রবেশ করিল। বৃহদাকার একটা কাদামাখা মাগুর মাছ তাহার হাতের মধ্যে ছট্‌ফট্ করিতেছে। মুখটা বিকৃত করিয়া কহিল উঃ, কাঁটা দিয়েছে শালার মাছ।

—মাছ ধরছিলি বুঝি? বাঃ, বেশ, বেশ।—বলরাম খুশি হইয়া উঠিলেন :—খুব বড় মাগুর মাছ তো। পেলি কোথায় রে?

রাধানাথ বলিল, কাঁঠাল গাছে।

—কাঁঠাল গাছে!

—তা ছাড়া আবার কি? শালারা কি এমন জাত যে ধরা দেবার জন্যে হাঁ করে বসে আছে? এ ঘরের মাছ।

দপ করিয়া বলরামের উৎসাহটা নিবিয়া গেল।

—ঘরের মাছ? তা হলে বাইরে গেলো কেমন করে?

—তা আমি কি করব বাবু? রাধানাথ নিজেকে সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইল একটা : আমার কী দোষ? পরশু দিন এককুড়ি কিনে হাঁড়িতে জীইয়ে রেখেছিলাম, আজ সকালে উঠে দেখি দুটো না তিনটে রয়েছে। হাঁড়ীর ঢাকা উল্‌টে ফেলে রাতারাতি চম্পট দিয়েছে সব। তারই একটাকে অনেক খুঁজে পেতে ধরে আনলাম।

—বটে, বটে! রোষে বলরাম বিকচ্ছ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন : মাছগুলো আকাশ থেকে পড়ে, তাই না? পয়সা দিয়ে ওগুলোকে কিনতে হয় না, না? দেখছি তুই ব্যাটাই আমাকে ফতুর করবি।

—তা কি হবে! বক বক করলে তো মাছ আসবে না। নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে প্রস্থানের উপক্রম করিল রাধানাথ।

যাচ্ছিস্ কোথায়? সর্বনাশ যা করবার তা তো করেছিস, এখন এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা হতভাগা।

—গালমন্দ করবেন না, সেজে এনে দিচ্ছি—গজেন্দ্র-গমনে রাধানাথ বাহির হইয়া গেল। পাজী, বদমাস। নিজের মনে গালিবর্ষণ করিয়া বলরাম ক্রোধটাকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনো লাভ নাই ওকে গালমন্দ করিয়া। চাকর বাকর লইয়া ঘর সংসার করিতে গেলে এ সমস্ত ক্ষতি অপরিহার্য। কোনো জিনিষের জন্য দরদ নাই, গৃহস্থের জন্য মায়া নাই এতটুকুও। প্রাণ ভরিয়া চুরি-চামারি করিতেছে নিশ্চয়।

তবু রাধানাথ না থাকার অবস্থাটাও কল্পনা করা চলে না। বিশ বছর ধরিয়া

ওরই সঙ্গে সংসার করিয়া আসিতেছেন, মানাইয়াও লইয়াছেন একরকম। মুখে মুখে উত্তর করে—ওই ওর দোষ ; তবু বলরামের ধাতটা একরকম চিনিয়াছে, যেমন করিয়া হোক চালাইয়া লয়। মাঝখানে শুধু ছেদ পড়িয়াছিল দিন কয়েক, শুধু কয়েকটা মাস পারিবারিক জীবনের একটা স্নেহ-মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন তিনি। তার পরেই—

বুকের মধ্যে একটা ব্যথার চমক টনটন করিয়া উঠিল। শুধু মানসিক নয়—শারীরিকভাবেও কয়েক বছর ধরিয়া এই একটা নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। একি আসন্ন মৃত্যুর সংকেত? বয়স বাড়িয়াছে, তাই কি অন্তিমের আহ্বান আসিয়া বুকের মধ্যে তাহার দাবীটাকে জানাইয়া দিয়া যায়?

—বাবু তামাক।

—রেখে যা।

ফরশীতে তামাক পুড়িতেছে। নলটা মুখে করিয়া বলরাম ভাবিতে লাগিলেন একটা কথা। এতদিন ভাবিয়াও সে কথার কোনো উত্তর মেলে নাই তাঁহার কাছে। কেন চলিয়া গেল মুক্তো? সজ্ঞানে কি অপরাধ তিনি করিয়াছিলেন যাহার জন্য সমাজ-ধর্ম সব ছাড়িয়া মুক্তো এমন একটা অস্বাভাবিক জীবনকে বাছিয়া লইল? জাতি ছাড়িল, সমাজ ছাড়িল, বিগত-যৌবন নূরুল গাজীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল? অপরাধ তিনি হয়তো করিয়াছিলেন, কিন্তু সেজন্য কোনো দায়িত্বই কি মুক্তোর ছিল না? তা ছাড়া সে অপরাধের এমনি করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত হইল? মুক্তোই কি সুখী হইতে পারিয়াছে?

ডি-সিল্‌ভার ছেলে ডি-ক্রুজা সংকুচিত হইয়া ঘরে ঢুকিল। ভাবনার জালটা ছিঁড়িয়া বলরাম তাহার দিকে তাকাইলেন।

—কি রে, কী খবর?

—আজ বাবাকে দেখতে যাবেন না একবার?

—কেন, কী হয়েছে আবার! জ্বর ছাড়ে নি?

ম্লানমুখে মাথা নাড়িয়া ক্রুজা বলিল, না।

ফরশীর নল দিয়া পেশাদারী ভঙ্গিতে খানিকটা ধূমোদ্গীরণ করিলেন বলরাম: জ্বর ছাড়ল না, তাই তো। তা পাঁচনটা খাইয়েছিলি ঠিক মতো?

—হুঁ।

—আর পথ্য? সাবু?

—না, সাবু পাইনি।

—তা তো পাবিই না—নিরীহ ডি-ক্রুজার উপরে বলরাম সমস্ত ক্রোধ এবং

বিরক্তি একেবারে বর্ষণ করিয়া দিলেন : বাপের জন্য এতটুকু দরদ বা মায়া আছে তোর! মরে যাবে নাকি লোকটা?

—কী করব, কোথাও তো পাচ্ছি না?

—যা, আবার খোঁজ গিয়ে। পথ্য নেই, কিছু নেই, খালি খালি ওষুধেই কারো জ্বর সারে নাকি কখনো? যা, আমি যাবো বিকেল বেলায়। আর সাবধান, মুরগীর ঝোলটোল খাওয়াসনি, তা হলে বাপ কিন্তু সোজা মেরীর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছুবে, এই বলে রাখলাম।

*   *   *   *

নৌকাটা থামিতেই গঞ্জালেস্ তীরে নামিয়া পড়িল। তারপর গ্রামের দিকে আগাইতে গিয়াই সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

এই তো চর ইস্মাইল। দশ বছর আগে সে যাহাকে পেছনে ফেলিয়া গিয়াছিল—একটা তীব্র অপমান-বোধ এবং প্রতিশোধের কঠিন সংকল্প লইয়া। মরা রক্তে সেদিন বিদ্রোহী প্রাণের বান ডাকিয়া গিয়াছিল। পর্তুগীজদের মেয়েকে, তাহার ভাবী স্ত্রীকে কতকগুলা বর্মী আসিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল! কিছু করিতে পারে নাই গঞ্জালেস্, শুধু পাথরের মূর্তির মতো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আর চিত্র করা পুতুলের মতো দুইটা বিস্ময় বিহ্বল চোখ মেলিয়া শুনিয়াছিল সেই অসহ্য লজ্জা আর অপমান-মেশানো পরাজয়ের কাহিনী।

ডি-সুজা পাগলা হইয়া গিয়াছিল! তাহার ঘোলা চোখ যেন রক্ত দিয়া মাখানো, বন্য জন্তুর মতো দুর্গন্ধ নিশ্বাস ফেলিতেছে। অকারণে হা হা করিয়া উঠিয়াছিল খানিকটা। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এর শোধ দিতে পারবে, লিসিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে তুমি?

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া শরীরের মধ্য দিয়া বিদ্যুতের তীব্র চমক খেলা করিয়া গিয়াছিল গঞ্জালেসের। এক চুমুক বিষাক্ত হুইস্কি পান করিলে যেমনটা হয় ঠিক তেমনই। মনে পড়িয়া গিয়াছিল দিগ্বিজয়ী পূর্ব-পুরুষদের কথা। যাহাদের পায়ের নীচে হাজার বুনো ঘোড়ার মতো সমুদ্র গর্জাইয়া উঠিতেছে—নোনা ফেনার রাশি গড়াইতেছে তাহাদের মুখ হইতে; আর সেই ঘোড়ার যাহারা আসোয়ার, তাহাদের মাথায় কালো চামড়ার টুপি, তাহাদের চোখের দৃষ্টি শকুনের চাইতেও তীক্ষ্ণ এবং দূরগামী। বজ্র-কঠিন হাতের মধ্যে ক্ষুধার্ত বন্দুক শিকারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কবে দূর সীমান্তরেখায় বকের মতো পালের সারি উড়াইয়া বাণিজ্য বহর দেখা দিবে। তাহাদের জাহাজের ডেকের উপরে লোহার কামান গলা

বাড়াইয়া আছে—বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল তাহাদের পালে বিকট নরমুণ্ড আর অস্থিচিহ্ন।

ঠিক তাহাদের মতোই সংকল্প লইয়া, মনের মধ্যে তাহাদের মতোই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া গঞ্জালেস্ ভাসিয়া পড়িল লিসির সন্ধানে। চট্টগ্রাম, আরাকান, বর্মা। কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীতে এত অসংখ্য মানুষ, এত অসম্ভব কোলাহল আর কলরব ; যে একবার হারাইয়া যায় ডাকিলে সে আর শুনিতে পায় না —কলরবমুখর জনতায় লিসিও হারাইয়া গিয়াছে।

চেষ্টা সার্থক হয় নাই। আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছিল ডি-সুজা। কিন্তু গঞ্জালেসের মনের মধ্যে যে আঘাত বাজিয়াছিল সেটাকে তো সে ভুলিতে পারিল না। জীবন যে পথে চলিতেছিল, তাহাতে সুর কাটিয়া গেছে। কী যেন নাই, কিসের অভাবে নিজেকে একান্তভাবে ব্যর্থ আর অভিশপ্ত বলিয়া মনে হয়। সেই মানসিক অস্বস্তিটার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্যই যেন গঞ্জালেস্ প্রাণপণে মদ ধরিল—একান্তভাবে তলাইয়া গেল উদ্দাম একটা মত্ততার মধ্যে। তার পরের দিনগুলি সব অস্পষ্ট—কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না—যেন এক সারি ছায়ামূর্তির মিছিল চলিয়াছে। যুদ্ধ আসিল, বোমা পড়িল, গঞ্জালেস্ চোখের সামনেই দেখিল রক্ত আর আগুনের বীভৎস লীলা। তারপরে হঠাৎ কী যে হইয়া গেল, কথা নাই, বার্তা নাই, হঠাৎ একদিন নৌকো ভাসাইয়া গঞ্জালেস্ আসিয়া দর্শন দিল চর ইস্মাইলে।

কিন্তু চর ইস্মাইলে কেন আসিল সে? দশ বছর পরে দিগন্ত বিস্তীর্ণ নদীর পঙ্কস্তরের উপর দাঁড়াইয়া গঞ্জালেস্ এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল : কোন্ খেয়ালে সে দূর সমুদ্রের মোহানার মুখে এই অখ্যাত-অজ্ঞাত দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল? অথচ যদি সে কলিকাতায় যাইত, তাহা হইলে একটা আশা ভরসা ছিল। এখানে আশ্রয় পাইবে কোথায়, চলিবেই বা কেমন করিয়া? আর সব চাইতে দরকারী কথা এই : হুইস্কির সদাব্রত এখানে মিলিবে কোথা হইতে?

এখানে আসিবার কী দরকার ছিল তাহার? লিসির স্মৃতি? সে স্মৃতি কী এতই মনোরম—যে জন্যে এখনো না আসিলে রাত্রে তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছিল? আসল কথা—সেই রাত্রের বিভীষিকা আর নেশার মাদকতা একটা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহার স্নায়ুতে, তাই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই সে সোজা চর ইস্মাইলের উদ্দেশ্যেই নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এখন কোথায় যাইবে সে, কী করিবে?

গঞ্জালেস্ নিজের মনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিস্ দিতে লাগিল।

এমন সময় তাহার দেখা হইল ডি-ক্রুজার সঙ্গে।

চোখের দৃষ্টি সংকুচিত করিয়া গঞ্জালেস্ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিল ডি-ক্রুজাকে। তারপর ডাকিল, এই ছোকরা, শুনে যা, আয় ইদিকে।

বিচিত্র সম্ভাষণে ক্রুজা চমকিয়া দাঁড়াইল। মুখের উপরে বিদ্রোহ ঘনাইয়া তুলিয়া বলিল, আমাকে ডাকছ?

—তা ছাড়া কাকে ডাকব? ওই সুপুরীগাছটাকে নাকি?

—কেন, কী দরকার?

—তোদের বাড়ী কোথায়?

—জানি না—উদ্ধতভাবে ক্রুজা ফিরিবার উপক্রম করিল।

—এই, দাঁড়া—থপ করিয়া একটা থ.বা মারিয়া তাহার কাঁধটা চাপিয়া ধরিল গঞ্জলেস্ঃ বেশি বথামি করিস্ তো এক চাঁটিতে চোয়াল উড়িয়ে দেব। চিনিস আমাকে?

ডি-ক্রুজা চেনে না। কিন্তু গঞ্জালেসের আরক্ত চোখ এবং প্রকাণ্ড একখানা হাতের স্পর্শে চিনিতে তাহার বেশিক্ষণ সময় লাগিল না। ক্ষীণস্বরে বলিল, কী করতে হবে?

—আমি তোর মামা, বুঝলি? তোদের বাড়ীতে বেড়াতে এলাম।

ক্রুজা হাঁ করিয়া রইল।

—অমন করে তাকিয়ে আছিস কি? নে, নৌকা থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে ফেল সব, তারপর নিয়ে চল তোদের বাড়িতে। ভয় নেই, তুইও বাদ পড়বি না।

পকেট হইতে একটা চকচকে নতুন টাকা বাহির করিল গঞ্জালেস্। আঙুলের উপর সেটাকে বার কয়েক নাচাইয়া টং টং করিয়া বাজাইল। বলিল, দেখছিস্?

ক্রুজা কী ভাবিল কে জানে, তারপর নিঃশব্দে নৌকার দিকে অগ্রসর হইল।

দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে নদীর বিশাল জলরাশি তখন জ্বলিতেছে। আর তেমনি একটা উন্মত্ততার খরদাহ জ্বলিতেছিল গঞ্জালেসের চোখেও।

সাত

দুপুরবেলা আকাশ কালো করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল।

নদীর জলে মেঘের ছায়া বিকীর্ণ করিয়া, তাল-নারিকেলের বীথিকে ধারা-বর্ষণে স্নিগ্ধ করিয়া এবং তেঁতুলিয়ার কলতরঙ্গে উদ্দাম জাগাইয়া ঘণ্টা দু-তিন বেশ এক পশলা ঝরিয়া গেল। কিন্তু আকাশের কান্না থামিল না—থাকিয়া থাকিয়া এক একটা দমকা বহিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে ঝরিতে লাগিল ঝির-ঝির ঝির—

সন্ধ্যা ঘনাইতেছে অসময়ে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া বিহ্বল একদল কাক

নারিকেলপুঞ্জের ওপর তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে গোল হইয়া উড়িতেছে—বাতাসের ঝাপ্‌টায় ওদের কারো বাচ্চা নীচে পড়িয়া গেছে বোধ হয়। তাণ্ডব-তালে ব্যাঙের কনসার্ট বাজিতেছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত কলরব কোলাহলকে যেমন করিয়া হোক ছাপাইয়া উঠিবার সংকল্প করিয়াছে ওরা।

কর্মহীন অলস দিন। মাসটা যদিও আষাঢ় নয়—তবু এই আশ্চর্য জগৎ, সীমাহীন অন্ধ আকাশ, বিশৃঙ্খল একটা বিরাট নদী, সব মিলাইয়া নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ নির্বাসিত মনে হয়। কবিরা কল্পনা করিতে পারে শাশ্বত বিরহের স্মৃতি-মধুর একটা মীড় মূর্ছনা যেন। রাণী তো কাছেই, তবু ভাবিতে ভালো লাগে ঃ চঞ্চল ভ্রমরের মতো দুটি চোখের উৎসুক দৃষ্টি দিগন্তে মেলিয়া দিয়া কে দেখিতেছে নবঘন শ্যাম-শোভাকে—কোনো রত্নপুরীতে কে যেন 'মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা—' কিন্তু 'তন্ত্রীমার্দ্রা নয়ন সলিলৈঃ—'। কালিদাস কখনো চর ইস্‌মাইলে আসিবার সুযোগ পান নাই, যদি আসিতেন তাহা হইলে রামগিরির চাইতে এটাকে ঢের বেশি অনুকূল পরিবেশ বলিয়াই তাঁহার মনে হইত। কুর্চিফুল নাই-ই থাকিল, কিন্তু নাম না-জানা যে মিষ্টি একটা বুনো ফুলের গন্ধ বাতাসে আসিতেছে—

কোথায় রামগিরি—কোথায় কুর্চি—কোথায় বা 'প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক বনিতা!' তৈলাক্ত হ্যাট, বিবর্ণ ওয়াটারপ্রুফ্‌ এবং জুতার ওপরে একরাশ কাদা লইয়া মামুদপুর থানার দারোগার ঘটনাস্থলে প্রবেশ। অলকা হইতে যক্ষ নয়, পাতাল হইতে রক্ষ আসিয়া দর্শন দান করিল।

মণিমোহন বলিল, বসুন।

—না স্যার, বসব না। অনেক কাজ, বসবার সময় হবে না। শুধু আপনাকে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতে এলাম।

—কোন্ কথাটা?

—সেই রেইডের ব্যাপারটা।

—ওঃ—মণিমোহনের মনটা চমকাইয়া উঠিল। আর কি দিন ছিল না। আকাশ বাতাস ঘিরিয়া এখন স্বপ্ন ঘনাইতেছিল, এখন সমস্ত শিরা-গ্রন্থিকে শিথিল করিয়া দিয়া আশ্চর্য একটা অনুভূতির মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে তলাইয়া যাইতে ভালো লাগিতেছিল—বাতাসে নাম না-জানা ফুলের মৃদু মধুর অলস সুরভির মতো মনে পড়িতেছিল কাকে? এম্‌নি একটা সন্ধ্যায় দুটি বাহুর নির্মম পেষণে কোমল বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল কে, কার সুগন্ধি নিশ্বাস মুখের ওপরে ছড়াইয়া পড়িয়া নেশায় যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল?

দারোগা বলিলেন, জল বৃষ্টি, আপনার কষ্টই হবে স্যার। কিন্তু কী করা যায়—এর চাইতে ভালো দিন আর হবে না।

—হুঁ।

—অ্যাবস্‌কণ্ডার, ঠিক তো নেই, কখন কোন দিকে রাতারাতি সটকে পড়ে। আমরা অবশ্যি কড়া নজর রাখছি, কিন্তু যা দেশ—বোঝেনই তো সব। কোনো নদীনালা দিয়ে এককার ছটকে বেরুতে পারলেই গেল। তারপর সমুদ্রের মোহনায় কে কাকে খুঁজে বেড়াবে বলুন। এ তো আর ডিষ্ট্রিক্ট্‌ বোর্ডের রাস্তা কিংবা ই বি আরের রেলগাড়ী নয় যে চারিদিকে নজর দিলেই—

—বুঝেছি। কথাটাকে মাঝখানেই মণিমোহন থামাইয়া দিল। হঠাৎ আশ্চর্যভাবে মনে পড়িল ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতার উক্তি : আমার দেহ শুধু শহর নয়, আমার দেহ শুধু নাগরিক সমষ্টিও নয় ; ভারতবর্ষের প্রাণ ছড়াইয়া আছে অজ্ঞাত অখ্যাত অগণ্য পল্লী জনপদের প্রান্তে প্রান্তে, সেখান হইতে একদিন বৃহত্তর মহাজীবনের উদ্বেল তরঙ্গ আসিয়া ভাসাইয়া দিবে এই—

চকিতে মণিমোহন অনুভব করিল একটা জিনিস—যা এতদিন সে ভাবিতেও পারে নাই। চর ইস্‌মাইল শুধুই কি একটা পাণ্ডববর্জিত দেশ—ভদ্রলোকের কল্পনার বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার ন্যায় আশ্চর্য রহস্যপুরী ? অথবা বিরাট এই বাংলা দেশের একটা অলক্ষ্য প্রাণকেন্দ্র—যেখান হইতে একদিন উজান স্রোত বহিয়া জীবনে এবং চিন্তায়, রাষ্ট্রে এবং সভ্যতায় নতুন প্লাবন বহাইয়া দিবে ? এতদিন তো শহরই দুহাতে দান করিয়া আসিতেছে, এবার কি পল্লীর সেই ঋণ পরিশোধের পালা দেখা দিল ?

নিঃশব্দে একটা সিগারেট বাহির করিয়া মণিমোহন ধরাইল, ধোঁয়ার জাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া চলিল, মেঘম্লান আকাশের দিকে।

—তা হলে আজকেই ঠিক ?

—আজকেই।

—শহরের কোনো খবর পেলেন ?

—এখনো পাই নি। টেলিগ্রাম অফিস সেই ওপারে—মানে একবেলার পথ। তা ছাড়া যুদ্ধের চাপে লাইন এমন এন্‌গেজড্‌ যে, কখন গিয়ে তার পৌঁছুবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। অথচ আর দেরি করাও ঠিক নয়—কখন যে ফসকে হাত থেকে পিছলে যাবে বলা যায় না। তাই বলছিলাম আর দেরী না করে যা পারি আমরাই করে ফেলি।

পিয়ারী আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল। বর্ষার দিনে রাণী নিশ্চয় খিঁচুড়ির

বন্দোবস্ত করিয়াছে—পেঁয়াজ আর আধসেদ্ধ মুগের ডালের একটা রোমাঞ্চকর গন্ধ আসিতেছে। আর টেবিলের ওপরে রাখা দারোগার তৈল-মলিন টুপিটা হইতে ভাসিতেছে ঘামের দুর্গন্ধ। লণ্ঠনের আলোয় দারোগার চোখের নীচে অত্যন্ত গাঢ় একটা কালিমার রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—ক্লান্ত অবসাদ, জোয়াল টানিয়া চলা নির্বোধ পশু বিশেষের অবসন্ন প্রতিচ্ছবি।

মণিমোহন কহিল, ধরতে পারলে আপনার নিশ্চয় কিছু আশা আছে।

—তা তো আছেই।—অত্যন্ত খুশি হইবার চেষ্টা করিয়া দারোগা হাসিলেন: ইন্‌স্‌পেক্টরী তাহলে এবার হয়ে-যেতে পারে স্যার। আর সাত আট বছরের মধ্যেই তো রিটায়ার করতে হবে, এখনো যদি চান্স না পাই তা হলে আর—

—অনেক দিন সার্ভিস তো হয়ে গেল আপনার, এত দিন চান্স পেলেন না কেন?

—কপাল স্যার, কপাল। দারোগা ললাটে করাঘাত করিলেন: কত জুনিয়ার চোখের সামনে দিয়ে টপাটপ্ টপকে গেল, আমি বসে বসে দেখলাম। কবার তো নমিনেশনও গেল কিন্তু ধোপে টিকল না। আসল ব্যাপার কী জানেন? হিন্দুর আজকাল আর কোনো আশা ভরসা নেই—পীরের দরগায় জাত-জন্ম জবাই দিতে না পারলে সরকারী চাকরীতে সুবিধে হবে না। পাকিস্তান পাকিস্তান কী ওরা বলছে স্যার, পাকিস্তান তো হয়েই আছে অনেককাল আগে।

মণিমোহন হাসিল: দেখুন, এই ফাঁকে যদি কিছু করে নিতে পারেন।

—সেইজন্যেই তো এমন করে লেগে পড়েছি স্যার। ঠেলে দিলে ক্রিমিন্যাল এলাকায়, ভাবলাম প্রচুর স্কোপ্ পাব—গ্যাংকে গ্যাং ধরে একটা পাকাপোক্ত রেকর্ড করে রাখব। কিন্তু এসে যা নমুনা দেখলাম তাতে গ্যাং তো দূরের কথা, এখন পৈতৃক প্রাণটা টিকিয়ে রাখতে পারলে হয়। এগুলো তো মানুষ নয়, জানোয়ার।

সত্যিই ইহারা মানুষ নয়। মণিমোহনের মনে হইল: মানুষ নয় বলিয়াই এখনো বাঁচিয়া আছে। পঞ্চাশ-ইঞ্চি ধুতির কোঁচা পায়ে জড়াইয়া, ট্রামে বাসে মারামারি করিয়া এবং ডায়েবিটিজ ও ডিস্‌পেপসিয়ার নাগপাশে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়া যাহারা অতি-মানুষ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের চাইতে ইহারা একটু আলাদা বই কি। হিংস্র উন্মত্ত যে পশুশক্তি নিজের প্রচণ্ড বলশালিতায় সমস্ত পৃথিবীর উপর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারে—ইহারা তাহারই দলে। ধুতি চাদরে বিড়ম্বিত মানুষ যেখানে হিসাব নিকাশ চুকাইয়া তুলসীর মালা হাতে করিয়া পারত্রিক নিষ্কৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—তখন দেহে মনে অমিত পাশব-শক্তি

সঞ্চয় করিয়া ইহারা জীবন অভিযানের স্বপ্ন দেখিতেছে। জমিরের চোখের আগুনের সেই দীপ্তিটা মণিমোহন কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

দারোগা কহিলেন, যাক—ও নিয়ে আর দুঃখ করে কী হবে। আমিও বামুন স্যার, শাস্ত্র বলে পাতা চাপা কপাল। পাতা উড়েই যাবে একদিন—কে জানে এবারেই সে সুযোগটা পেয়ে গেলাম কিনা।

—পাবেন বলেই তো মনে হচ্ছে।

পুলকিত হইয়া ব্রাহ্মণ দারোগা দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন: আপনাদের আশীর্বাদ। কিন্তু আজকে রাত্রেই স্যার। আন্দাজ নটা সাড়ে নটা আপনাদের নেবার জন্যে নৌকো পাঠিয়ে দেব। ভালো পান্‌সী নৌকো—আরাম করে যেতে পারবেন, পুরু গদীও দিয়ে দেব।

—তাই দেবেন।

দারোগা উঠিয়া পড়িলেন: নমস্কার স্যার! আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—

—সে তো দিলেনই, সেজন্যে আর বিনয় করে কী করবেন। আচ্ছা, আসুন আপনি তা হলে—

থতমত খাইয়া জুতার তলায় কাদার ছপাছপ্ শব্দ তুলিয়া দারোগা বাহির হইয়া গেলেন।

বাহিরে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি ঝরিয়া চলিয়াছে; ভিজা মাটির গন্ধ বহিয়া 'বায়ু বহত পূরবৈঁয়া।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িতেছে কাজরী গানের একটা পংক্তি: "আয়ি রে গগন মে কারী বদরিয়া—"

কিন্তু কোথায় বা কাজরী গান, কোথায় নীপ-শাখায় দোলনা দুলিতেছে—কদমের রেণু উড়িয়া পড়িতেছে। দুলিতে দুলিতে অধরে অধর মিশিতেছে—মৃদঙ্গ আর খঞ্জনীতে বাজিতেছে মল্লারের সুর। স্বপ্ন নয়—স্বপ্নের চাইতেও দূরে—ভাবনা-কামনা-কল্পনার অতীত জগতে।

নিশীথের চর ইস্‌মাইল। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নামিয়াছে। এপারে সুপারি নারিকেল-বীথিতে অশ্রান্ত উদ্দাম সঙ্গীত—ওদিকে নদীতে প্রখর কলোল্লাস। কূলভাঙা জোয়ার আসিয়াছে বোধ হয়।

রাত্রি বাড়িতেছে। যাহাকে (অথবা যাহাদের) ধরিবার জন্য আজ রাত্রিতে তাহাদের অভিযান—সে এখন কী করিতেছে? হয় তো অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমেষে চোখ মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে। শৃঙ্খলিত সমস্ত দেশের বেদনা আর জমাট অশ্রু তাহার দৃষ্টির সামনে এমনি করিয়া নিজেকে মেলিয়া ধরিয়াছে বর্ষাকরুণ তমস্বিনী রাত্রির মতো। থাকিয়া থাকিয়া খর-বিদ্যুতের চমকে তাহার দৃষ্টির

সামনে ফুটিয়া উঠিতেছে—ভাবী স্বাধীন ভারতবর্ষের একটা অনাগত রূপ—জালাময়, আগ্নেয়।

আর এম্‌নি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে কোথায়? আগা খাঁ প্রাসাদের চারদিকে কি বর্ষার মল্লার গানে নিপীড়িত দেশের কান্না বাজিয়া উঠিতেছে? ভারতের অর্ধনগ্ন মৌনব্রতী ফকিরও কি কালো আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে—এই রাত্রি সত্য নয়, এই অন্ধকারের পরপারে—

ঘর্‌-র্‌-র্‌—

রূঢ় কর্কশ শব্দ। মাথার উপর দিয়া এই বর্ষা রাত্রেও বিমান উড়িয়া চলিয়াছে—আসমুদ্র হিমালয় অতিক্রম করিয়া—অতলান্তিক, প্রশান্ত মহাসাগর, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বাধা-বন্ধনকে অসঙ্কোচে পার হইয়া বিজয়ের অভিযানে? ভারতবর্ষের অশ্রু-ভারাচ্ছন্ন আকাশ কি সে গতিকে বাধা দিতে পারে?

বিদ্যুতের আগুনে দিগ্‌দিগন্ত চকিতে যেন জলিয়া গেল। শুধু অশ্রুভার নয় বজ্রও বটে। একদিন জলন্ত অগ্নি-বর্ষণে সেও নিজের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবে। কিন্তু সে কবে! এই সরকারী চাকরী, এই নিশ্চিন্ত জীবন—মনিমোহনের পক্ষেও কি সে দিনটি একান্তই বাঞ্ছনীয়?

লঘু পায়ের শব্দ। রাণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—খিচুড়ি হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

—না, শুয়ে পড়া চলবে না রাণু। বেরোতে হবে।

—বেরোতে হবে? এই রাত্তিরে কোথায়?

—সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। সরকারী চাকরী, দায়িত্ব বোঝো না?

বিষণ্ণভাবে হাসিয়া মণিমোহন উঠিল। রাণী কাতর দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইল মেঘমন্থর দিগন্তের দিকে—তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

রাত বাড়িতেছে—তেমনি ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়া পড়িতেছে কালো আকাশ। পৃথিবীর অশ্রান্ত কান্না। চর ইস্‌মাইল ঘুমের চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে আচ্ছন্ন আবিষ্ট হইয়া। অবিরাম ঝি ঝিঁর একতান—ব্যাঙের আনন্দ-মুখর কলধ্বনি।

অন্ধকারের মধ্য দিয়া পর পর তিনখানা নৌকা চলিয়াছে। গাজীতলার পাশ হাটখোলার মধ্য দিয়া, জেলে আর চাষীদের বস্তিকে পাশে ফেলিয়া খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—ভাদ্রের ভরা উজানের স্রোত তাহারি মধ্যে বহিতেছে প্রচণ্ড কল্লোল তুলিয়া—কুটা ফেলিলে উড়াইয়া নিয়া যায়।

ভরা খালের তীক্ষ্ণ জোয়ারে তীরের মতো ছুটিয়াছে নৌকা। একটানা জলের শব্দ—মাঝে মাঝে আকস্মিক এক একটা বিরাম-যতির মতো কাদার মধ্যে লগি

ঝপাস ঝপাস করিয়া পড়িতেছে—নৌকার ছইকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াই আবার একটা বিশ্রী ছর্ ছর্ ধ্বনিতে পেছনে ছিটকাইয়া পড়িতেছে বেতকাঁটা, নলখুরি ফুলের লতা। সুপারীর কাঠ-ফেলা ছোট ছোট গ্রাম্য ঘাটে ঘূর্ণি বাজিতেছে।

দিগ্‌দিগন্তে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া চলিয়াছে। আকাশটা যে অমন সহস্রভাবে ফুটি ফাটা হইয়া আছে—বজ্রের আলোয় সেটা যেন স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িতেছে। খানিক রাত্রে আবার প্রবল বর্ষণ নামিবে বলিয়া মনে হয়। এই দেশটা আশ্চর্য। বৈশাখ বলো, জ্যৈষ্ঠ বলো, যে মাসই হোক একবার বৃষ্টি নামিলেই হইল। তারপর আর কথাবার্তা নাই—হয়তো পরপর সাতদিন ধরিয়াই এতটুকু আলো ফুটিল না—রাশি রাশি মেঘ আর অসংলগ্ন বৃষ্টি চলিতে লাগিল সময় ও সীমাহীন ছন্দে।

মণিমোহন ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বাহিরের জলকল্লোলে আর রাত্রির এই অনন্ত সজল তমসায় সে যেন হঠাৎ দশ বছর আগে ফিরিয়া গেছে। সেই যেদিন নদীতে অতিকায় জেলে ডিঙির মতো বড়ো বড়ো বালির চড়া ঠেলিয়া ওঠে নাই, সেদিন তেঁতুলিয়ার রোলিংকে সমুদ্রের তাণ্ডব বলিয়া মনে হইত; যেদিন মনে হইত পৃথিবীটা এখানে এখনো বিশ্বকর্মার কর্মশালার খানিকটা অবিন্যস্ত উপচার—সবটা মিলিয়া কিছুই গড়িয়া উঠে নাই—আদিম জগতের গলিত লাক্ষাস্তূপের উপরে সামান্য এতটুকু আবরণ পড়িয়াছে মাত্র। তারপর নদীতে চড়া পড়িল—চর ইস্‌মাইল আগাইয়া আসিল মানুষের কাছাকাছি—সভ্যতার নিকট সান্নিধ্যে। কী ঘটিল এবং কী যে ঘটিল না। এই অন্ধকার রাত্রে বিশাল নদী বাহিয়া এম্‌নিই একটা যাত্রা মনে পড়িতেছে—সেই যেদিন—। সীমাহীন চিহ্নহীন আকাশ বাতাসে আজকের চর ইস্‌মাইল দশ বছর আগেই আবার ফিরিয়া গেল নাকি!

চোখ দুইটা ঝিমাইয়া আসিতেছে—মনে হইতেছে ডাক-বাংলোয় পাতলা একখানা লেপ মুড়ি দিয়া রাণী এখন ঘুমাইতেছে বোধ হয়। আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে অচেতন স্বপ্নচ্ছায়ার মতো থাকিয়া থাকিয়া দুইটা রাইফেলের নল চক চক করিয়া উঠিতেছে। নাঃ—সেদিন আর এদিনের পৃথিবী এক নয়।

ঘস্-স্ করিয়া নৌকা ভিড়িয়া গেল হঠাৎ। একটা টর্চের আলো মণিমোহনের মুখের ওপর ঝল্‌সাইয়া উঠিল—নিদ্রার আমেজটা ভাঙিয়া গেছে।

চাপা গলায় দারোগা ডাকিতেছে: স্যার?

—কী খবর?

—এসে পড়েছি—উত্তেজনায় দারোগার গলা কাঁপিতেছে।

অনিচ্ছুক শরীরটাকে নাড়াচাড়া দিয়া মণিমোহন উঠিয়া বসিল।—নামতে হবে?

—আপনি একটু ওয়েট্‌ করুন স্যার। ওদিকের ব্যবস্থা করে আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।

—আচ্ছা— মণিমোহন আবার গা এলাইয়া দিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজিল। কাদার উপর আট দশ জোড়া বুটের ছপাছপ শব্দ এবং তিন চারটি টর্চের জোরালো আলো সুপারী বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

রাত বোধ হয় দেড়টার কাছাকাছি। চোখ হইতে ঘুমের জড়তাটা কিছুতেই কাটিতেছে না; বোটের মাঝিরা ফিসফাস করিয়া কী বলিতেছে শোনাও যায় না—বোঝাও যায় না। নৌকার তলা দিয়া জলের সুতীব্র শব্দ। এতক্ষণ যার অস্তিত্ব কিছু আছে বলিয়াই মনে হয় নাই, সুযোগ পাইয়া সেই মশার ঝাঁক আসিয়া চারদিক হইতে গুঞ্জন তুলিয়াছে কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত চেতনা যেন একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের পাখায় ভাসিয়া চলিয়াছে; ঝিণ্টু, রাণী—কলিকাতার চৌরঙ্গী—সাউদার্ণ অ্যাভেনিউয়ের কৃত্রিম চন্দ্রালোক; হা হা করিয়া বিশ্রী চেহারার একটা রোগা হাড় জিরজিরে লোক প্রবলভাবে হাসিয়া উঠিল: কে, সেই পাগলা পোস্ট্‌ মাস্টারটা? এখনো বাঁচিয়া আছে নাকি—এই দশ বৎসর পরেও?

আবার চমক ভাঙিল। পোস্ট্‌মাস্টার নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। যামঘোষ। প্রহর ঘোষণা করিতেছে তারস্বরে। জলের শব্দ, ব্যাঙের ডাক—মাঝিরা তামাক খাইতেছে।

পকেট হইতে সিগারেটের টিনটা বাহির করিতে গিয়া মণিমোহন আবার ঝিমাইয়া পড়িল। স্বপ্নের মধ্য দিয়া একটা ঝড়ের রাত বহিয়া চলিয়াছে। অন্তরে ঝড়, বাহিরে ঝড়। আরণ্য আর উদ্দাম ভালোবাসা। মশার গুঞ্জন নয়—গুন গুন করিয়া কে যেন কাঁদিতেছে—কাঁদিতেছেই— নৌকার ছইয়ের উপর টপ টপ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে—রাণী?

—স্যার?

এবার আর ডাক নয়—কাণের কাছে ব্যাকুল আর্তনাদের মতো স্বরটা ঝনাৎ করিয়া হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাওয়া সেতারের তারের মতো বাজিয়া উঠিল। ছন্দোপতন।

—স্যার, ঘুমুচ্ছেন?

ইহার পর আর ঘুমানো চলে না। বিস্ফারিত বিহ্বল চোখ দুইটাকে মণিমোহন এক সঙ্গেই মেলিয়া দিল: কী হয়েছে—অমন হাঁক ডাক কেন?

—সর্বনাশ হয়েছে স্যার!

—সর্বনাশ? কিসের সর্বনাশ? ডাকাত পড়েছে নাকি?

—ডাকাত পড়লেও ভাল হত স্যার—মণিমোহনের মনে হইল দারোগা যেন বুক

ফাটিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন : সব মাটি স্তার—কিছু হল না। পাখী পালিয়েছে! একেবারে ফুড়ুৎ।

যাক—আপদ গিয়াছে। বড় করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল মণিমোহন, কিন্তু দারোগার ব্যাকুল চোখ মুখের দিকে তাকাইয়া মায়া হইল অত্যন্ত।

—তাই তো! পালালো কী করে?

—আর বলবেন না। যোগ-সাজস ছিল ভেতরে ভেতরে—আমাদেরই কোনো এক ব্যাটা ইন্‌ফর্মার কিংবা চৌকীদার ফাঁস করে দিয়েছে নিশ্চয়। গিয়ে দেখি শূন্য পুরী খাঁ খাঁ করছে—কারো কোনো পাত্তা নেই।

—তারপর?

—তারপর আর কী। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—গাঁয়ের তিন চার জায়গায় হানা দিয়ে এলাম—উঁহু। কোথায় কে। তারা এতক্ষণে বে-অব-বেঙ্গল ছাড়িয়ে প্রায় জাভা-সুমাত্রার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে বোধ হয়। তারপর সিঙ্গাপুর কিংবা সাংহাই।

—কিছুই হল না তা হলে?

—হল না কি স্তার, হওয়াতে হবে।—ক্ষিপ্ত দারোগার দাঁতের ভেতর কড়মড় করিয়া একটা হিংস্র শব্দ উঠিল : যেটা আশ্রয় দিয়েছিল—তাকে অ্যারেস্ট্ করে নিয়ে এসেছি। এই মাগীই সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে—ঘা কতক কষে লাগালেই মুখ দিয়ে আপনা থেকে কথা বেরিয়ে আসবে।

—মাগী! মেয়েমানুষ!

—মেয়েমানুষ বই কি! হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। আর সাধারণ মেয়েমানুষ তো নয় স্তার—বাঘিনীর জাত একেবারে। দেখুন না শ্রীমতীর চেহারাখানা—

টর্চের আলো দারোগার পেছনে বন্দিনীর মুখের উপরে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল।

মুহূর্তে পাথর হইয়া গেল মণিমোহন। দশবছর পরেও সে মেয়েটাকে চিনিতে পারিয়াছে। নীলার মত চোখ, আগুনের মতো রঙ। বর্মার বুদ্ধমূর্তির মতো চিত্র-করা দৃষ্টি মেলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! দশবছর আগে যেমন করিয়া প্রথম আসিয়াছিল, আজো ঠিক তেম্‌নি ভাবেই তাহার দরবারে বিচার প্রার্থী।

টর্চের আলোটা জীবন্ত বুদ্ধমূর্তির মর্মরশুভ্র পাংশু মুখের উপর জলিতে লাগিল, আর তাহারি সঙ্গে সঙ্গে জলিতে লাগিল নীলার মতো দুটি আশ্চর্য চোখ। বহুদিন পরে মণিমোহন আবার সম্মোহিত হইতেছে।

৮

ঠিক সেই সময়েই আর একটি বিচিত্র নাটকের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিলেন বলরাম ভিষকরত্ন।

বাইরে বৃষ্টি পড়িতেছে—ঘরের মধ্যে মিটমিটে একটা লণ্ঠন, লাল তেল বলিয়া আলোর চাইতে ধূম্রজালই বিকীর্ণ করিতেছে বেশি! সামনে একখানা 'সর্বজ্বর সংগ্রহ' খুলিয়া লইয়া বলরাম হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছেন এবং টাকের উপর মশার হুল ব্যর্থ চেষ্টায় শুদ্ধমাত্র সুড়সুড়ি দিয়া চলিয়াছে।

সামনে গড়গড়ায় কল্‌কেটা অনাদরে আপনিই পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইতেছে। তামাকের তীব্র গন্ধে আমন্ত্রিত হইয়া রাধানাথ দরজার ফাঁকে মুখ বাহির করিল। অমন ভালো তামাকের এমন অপচয়টা তাহার পছন্দ হইল না। ইঁদুরের মতো হুঁশিয়ার পা ফেলিয়া রাধানাথ ঘরে ঢুকিল, তারপরেই গড়গড়ার মাথা হইতে কল্‌কেটা তুলিয়া লইয়া আবার নেপথ্যে তিরোহিত হইল।

—কবিরাজমশাই, কবিরাজমশাই!

ডি-ক্রুজার আকুল কণ্ঠ!

—কী রে, এমন অসময়ে কী ব্যাপার?

—শীগ্‌গির আসুন।

—কী হয়েছে?

—বাবার অবস্থা ভারী খারাপ।

—ভারী খারাপ? কেন—কী হয়েছে? বিকেলে দেখে এলাম, জ্বর নেই—এর মধ্যে আবার কী হল?

আমি জানি না, আপনি আসুন।

—আঃ—এই রাত্তিরে জল-কাদার মধ্যে হাড় জ্বালিয়ে মারলি! আচ্ছা, চল। কিন্তু ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমিও না।—ক্রুজা কাঁদিয়া ফেলিল: আপনি চলুন। শীগ্‌গির চলুন।

চটি পরিয়া এবং ম্রিয়মান লণ্ঠনটি হাতে করিয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। এমন রাত্রে ঘর হইতে বাহির হইয়া রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া থাকিতে কাহার ইচ্ছা করে? অন্ধকার বনবীথিকে আলোড়িত করিয়া এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। টিপ টিপ করিয়া বর্ষাধারার ক্ষণবর্ষণ। পায়ের নীচে জল আর কাদা ছপছপ

করিতেছে, ঘাসে ঘাসে জোঁক নড়িতেছে। চর ইস্‌মাইল নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে, বলরামও নিঃসংশয় হইয়াই ঘুমাইতেছিলেন। কিন্তু কী এ বিড়ম্বনা আসিয়া দেখা দিল!

মনে মনে বলরাম সমস্ত পৃথিবীটাকে গালাগালি করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আরো বেশি করিয়া রাগ হইতেছে ভুঁড়ো ডি-সিলভার উপরে। সুস্থ থাকিয়া লোকটা পৃথিবীশুদ্ধ লোককে জ্বালাইয়া বেড়ায়, অসুস্থ অবস্থাতেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। মরিতে হয় তো সোজাসুজিই চোখ দুইটা উল্‌টাইয়া বসিয়া থাক বাপু, এমন ভাবে মানুষকে উদ্বাস্ত করা কেন? এই পর্তুগীজগুলাই দুনিয়ার অনাসৃষ্টি জীব—যেমন নাম, তেমনি আকার প্রকার, আর তেমনিই ব্যবহার। মরিয়া মরিয়া তো প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দু-চার ঘর যা আছে সেগুলি গেলেই আপদের শান্তি হয়। নিজের মনেই গজ্‌রাইতে গজ্‌রাইতে বলরাম ডি-সিল্‌ভার বাড়িতে আসিয়া পা দিলেন। আর আসিয়া যে কাণ্ডটা চোখে পড়িল তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—এ কী রে! কেমন করে হল?

—আমিও জানি না। বাড়ীতে এসেই দেখি—

—এত রাত কোথায় ছিলি?

ক্রুজা নিরুত্তর। কোথায় বদমায়েসী করিতে গিয়াছিল নিশ্চয়—একেবারে পুরাপুরি বখিয়া গিয়াছে হতভাগা ছেলে। কিন্তু এ কী ব্যাপার!

মেজেতে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে ডি-সিল্‌ভা। চারদিকে রাশি রাশি ভাঙা শিশি-বোতল, ঘরময় কাঁচের টুকরা। কতগুলা বাক্স প্যাঁটরা খোলা—এলোমেলো আর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আছে সমস্ত। সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া, মেঝে একাকার করিয়া ডি-সিল্‌ভা বমির বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। সে বমি রোগীর নয়—মাতালের। মদের এবং ক্লেদের একটা দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী যেন উলটাইয়া আসিবার উপক্রম করে। বড় বড় হিক্কা উঠিয়া ডি-সিল্‌ভার আগাদ মস্তক ঝাকিয়া দিতেছে—মনে হইতেছে আর দেরী নাই, বড় জোর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ঝামেলা বেমালুম মিটিয়া যাইবে।

ঘৃণা কুঞ্চিত মুখে বলরাম ঝুঁকিয়া পড়িলেন রোগীর উপরে। নাড়ী পরীক্ষা করিলেন! পিছনে আশঙ্কা-পাণ্ডুর মুখে ক্রুজা নীরব আর নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়াইয়া।

কিচ্ছু হয় নি! খালি পেটে একরাশ কড়া মদ টেনে এই অবস্থা হয়েছে।

—মদ!

—নিশ্চয় মদ। কেন মদ দিলি এনে?—বলরাম ফাটিয়া পড়িলেন: এই রোগী

মানুষকে মদ খাওয়ালি কোন্ আক্কেলে? এখন যে বাপ মেরীর পাদপদ্মের দিকে রওনা হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছিস্ হতভাগা বেকুব কোথাকার?

—আমি—আমি তো মদ আনি নি।

—তবে? মদ এলো কোত্থেকে? আশমান থেকে পাখা মেলে উড়ে আসতে পারে না তো।

—বোধ হয় মামা।

—মামা!—বলরাম সবিস্ময়ে বলিলেন, তোর আবার মামা কে?

—তা তো জানি না। আজই এসেছে—

—চুলোয় যাক। যেমন হতভাগা ভাগনে, তেমনি হতভাগা তার মামা। যা এখন জল আন্—দৌড়ো, দৌড়ো। মাথায় জল দে—

তারপর আধঘণ্টা ধরিয়া পরিচর্যা চলিল। মাথায় জল, পাখার বাতাস। আস্তে আস্তে ডি-সিল্ভার নিশ্বাস সহজ আর স্বাভাবিক হইয়া আসিল—মনে হইল এইবার সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

—নে, এইবারে বুড়োকে খাটের ওপরে তুলে ফেল। এর পরে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ধরাধরি করিয়া দুজনে ডি-সিল্ভাকে খাটে তুমিল। ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে একটা বড়ি বাহির করিয়া বলরাম বলিলেন, জ্ঞান হলে এটা খাইয়ে দিস। আর ভালো কথা, তোর মামা ধুরন্ধরটি গেলেন কোথায়?

—জানি না তো।

—বেশ মামাটি বটে। বোনাইকে এক পেট মদ গিলিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু ঘরের এমন অবস্থা কেন রে? বাক্স প্যাঁটরা ভাঙ্গা—জিনিস পত্র তচ্নচ্—

—অ্যাঁ!

ক্রুজা এতক্ষণে চমকিয়া উঠিল: তাই তো। চোর এসেছিল নাকি? মামাই বা গেল কোথায়?

বলরাম বলিলেন, হুঁ। চোর যে কে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। বেশ মামাটি জুটিয়েছিলে বাবাজীবন। বাপটিকে মারবার মতলব করে জিনিস-পত্তর হাতিয়ে সে নিরাপদে একদম পলায়মানঃ।

ক্রুজা আবার বলিল, অ্যাঁঃ!

—হ্যাঁ। কোনো সন্দেহ নেই। পারিস তো পুলিশে খবর দে—আমি আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী করব। যত সব—হুঁ!

ব্যাগটি তুলিয়া লইয়া বলরাম বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, আর আমাকে সাক্ষী-টাক্ষী মানিস্ নি বাপু, পুলিশের হাঙ্গামা আমি বরদাস্ত করতে পারব না।

বলরাম লণ্ঠন হাতে অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেলেন।

মড়ার মতো মুখ লইয়া জুজা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। উঃ মামা—মামার পেটে পেটে এই মতলবই ছিল তাহা হইলে—অত করিয়া একটা টাকার ঘুষ তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিল তবে এই জন্যই। আর ওদিকে ডি-সিল্‌ভা অঘোরে ঘুমাইতেছে। যেন কিছুই হয় নাই—ঠিক এই ভাবেই তাহার নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত বড় বড় শ্বাস বহিতেছিল।

অকারণ একটা হিংসায় জুজার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল এখনি সে ঝাঁপ দিয়া ডি-সিল্‌ভার ঘাড়ের উপরে গিয়া পড়ে—কামড়াইয়া, আঁচড়াইয়া, খামচাইয়া তাহার একাকার করিয়া দেয়। জুজার পায়ের গুঁতা লাগিয়া একটা মদের শূন্য বোতল ঘরময় গড়াইয়া গেল।

কিন্তু গঞ্জালেস্ তো ঠিকই করিয়াছে। কালো অন্ধকারে—বৃষ্টির অশ্রান্ত কান্নার ভিতর দিয়া তাহার নৌকা নদীতে পাড়ি ধরিয়াছে। তীব্র নেশায় উদার এবং উদাস হইয়া হেঁড়ে-গলায় গান জুড়িয়াছে গঞ্জালেস্। আশ্চর্য—সে তো গান নয়, প্রার্থনা। মাতা মেরীর পবিত্র নাম কীর্তনে নদীর বুক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে পুলকে ও আধ্যাত্মিক আনন্দের প্রেরণায়।

নেশার ঝোঁকে সে চর ইস্‌মাইলে আসিয়াছিল এবং নেশার ঝোঁকেই আবার নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভেভিড গঞ্জালেস্ জাগিয়াছে তাহার রক্তে। কী হইবে একটা মেয়ের জন্য অকারণে বিলাপ করিয়া, নিজের সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া? পৃথিবী অনেক বড়ো—পৃথিবীতে অনেক মেয়ে। একজনকে যদি নাই পাও, তাহার প্রতিনিধি হিসাবে আরো দশ-জনকে আয়ত্ত করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া আনা এমন কিছু কঠিন কথা নয়। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে —নির্মম ভাবে ভোগ করিয়া যাও—নিষ্ঠুর ভাবে আদায় করিয়া লও। এই অত্যন্ত সার কথাটা তাহার বাবাই খুব ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। সে কাহারও জন্য প্রতীক্ষা করে নাই—ইনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করে নাই —একটি নারীর জন্যে কাজ কর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত মাতালের মতো দিগ্‌দিগন্তে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় নাই। অক্লেশে ডাকাতি করিয়াছে, বন্য যৌবনকে চরিতার্থ করিয়াছে—খুন করিয়াছে, বীরের মতো বাঁচিয়াছে এবং বীরের মতো মরিয়াছে। সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের আদর্শ সন্তান।

তবে সেই বা পিছাইয়া থাকিবে কেন? পর্তুগীজ চিরদিনই পর্তুগীজ—চিরকালই সে যুদ্ধ করিয়াছে এবং জয় করিয়াছে। পেরিয়া নয়—অনুগৃহীত সেই বাঙালি মেয়েটা নয়—ঘুমন্ত শান্ত কর্ণফুলীর তীরে নারিকেল-বীথির মৃদু-মর্মরও নয়। অন্তহীন

নীল সমুদ্র। ড্রাগন আর মড়ার মাথা আঁকা কৃষ্ণ পতাকা। কামানের অগ্নিপিণ্ড দিয়া বাণিজ্য জাহাজকে অভ্যর্থনা। জ্বলন্ত সপ্তগ্রাম—দ্বীপময় দুর্গ। যোগ্যতমের উদ্বর্তন।

পরস্বাপহরণে এই প্রথম হাতে খড়ি। নতুন করিয়া জীবন সুরু হইল গঞ্জালেসের। কোনোখানে বাঁধা পড়িয়া নয়—পৃথিবীময় ছড়াইয়া। নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা উল্লাস তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—কালো রাত্রির কালো স্রোত দৃষ্টির অগোচরে বিশাল পৃথিবীর মহা আবর্তে তাহাকে লীন করিয়া দিল—আরো অনেক বিদ্রোহী শিশুর মতোই চর ইস্‌মাইল আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না কোনোদিন।

নয়

চর ইস্‌মাইলের উপর দিয়া সূর্য উঠিল।

এক একটি রাত্রির কালো অন্ধকার দিগন্ত-প্রসারিত নদীর বুক হইতে নিজেকে বিকীর্ণ করিয়া দেয়—অবার প্রভাতের প্রথম আভাসে রহস্যময় অতলস্পর্শ জলের তলায় বিলীন হইয়া যায়। রক্ত-সমুদ্রে স্নান করিয়া নিজেকে প্রকাশিত করে প্রতিদিনের সূর্য—নবজাতক সূর্য। বিস্ময়-ব্যাকুল চোখ মেলিয়া সেই সূর্য যেন নতুন করিয়া দেখিতে চায় পৃথিবীকে; যেন সত্তার মধ্যে অনুভব করিতে চায় বিস্তৃত আদিম কালের সেই প্রথম অগ্নিস্রাবী দিনগুলি, যেদিন মাটি ছিল না, জল ছিল না, শ্যামশ্রীর আনন্দিত বিস্তার ছিল না—প্রাণে-শস্যে সমুজ্জ্বল মানুষের উপনিবেশ ছিল না। আকাশ বাতাস, পঞ্চভূতের বুকের মধ্যে শুধু ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে সোনা, লোহা, গন্ধক, সোরা, লাক্ষা, লাভা, হাইড্রোজেন, কার্বন—আরো কত কী।

সূর্য স্বপ্ন দেখে, কিন্তু পৃথিবী সে স্বপ্ন ভুলিয়া গেছে বহুদিন আগে। তার মুগ্ধ চোখে আবিষ্ট হইয়া আছে আকাশের নীলাঞ্জন মায়া—তার সর্বাঙ্গে শ্যামলতায় স্নিগ্ধ সৌকুমার্য উঠিতেছে হিল্লোহিত হইয়া, তার চেতনায় নব নব সৃষ্টির রোমাঞ্চকর স্বপ্নমাধুর্য! সূর্যের দিনে পৃথিবী আর ফিরিবে না, আদিম আগুনের নীল ধাতব শিখায় নিজেকে আর জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে না সে। তার ভবিষ্যৎ হিম-মজ্জিত কোন্ লক্ষ লক্ষ বৎসরান্তের শীতল তুষার শয্যায়, সূর্যহীন অন্ধকারে, রেডিয়াম-ইউরেনিয়ামের ক্রম-ক্ষয়শীল অন্তর্দীপ্তিতে।

তবুও সূর্য ওঠে—নবজাতক সূর্য। সদ্যোজাগ্রত চোখ মেলিয়া তাকায় পৃথিবীর দিকে, তাকায় চর ইস্‌মাইলের দিকে। আর উপনিবেশের অধ-পরিণত মৃৎ-

স্তরের নীচে আদিম লাভা ফুটিয়া, ফুলিয়া, ফুঁসিয়া উঠে—বৈষম্য-কণ্টকিত, বিরোধ জর্জরিত অলস শান্তির তলা হইতে একটা উত্তাল আগ্নেয় আক্ষেপ যেন অমার্জিত মানুষগুলির শিরা-স্নায়ুতে নিজেকে সঞ্চার করিতে চায়।

উপনিবেশের বুকে মন্বন্তর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদপাত। উনিশশো বিয়াল্লিশের আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। অকাল-বোধনের পূজায় ব্যর্থ-বলির রক্তপাত। শতধাবিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ প্রাণশক্তি পথ খুঁজিয়া পায় না, পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলে।

বিস্ময়-ব্যাকুল চোখ মেলিয়া তাকায় রক্তাক্ত সূর্য। আগ্নেয় অতীত আবার কি নিজেকে সঞ্চারিত করে ভবিষ্যতের মধ্যে, উপনিবেশের পেশীতে পেশীতে মত্ততার জোয়ার আসে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের রক্তে ডাক আসে নতুন কালের ধারা বাহিয়া—কিন্তু সে কি দস্যুতার, না দস্যুর মতো সঞ্চিত মিথ্যাকে লুঠ করিয়া নিতে? আরাকানীর তলোয়ার আবার মাটির তলা হইতে ফিরিয়া আসে কি অত্যাচার করিবার জন্য, না অত্যাচারীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য?

সূর্য প্রতীক্ষা করে।

*   *   *   *

—বড়মিঞা, ও বড়মিঞা?

বড়মিঞার কাছারী বাড়ীর টিনের দরজাটা বাহির হইতে শক্ত করিয়া তালা আটা। ধূলা জমিয়াছে, মাকড়সার জাল ছড়াইয়া আছে। লোহার তালাটা বহুদিন খোলা হয় না, অনেক রোদে পুড়িয়া এবং অনেক জলে ভিজিয়া সেটা যেন স্বর্গের তালার মতো কঠিন এবং সুদৃঢ় হইয়া আছে, তাহার অভ্যন্তরে নিহিত রহস্যের আবরণ ভেদ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। ভাবটা এই রকম, এখানে মানুষ নাই, এখানে কাহারো থাকিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। যে জন্য তোমরা এখানে মাথা কুটিয়া মরিতেছ তাহা বৃথা—ধান চালের ব্যাপার বড়মিঞা বহুকাল আগেই ছাড়িয়া দিয়াছে, সুতরাং তাহা লইয়া এখানে দরবার করিতে আসা যেমন অনাবশ্যক তেমনই অবান্তর।

কিন্তু মানুষগুলিও নাছোড়বান্দা।

—বড়মিঞা, ও বড়মিঞা?

বন্ধ কাছারী বাড়িটার ভিতর কেমন যেন রহস্যময় একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। মানুষ?—না, শেয়াল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বাহিরে প্রায় পঞ্চাশজন লোক জুটিয়াছে। তাহাদের হাতে লাঠি এবং ধারালো নিড়ানি। চর ইস্‌মাইল, কালুপাড়া এবং অন্যান্য আরো দশখানা গ্রামের একদল মুসলমান চাষা। দেশের চাল লোপাট হইয়া গিয়াছে—একটি দানাও খুঁজিয়া

পাওয়া যাইতেছে না কোনোখানে। অথচ শোনা যায় রাত্রে যখন অন্ধকারে গাঙ থম থম করে, গ্রামের মানুষগুলি তো দূরে থাক, সদাসতর্ক প্রহরী কুকুরদের চোখও ঘুমে এলাইয়া আসে—তখন, ঠিক তখন—কাকপক্ষীও যখন টের পায় না, আর সুপারীর পাতাগুলি পর্যন্ত নড়ে না একবিন্দুও, ঠিক সেই সময় দশ দাঁড়, পনেরো দাঁড় বিশ দাঁড়ের পান্‌সী গাজীতলার হাট হইতে বাহির হইয়া গির্জাঘাটের নীচ দিয়া বড় নদীতে পড়িয়া শাঁ শাঁ শব্দে তীরের মতো অদৃশ্য হইয়া যায়। কোথায় যায়? যায় ওপারের গঞ্জে। কেন যায়? লুকাইয়া লুকাইয়া দেশের প্রাণ, মানুষের পেটের খাবার বিক্রী করিয়া আসিতে।

এই কাজের চক্রী হইতেছে বলবাম ভিষক্‌রত্ন এবং তাহার দক্ষিণ হাত মজাঃফর মিঞা। সুতরাং চর ইস্‌মাইলের রক্তে আগুন ধরিয়াছে। এ কলিকাতা নয় যে এখানকার মানুষ নির্বিবাদে ফুটপাথে পড়িয়া তিলে তিলে শুকাইয়া মরিবে, মাটির মালসা হাতে লইয়া দরজায় দরজায় 'ফ্যান্' 'ফ্যান্' করিয়া কাঁদিবে এবং কাঁকাইবে, ডাষ্টবিনে হাত ডুবাইয়া পচা শস্যের কণিকার ব্যর্থ সন্ধান করিবে, অথবা সরকারী লরীর তলায় পড়িয়া দিব্যগতি লাভ করিবে। এরা দাবী করিতে জানে, নিজেদের প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করিতে জানে। এরা আইন গড়ে, আইন ভাঙে। আজ অবশ্য সহরের তৈরী অনেক বিষ বাষ্প আসিয়া এদের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিতে পারে নাই—সহজ, স্বাভাবিক, জটিলতাহীন সমবায় ও সাম্যবাদ এখনো ইহাদের সুস্থ কর্তব্যবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে।

টিনের দরজায় ঠক ঠক করিয়া তাহারা লাঠি ঠুকিতে লাগিল।

—বড়মিঞা, বড়মিঞা—শুনছ?

তবু সাড়া নাই। মৃত্যুপুরীর মতো সব স্তব্ধ। শুধু সামনে নদীর সাদা জলে জোয়ার আসিয়াছে—উদ্দাম বাতাসে একটা তীব্র কলধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে।

—ও জমির ভাই, ব্যাপার কী?

—এখানে তো কেউ নেই মনে হচ্ছে।

জমিরের চোখে আগুন জ্বলিতেছিল।

—নেই মানে? সব চালাকি। এমন করে রেখেছে যে লোকে ভাববে ভেতরে কিছু নেই! আসলে সব লুকিয়ে রেখেছে এই গোলার মধ্যেই—রাতের বেলায় এর ভেতর দিয়ে ধান বেরিয়ে যায়।

—কিন্তু বড়মিঞা গেল কোথায়?

—আছে ভেতরেই। নিজের চোখে আসতে দেখেছি লাঠি ধরে, বাঁকা বাঁকা পা

ফেলে। জিন-পরী তো আর নয়—জলজ্যান্ত একটা মানুষ হাওয়ায় নিশ্চয় উড়ে যায় নি।

একজন গর্জন করিয়া কহিল, ভাঙো দরজা।

—সে কি! বে আইনি হবে যে।

—আইন!—জনতার মধ্য হইতে অনেকগুলি গোখ্‌রো সাপের রোষধ্বনির মতো একটা চাপা শব্দ উঠিল। আইন!

জমির আগাইয়া আসিয়া দরজায় প্রকাণ্ড একটা ঘা দিল: রেখে দাও আইন। ওই তো সার্কেল্‌-অফিসারবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। কী করলে? কিছুই না। ও সব একদলের। যা করবার আমাদেরই করতে হবে ভাই, কারো মুখের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে পড়ে থাকলে হা পিত্যেশ করাই সার হবে।

—ভাঙো দরজা।

দু একজন লাঠি উদ্যত করিল, কিন্তু বেশীর ভাগই দাঁড়াইয়া রহিল দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া। ঘুণ ধরিয়াছে চর ইস্‌মাইলের বিদ্রোহী শরীরে। সংশয় দেখা দিয়াছে, আইনের তর্ক উঠিয়াছে। অনর্থক ফ্যাসাদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে কোথায় যেন বাধে।

জমির ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—তোমরা মানুষ না?

জনতা শক্ত হইয়া উঠিল। চোখে আগুন চমকাইয়া গেল। কিন্তু এখনো মন তৈরী হয় নাই, চেতনার উপর হইতে নতুন-শেখা ন্যায় অন্যায়ের ভারমন্থর সংশয়টা কিছুতেই নামিয়া যাইতেছে না।

জমির বলিল, সামনে কী হচ্ছে দেখেও কি দেখতে পাও না? খাদেমালি মোল্লার পরিবার তিন দিন ধরে উপোস দিচ্ছে। মণিরুদ্দিনের ছেলেবউ বিনা চিকিৎসায় না খেয়ে মরে গেল। জেলেপাড়ায় মানুষ মরছে টপাটপ করে। কেন? দেশে কি চাল নেই? এত ধান হয়েছে আমাদের চরের জমিতে, আঁচলভরা সোনা ফলেছে। কোথায় গেল সে সব, কারা নিলে?

জনতা নড়িয়া উঠিল।

—ওই কবিরাজ, এই মজঃফর মিঞা, ওই ওপাড়ার নুরুল গাজীর ব্যাটারা, জয়নাল ব্যাপারী। সব খবর এরাই জানে। দেশের লোককে প্রাণে মেরে পেট বোঝাই করছে। মাটির তলায় তলায় ধান, অন্ধকার গোলাঘরে ধান। রাতে ছিপ্‌ নৌকোতে চালান দেওয়া ধান। আর তোমরা পড়ে পড়ে মরবে? মানুষ না গোরুর দল?

—কড়্—ঝনাৎ—ঝনাৎ—

টিনের দরজাটা যেন একটা বিরাট ভূমিকম্প অথবা প্রলয়ের আঘাতে নড়িয়া উঠিল। চর ইস্মাইলের আকাশ ফাটাইয়া রণধ্বনি মুখরিত হইল : আল্লা—হু—আকবর। ভাঙো দরজা।

কাছে দূরে লোক জমিতে শুরু হইয়াছে। কতক বা ভীত বিহ্বল চোখে চাহিয়া আছে, কতক বা লাঠি সোঁটা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া এদের দলে যোগ দিল। অভাব সকলের, দুঃখ সকলের, নির্যাতনের অংশও সকলের সমান। তাই প্রতীকারের দায়িত্বও সকলেই এক সঙ্গে ভাগ করিয়া নিতে চায়।

—আল্লা হু আকবর—দরজা ভাঙো—

আকাশ কাঁপিতেছে, পায়ের তলায় মাটি কাঁপিতেছে, চর ইস্মাইলের নিভৃত নিম্নলোকে প্রচ্ছন্ন অগ্নিগিরির লাভা-স্রোত ফেনাইতেছে। ধান কাটা লইয়া, জমি লইয়া লাঠালাঠি করা, রক্তের ধারা বহাইয়া দেওয়া ইহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ইতিহাস, কিন্তু এমন করিয়া এক হইয়া দাঁড়ানো, এমন করিয়া মাথা তুলিয়া সমস্ত অন্যায়কে চুরমার করিয়া দিবার আকাঙ্খা—কোন্ নতুন যুগের হাওয়া আজ চর ইস্মাইলের বুকে বহিয়া আসিল!

দূরে কাছে লোকগুলির মধ্যে নেশা লাগিতেছে। তাহারা আর নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র নয়, নিজেদের ভাগ্যও যে এর সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত, সেই সত্যটাকেও অনুভব করিতেছে যেন।

—ভাঙো—ভাঙো—সাবাস্—

—মড়্—মড়্—মড়াৎ—

একটা প্রচণ্ড লাথিতে শক্ত হুড়কাটা দু টুক্‌রা হইয়া গেল—কপাটটা হাট-আদুড় হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। সামনের লোকটি মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল, তারপর হু হু করিয়া ওরা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল জলস্রোতের মতো।

কাছারী ঘরে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। কতগুলি বেঞ্চি এদিকে ওদিকে পাতা, একটা পুরাণো ভাঙা খাট। লাঠির মুখে সেগুলিকে চুরমার করিয়া তাহারা উঠোনে নামিয়া আসিল।

সামনে চার পাঁচটি গোলা সাজানো। মসৃণ করিয়া মাটি দিয়া তাহাদের দেওয়াল লেপা, তাহাদের মাথায় নতুন খড়ের সোনালি ছাউনি। সামনে দিয়া ধানের সরু সরু বিশৃঙ্খল রেখা পিছন দিকের ছোট দরজা বরাবর চলিয়া গেছে। ওই পথ দিয়াই তাহা হইলে যায়!

কিন্তু বিস্ময়ের বাকী ছিল তখনো।

ক্ষিপ্তের মত মানুষগুলি ধানের গোলায় গিয়া চড়াও হইল! সেখানে যাহা চোখে পড়িল তাহাতে বাক্‌স্ফূর্তি হইল না কাহারো। ধান্ তো দূরের কথা, একটি তুষের দানাও পড়িয়া নাই সেখানে। পরিষ্কার করিয়া ঝাঁট দিয়া কে যেন শেষ শস্যকণাটি অবধি তুলিয়া লইয়া গেছে। শুধু একটি গোলাই নয়—সব কয়টিরই এক অবস্থা।

কয়েক মুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা। কাহারো মুখে একটি মাত্রও শব্দ নাই!

যে অলক্ষ্য ইঁদুর মাটির তলায় থাকিয়া নীরবে দিনের পর দিন দেশের প্রাণসত্তার উজাড় করিয়া লুটিয়া খাইয়াছে, এ যাত্রাও তাহার হিসাবে ভুল হয় নাই। সময় থাকিতেই সে নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে তাহার কাজ গুছাইয়া লইয়াছে।

লোকগুলি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পরে আবার যেন প্রচণ্ড বাঁধ ভাঙিল। হতাশার হাহাকার—নিরুপায় ক্ষোভের উন্মাদ গর্জন।

—ধান কই, ও জমির মিঞা, ধান কই?

—ফাঁকি দিয়েছে বুড়োমিঞা, রাতারাতি সব সরিয়েছে।

—ধান লুকিয়েছে—সব চালাকি।

—ধান কই, আমাদের ধান?

মার্ মার্ শব্দে সব তচনচ করিয়া গোলাগুলি সমস্ত গুঁড়াগুঁড়া করিয়া দিল জনতা। টিন, কাঠ, বাঁশ—যেখানে যে যা পাইল তুলিয়া লইল। তারপরে যেটুকু বাকী পড়িয়াছিল, একত্র করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

শুধু মজঃফর মিঞার কাছারী বাড়িতেই আগুন লাগিল না। চর ইসমাইলেও আগুন জ্বলিল। আদিম পৃথিবীর আত্মগ্রাসী আগুন নয়, নতুন যুগের হোমাগ্নি। মাথার উপরে চর ইস্‌মাইলের রক্তাক্ত সূর্য চাহিয়া রহিল নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে।

* * * *

গতিকটা অবশ্য আগেই বুঝিতে পারিয়াছিল মজঃফর মিঞা।

রাতারাতি ধান সে সরাইয়াছিল—পাকা খবর যথাসময়ে পাইয়াই। কিন্তু এতটা ঘটিবে তা সে অনুমান করিতে পারে নাই। বাহিরের দরজা যখন প্রচণ্ড শব্দে ভাঙিয়া পড়িল, তখন প্রমাদ গণিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া খিড়কির পথে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু পালানোর পথ নাই। মারমূর্তি মানুষ চারিদিক হইতেই অন্ধ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাকে হাতে পাইলে আর আস্তো রাখিবে না। গুঁড়ি মারিয়া সে একটা ভাঁটফুলের ঝোপের মধ্যে বসিয়া পড়িল, তারপর ভয়ার্ত বন্যজন্তুর মতো চোখ মিটমিট করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল শ্রাদ্ধ কতদূর পর্যন্ত গড়ায়। বুকের মধ্যে ভয়ে

সন্দেহে প্রাণপিণ্ড তুইটা হাপরের মতো শব্দ করিতে লাগিল, যদি একবার ওরা তাহাকে ধরিতে পারে—

কিন্তু ধরিতে পারিল না। মানুষগুলির নজর তখন মজঃফর মিঞার দিকে নয়, ধানের দিকে। ব্যর্থ ক্ষোভে আর ক্রোধে গর্জন করিয়া তাহারা সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিল, তারপর মজঃফর মিঞার চোখের সামনেই তাহার এত সাধের কাছারী বাড়িতে—

মজঃফর মিঞার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, সত্তর বছরের সীমানা ছাড়াইয়া পাড়ি দিয়াছে বয়েস। চলিতে পা কাঁপে, সর্বাঙ্গ টলিয়া ওঠে—নিজের উপরে নিজের কর্তৃত্ব নাই। দন্তহীন মুখের মাংসপেশীগুলি অনবরত নড়িয়া নড়িয়া যেন সে যা বলিতে চায় তাহারি প্রতিবাদ করে। সুতরাং ভাঁটফুলের জঙ্গলের মধ্যে সত্য খোলস ছাড়া একটা বিষধর সাপের মতো বুক পাতিয়া সে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। শুধু মনে হইতে লাগিল, যদি আর দশবছর আগে হইত, তাহা হইলে—

আগুন জ্বলিতেছে, মাটির দেওয়াল ধ্বসিতেছে— শোঁ শোঁ করিয়া উড়িতেছে জ্বলন্ত টিন। সঙ্গে সঙ্গে জনতার উৎকট উল্লাস। সমস্ত চর ইস্‌মাইল আজ এক হইয়াছে—এক হইয়াছে আজ মজঃফর মিঞার বিরুদ্ধে, মজঃফর মিঞার মতো আরো যাহারা আছে, তাহাদের সম্মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

জ্বলন্ত টিন উড়িতেছে—শাঁ শাঁ করিয়া উড়িতেছে বল্‌টু। আর সেই সঙ্গে যেন মজঃফর মিঞার বুকের মধ্যেও কী একটা উড়িয়া যাইতে লাগিল। দাঁতে দাঁতে তাহা নিষ্ঠুর হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে। শোধ লইবে, ইহার শোধ লইবে সে। এখন আর সেদিন নাই। থানা আছে, আইন আছে, সরকারের কঠিন শৃঙ্খলের শৃঙ্খলা আছে। সব কিছুর বিচার সেখানে হইবেই—কেহ তাহা রোধ করিতে পারিবে না।

মজঃফর মিঞা বাহির হইয়া আসিল। জনতা এতক্ষণে দূরে চলিয়া গেছে—অন্য কোথাও কিছু একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাইবার জন্যই বোধ হয়। হাতের লাঠিটা তুলিয়া লইয়া ঠুক্‌ঠুক্ করিতে করিতে সে অগ্রসর হইল—তাহার মাথার মধ্যে আকাশটা তখন এতটুকু হইয়া গিয়া গোলাকার একটা অগ্নিচক্রের মতো ঘুরিতেছে।

দশ

মণিমোহন তখনও যেন সম্মোহিত হইয়াই আছে।

স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি? দেখিতেছে অসংলগ্ন খেয়াল? দশ বছর আগে যা একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, যা নিশ্চিহ্ন ও নিঃশেষ হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল তেঁতুলিয়া নদীর কূল-ভাঙা প্রচণ্ড জোয়ারের তরঙ্গে উন্মাদ স্রোতধারার সঙ্গে, তাহা কি আবার এমন ভাবে ফিরিয়া দেখা দিতে পারে কোন উপায়ে, কোনো সম্ভব বা অসম্ভব স্বপ্নেও?

কিন্তু স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, কিছুই নয়। যাহা দেখিবার তাহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অত্যন্ত সত্য এবং বাস্তব এই পৃথিবী। নৌকার নীচে তীক্ষ্ণধারায় খালের জল বহিতেছে—নৌকা দুলিতেছে ক্রমাগত। মশাগুলি কানের কাছে তেমনি গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। খাল হইতে পচা কচুরি এবং সদ্যোবর্ষণের পর পৃথিবী হইতে পিছল কাদার গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে। মাঝিদের লণ্ঠনের আলোয় চারিদিকে একটা প্রায়ান্ধকার অস্পষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে; দারোগা বেদনা-বিমর্ষ মুখে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শিকার জাল হইতে চম্পট দিয়াছে এবং তাঁহার ইন্‌সপেক্টর হইবার সযত্ন-লালিত স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে কৈবল্যধাম লাভ করিয়া বসিয়া আছে। আশাহত বনোয়ারী দারোগার মুখের দিকে চাহিয়া পাষাণেরও করুণা বোধ হইবে।

আর দারোগার টর্চের আলো যাহার মুখে পড়িয়াছে—সে কে, সে কী?

শাদা পাথরে খোদাই করা বুদ্ধমূর্তি। জীবনে কত কীর্তিই সে করিল তাহার শেষ নাই। সে কীর্তির একটা অধ্যায়ের সঙ্গে মণিমোহন নিজেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবেই পরিচিত। সাধারণ দৃষ্টির বিচারে, সমাজের চোখে তাহার স্থান কোথাও নাই। একটা উচ্ছৃঙ্খল বন্য জীবন—একটা আগুনের মতো তীব্র তপ্ত লালসা। কিন্তু এই মুখখানা দেখিলে সে কথা কাহার মনে হইবে? নির্মল, পবিত্র, কোনো-খানে মলিনতার একবিন্দু চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে কথা কহিল। বলিল, থাক, আলো নিবিয়ে দিন। আমি দেখেছি দারোগাবাবু।

মেয়েটি তাহাকে চিনিল কি? তাহার নীলার মত চোখে পরিচয়ের কোনো আভাস কি ঝলক দিয়া উঠিল? কিন্তু সে সব স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে হইবার

আগেই দারোগার টর্চের আলোটা নিবিয়া গেল। শুধু মাঝিদের লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল শিখার যে রক্তাভাটুকু জাগিয়া রহিল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন কোনো জনহীন নিবিড় বনের মধ্যে শান্ত সমাহিত ভাঙা একটি দেবমূর্তির ওপরে বনের পাতার ফাঁক দিয়া খানিকটা আলোকের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মণিমোহন বলিল, আমি কাল ওর সঙ্গে কথা বলব। আজ থাক। আপনি কি ওকে থানায় নিয়ে যেতে চান?

নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দারোগা যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন না, সে শুধু মণিমোহন সম্মুখে ছিল বলিয়াই। বলিলেন, থানায় নিয়ে যাবো না মানে? চালান দেব। কী যে আপনি বলেন স্যার? এই বেটিই সব জানে, সব গণ্ডগোলের গোড়াতেই—

—প্রমাণ করতে পারবেন তো?

—নিশ্চয়। সাক্ষীর অভাব হবে না। বলেন কি মশাই, আমার এতদিনের আশা, বুড়োবয়সে কোথায় একটু ভালো রকম পেন্সন পাবো তা নয়—

গলার স্বরে মনে হইল যেন কান্না উছলাইয়া পড়িতেছে।

—বেশ, যা ভালো বোঝেন করুন। তবে আমি একবার কাল আপনার আসামীর সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখব। হয়তো আপনার তাতে সুবিধেই হবে।

—বেশ তো, বেশ তো স্যার। দারোগা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন: তা হলে কালই আপনার আছে হাজির করব সকালে। কখন নিয়ে যাব? আটটা—নটা?

—আচ্ছা।

মণিমোহন চোখ বুজিয়া বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল। তাহার আর ভালো লাগিতেছে না, কথা বলিতেও যেন সে শ্রান্ত বোধ করিতেছে।

দারোগা কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, স্যার, বোঝেন তো, আমাদের সবই আপনাদের দয়ার ওপর নির্ভর করছে। দু চারটে কথা যদি বার করে দিতে পারেন, তাহলে কেনা গোলাম হয়ে থাকব। অবশ্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না, তবুও—

—আচ্ছা—আচ্ছা—মণিমোহন যেন ধমক দিল একটু: সে আপনার ভাবতে হবে না। আমি যতটুকু ভালো বুঝি করব—

—না, তাই বলছিলাম আর কি স্যার। আচ্ছা আপনি ঘুমোন—সন্ত্রস্ত দারোগা নৌকা হইতে নামিয়া গেলেন।

রাত্রি শেষ যায়। নৌকা ছাড়িয়া দিল। কালকের মতো আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে অস্ত-চাঁদের উপরে, ভোরের দিকে বৃষ্টি নামিবে কিনা কে

জানে। নৌকার গায়ে বেত-কাঁটার আঁচড়, দূরে শিয়ালের ডাক—কোথা হইতে হিস্‌হিস্‌ করিয়া একটানা অদ্ভুত শব্দ। যেন নৌকার আকস্মিক উপদ্রবে বিব্রত হইয়া কতকগুলি সদ্য ঘুমভাঙা সাপ একসঙ্গে ফণা তুলিয়াছে—শত্রুকে ছোবল মারিবে।

মণিমোহন ঘুমাইবার জন্য চোখ বুজিল কিন্তু ঘুম আসিল না। চোখের পাতায় যেন হাজার হাজার পিন ফুটিতেছে—মাথার মধ্যে ফুলঝুরির মতো অবিশ্রান্ত কতকগুলি আগুনের তারা ঝরিয়া চলিয়াছে। কাকে দেখিল সে—কী দেখিল! দশবছর ধরিয়া যাহার জন্য সে স্বপ্ন রচনা করিয়াছে, অনেক শান্ত কোমল রাত্রে, চাঁদ-ডুবিয়া-যাওয়া স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে যখন শুধু দূরের রেল লাইনের কলিকাতাগামী ট্রেনের চাকার তলায় মরানদীর ব্রীজ হইতে ঝম ঝম করিয়া একটা অদ্ভুত শব্দ ভাসিয়া আসিয়াছে, আর ঘুমন্ত রাণীর বাহু বন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে বালিশের উপরে উঠিয়া বসিয়াছে—সেই সময় চলন্ত একটা অন্ধকার ট্রেণের জানালা হইতে একখানি উজ্জ্বল সুন্দর আভাসের মতো মনের সামনে প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কাহার মুখ? এবং সেই মুখকে এখানে এইভাবে যে দেখিবে এমন কল্পনা সেকি করিয়াছিল কখনো?

আশ্চর্য মুখখানি। এত ঝড়, এত ঝাপটা যে বহিয়া গেছে! সর্বোপরি বহিয়া গেছে সময়—তেঁতুলিয়ার স্রোতে নতুন ভাঙা, নতুন উপনিবেশ জাগাইয়া তোলা সময়। অথচ সে স্রোত এতটুকুও দাগ কাটে নাই, একটি শামুক ঝিনুকের চলার দাগেও সে মুখ এতটুকু রেখাঙ্কিত হইয়া উঠে নাই। আশ্চর্য!

কাল দেখা হইবে। দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা কি ফিরিয়া আসে? আর কি ফিরিয়া আসে কখনো? জীবনের গতি বৃত্তাকার নয়, কখনো সরল, কখনো সরীসৃপ। সেদিনও মনটা নিজের বাঁধা পথ খুঁজিয়া পায় নাই—মনে রোমান্সের নেশা ছিল—এই নতুন দেশ, অদ্ভুত নদী সেদিন বিচিত্র রোমাঞ্চ কল্পনা আর স্বপ্ন-কামনা জাগাইয়া তুলিত। সেদিন আজ আর নাই। সব চেনা হইয়া গেছে, জানা হইয়া গেছে, প্রতিদিনের অতি পরিচয়ের নেশা কাটিয়া গেছে। দীর্ঘ নদীপথ ক্লান্তিকর মনে হয়,—নতুন-জাগা বালির চর দেখিয়া তিনশো বছর আগেকার পর্তুগীজদের স্বপ্ন ফিরিয়া আসে না—দুপুরের রোদে ঝিকমিক বালির তাপে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

সর্বোপরি রাণী। সেদিনও উজ্জ্বল মন তাকে মানিয়া লয় নাই—সেদিনের প্রেম ছিল আকারহীন একটা অর্ধতরল পিণ্ডের মতো, যেমন খুশি তাহাকে রূপ দেওয়া চলিত, আকার দেওয়া চলিত। আজ অনেক সূর্যের তাপে সেই তরলটা জমাট বাঁধিয়াছে—জীবনের যাহা কিছু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে সমান একটা কঠিন ভিত্তির

উপর। আজ সেখানে আলোড়ন জাগাইতে গেলে ভূমিকম্প ঘটিয়া যাইবে—সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া যাইবে। সে ভাঙন আজ আর মণিমোহন কামনা করে না—সে ভাঙনকে মনের মধ্যে মানিয়া লইবার স্পৃহা বা দুঃসাহস কোনোটাই তাহার নাই। আজ রাণীই ভালো—আজ ঝিন্টুর মধ্যেই তাহার ভবিষ্যতের রূপায়ন। তাহার চাকরীর ভবিষ্যৎ একটা স্পষ্ট উজ্জ্বল দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়াইয়া দিয়াছে।

না—দশ বছর আগেকার ঝড়ের সন্ধ্যা আর ফিরিবেনা। ফেরাটাও আজ আর কাম্য নয় তাহার।

* * * *

কিন্তু সুখ ছিল না বলরাম ভিষক্‌রত্নের। ভগবান তাঁহার কপালে একবিন্দু সুখ লেখেন নাই, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেই কি আর তাহাতে কিছুমাত্র সুবিধা হইবে!

মনে মনে ডি-সিল্‌ভা আর ক্রুজার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে বলরাম ফিরিলেন। জননী মেরীর এত দয়া, আর এই সন্তানগুলিকে তিনি কি মর্ত্যলোক হইতে তুলিয়া তাঁহার স্নেহময় স্বর্গীয় কোলে স্থান দিতে পারেন না? তাহা হইলে পৃথিবীর না হোক, অন্তত বলরামের ভাজা-ভাজা হাড়গুলি তো জুড়াইয়া যায়।

রাধানাথ তাঁহার খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া ঘুমাইতেছে। পড়িয়া আছে কুম্ভকর্ণের মতো, কাণের কাছে এখন তাহার প্রবল বেগে কাড়া-নাকড়া বাজাইলেও সে ট্যাফোঁ করিবে না। বলরামের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, নিরিবিলিতে এবং নিভৃতে তাঁহার মদনানন্দ মোদক কিছু কিছু উদরস্থ করিয়া থাকে সে।

হাত পা ধুইয়া বলরাম খাইতে বসিলেন। রাত্রে তিনি ভাত খান না—খান সামান্য রুটি আর তরকারী। কিন্তু রুটি মুখে দিয়াই মনে হইল, ইহার চাইতে জুতোর শুকতালা চিবাইয়া হজম করা সহজ। টানের চোটে মুখের বাঁধানো গোটাকয়েক দাঁত একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিবার বাসনা করিল।

—দুত্তোর—

জোর করিয়া কয়েক টুকরা রুটি দাঁতে ছিঁড়িয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। হতভাগা দিনের পর দিন কী রান্নাই-যে রাঁধিতেছে আজকাল। গৃহিণীহীন সংসারের চিরকাল যা হইয়া থাকে ঠিক তাই, এ জন্যে আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই, রাগ করাটাও সমান মূল্যহীন এবং অবান্তর।

কিন্তু দোষ শুধু রাধানাথেরই নয়। সাবাস একখানা যুদ্ধ বাধিয়াছে বটে। মানুষকে একেবারে বেহদ্দ করিল, ত্রিভুবন দেখাইয়া ছাড়িল বলিলেই চলে। ধান-চালের যাহা হইবার তাহা তো ষোলো আনাই হইয়াছে, আর আটা যা আমদানি

হইতেছে ইদানিং তাহার তুলনা ভূ-ভারতে কোথাও মিলিবে না। করাতের গুঁড়া এবং ধানের তুঁষ মিলাইয়া যে কোনোদিন আটা নামক একটি খাদ্য হইয়া উঠিতে পারে, আর তাহা মানুষের পেটে ঢুকিয়া তাহার ক্ষুধা দূর করিতে পারে, কবিরাজী শাস্ত্রের কোনো পুঁথিতেই তাহার উল্লেখ নাই। এ কী ব্যাপার এবং কী এ বস্তু?

বলরাম নিজেই উঠিয়া গড়গড়াটা ধরাইলেন। তারপর আসিয়া বসিলেন বাহিরের ঘরটাতে। বয়েস বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটাও আজকাল অত্যন্ত হালকা হইয়া উঠিয়াছে। ছানী কাটানো চোখ দুইটা মাঝে মাঝে জ্বালা করে, এক একদিন মাথার মধ্যে রক্ত চলিয়া যায়, কপালের দুপাশের রগগুলি রক্তের চাঞ্চল্যে লাফাইতে থাকে—ঘুম আসে না। আজও ঘুম আসিবে বলিয়া মনে হয় না। বলরাম বসিয়া বসিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

কিছু কিছু মশার উপদ্রব বোধ হইতেছিল, দুহাতে সেগুলি মারিতে মারিতে কখন যে তন্দ্রার আবেশ আসিয়াছে বলরাম ভালো করিয়া তাহা টের পান পাই। অস্পষ্ট হইয়া আসা চেতনার মধ্যে তিনি দেখিতেছিলেন—ডি-সিল্‌ভা মেজের উপরে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, দুর্গন্ধ বমিতে তাহার সর্বাঙ্গ ভাসিয়া গেছে, আর—

কড়াং—কড়াং—

দরজার কড়া নড়িল। কড়—কড়াং—

তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তাকিয়ায় পিঠ খাড়া করিয়া ক্ষুব্ধ বিরক্ত বলরাম উঠিয়া বসিলেন—আঃ, এই রাত্রে আবার জ্বালাইতে আসিল কে? অসুখ বিসুখ কী দিনই যে পাইয়াছে—রোগীদের অত্যাচারেই এবারে বলরামকে চর ইস্‌মাইল ছাড়িয়া তল্পী-তল্পা গুটাইতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ডাক্তারখানার শিশিতে তো খানিকটা লাল-নীল জল, অতএব—

কিন্তু দরজায় কড়া নাড়িতেছে অধৈর্যভাবে।—কে?

কোনো সাড়া আসিল না।

—কে ডাকে এখন?

তবুও সাড়া নাই। সহসা একটা আশঙ্কায় বলরামের মন ভরিয়া গেল। চারিদিকে যে একটা অশান্তি এবং বিক্ষোভের চাপা আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। ধান নাই, চাল নাই। চর ইস্‌মাইলের মানুষগুলির রক্তে বিদ্রোহ জাগিতেছে। তাহারা এখানে ওখানে জমায়েত করিয়া স্থির করিয়াছে যেমনভাবে হোক ধান চাল সংগ্রহ করিবেই। মহাজনের গোলা কিংবা আড়তদারের গুদাম—দরকার হলেও লুটতরাজ করিয়া লইতেও তাহাদের আপত্তি নাই। তাহাদের

লক্ষ্য বস্তুর ভিতরে তিনিও যে একজন আছেন, একথাও বলরাম ভালো করিয়াই জানেন।

সুতরাং আতঙ্কে তাহার বুকের ভেতরটা বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। উঠিয়া দরজা যে খুলিয়া দিবেন এমন শক্তি রহিল না, শুধু বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দুর্গানাম জপ করিয়া চলিলেন।

কিন্তু কড়—কড়াং! কড়—কড়—কড়াং—

কড়া নাড়া চলিতেছে তো চলিতেছেই। বলরাম কান পাতিয়া শব্দটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। যে নাড়িতেছে সে খানিকটা সংশয়গ্রস্ত এবং ভীত। খুব সম্ভব ডি-ক্রুজা বলিয়া মনে হইতেছে! তবু বিশ্বাস নাই—সাড়া দেয় নাই কেন?

মরিয়া হইয়া বলরাম হাঁকিলেন: কে?

একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন পাওয়া গেল। কিন্তু কি শব্দ? বলরাম কান পাতিলেন। একটা চাপা কান্না—কেউ যেন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নাই, কান্নার শব্দই বটে। কিন্তু কার কান্না, কিসের কান্না?

আর বসিয়া থাকা অসম্ভব!

—দাঁড়াও—দাঁড়াও—খুলছি—মরিয়া হইয়া একটা হাঁক দিয়া বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। যা হওয়ার হোক। এই অশ্রান্ত কড়া নাড়া, রহস্যময় নীরবতার সঙ্গে কান্নার শব্দটা তাহাকে পাগল করিয়া দিতেছে। বলরাম আলোটার তেজ বাড়াইয়া দিলেন তারপরে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া দ্বিধা-কম্পিত হাতে দরজার হুড়কাটা টানিয়া খুলিয়া দিলেন। কে জানে, কোন্ ভয়ঙ্কর একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

কিন্তু বাস্তবিকই একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার বাহিরে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যাহা ঘটিল অন্তত সে সম্ভাবনার জন্য মনের দিক হইতে তিনি এতটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। তাহাকে নির্বাক স্থবির করিয়া দিয়া একটি লোক ছুটিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। কিন্তু সে কি এবং কে বলরাম বুঝিতে পারিলেন না।

তাহার সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢাকা। সেই বোরখার এখানে ওখানে কাঁচা রক্ত চাপ বাঁধিয়া আছে। ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া সে মাতালের মতো টলিতেছে।

ব্যাপার কী? ভৌতিক ঘটনা নাকি? না বলরাম ঘুমাইয়া আছেন এখনো?

কিন্তু বোরখায় ঢাকা রহস্যময় মূর্তিটি তাঁহার সামনেই তো দাঁড়াইয়া আছে। রক্তের দাগগুলি সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশই নাই। হায় ভগবান—একি

সমস্যার মধ্যে তুমি নিরীহ গোবেচারী বলরাম ভিষকরত্নকে টানিয়া আনিলে! শেষ পর্যন্ত খুনের মামলায় পড়িবেন নাকি তিনি?

—তুমি কে—কী চাও?

উত্তরে তেমনি বোখরার ভিতর হইতে চাপা কান্নার শব্দ। একটি মেয়ে—মুসলমানের মেয়ে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

বলরামের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া গেল। সমস্ত চৈতন্য সহ্যের শক্তিতে অতিক্রম করিয়া গেছে। পাগলের মতো তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন: কে তুমি কী চাও?

মেয়েটি এবারেও জবাব দিল না। তার পরেই সোজা একেবারে বলরামের পায়ের উপরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

কয়েক মূহূর্ত বলরাম থ হইয়া রহিলেন! তারপর কী ভাবিয়া মেয়েটির মুখের উপর হইতে টানিয়া বোরখাটা সরাইয়া লইলেন।

গাল কপাল দিয়ে রক্ত গড়াইয়া নামিয়াছে—একখানা সুন্দর মুখ সেই রক্ত মাখিয়া একটি পদ্মের মতো পড়িয়া আছে। অজ্ঞান হইয়া গেছে মেয়েটি, দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে—বুকের ভিতর হইতে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন পাঁজর ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

দশ বছর পার হইয়া গেছে। তবু লণ্ঠনের আলোয় বলরাম তাহাকে চিনিলেন। শিরায় শিরায় রক্তে মাংসে কামনা কল্পনায় যে এতোদিন ধরিয়া এমনভাবে একান্ত হইয়া আছে তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া কি এতই সহজ। শুধু দশ বছর কেন, একশো বছরের বেশি হইয়া গেলেও বলরাম তাহাকে চিনিতে পারিতেন।

রক্তমাখা রক্তপদ্মের মতো যাহার মুখখানি সেই মেয়েটি মুক্তো। দশ বছর আগে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তেমনি না বলিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে।

এগারো

কিছুক্ষণ বলরাম কোনো কথাই কহিতে পারিলেন না। যেন কী একটা যাদুমন্ত্রে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সুরু করিয়া জিহ্বা পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেছে। একি কখনো সম্ভব, এমন কি হইতে পারে কোনোদিন? ডি-সিল্‌ভার ঘর হইতে সেই উগ্র মদের গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও কি মাতাল এবং বিহ্বল করিয়া দিয়াছে?

বলরাম দাঁড়াইয়া রহিলেন। পা কাঁপিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে—বুকের দুদিক

হইতে দুইটা প্রাণপিণ্ড ছুটিয়া আসিয়া যেন একসঙ্গে ঠোকাঠুকি করিতেছে। কিন্তু বিহ্বল নির্বোধ হইয়াও বেশিক্ষণ দঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না তিনি। পায়ের নীচে সেই রক্তাক্ত দেহটা নড়িতেছে—ঢেউয়ের মতো নিশ্বাস পড়িতেছে। বলরামের মনে পড়িল এমনিভাবে আর একবার তিনি টর্চের আলো ফেলিয়া দেখিয়াছিলেন ; সিঁড়ির উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে একটি নারীমূর্তি, গলগল করিয়া তাজা রক্তের ধারা নামিয়া তাহার সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিতেছে। সে দশ বৎসর আগেকার কথা, আর আজ—

পায়ের তলায় পড়িয়া গোঙাইতেছে মুক্তো। মুক্তো—দশবছর আগে একদিন যে বলরামের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল—যাহার বুকের মধ্যে অসহায় মাথাটা গুঁজিয়া তিনি শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িতেন—তাঁহার সেই মুক্তো! মুহূর্তে যেন বিদ্যুতের চমকে বলরামের সর্বাঙ্গ নড়িয়া উঠিল।

—রাধানাথ, জল আন্, জল—

* * * *

মনিমোহনের বোট যখন চর ইস্‌মাইলে বাংলোর ঘাটে আসিল, তখন রাত্রির শেষ প্রহর। ঝিমঝিম ঝিরঝির করিয়া সেতারের একটানা স্বরের মতো যে বৃষ্টিধারাটা ঝরিয়া পড়িতেছিল, সেটা থামিয়া গেছে ঘণ্টাখানেক আগে। বৃষ্টির জলে উজ্জ্বল হইয়া অস্তপথিক নক্ষত্র-চক্র আসন্ন-প্রভাত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আছে শান্ত আর কোমল দৃষ্টিতে। ব্যাঙের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-গান উঠিতেছে, ঝোপের মধ্যে পোকা ডাকিতেছে। কোথা হইতে বাসা-ভাঙা, একটা কাক থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—যেমন আর্ত, তেমনই করুণ তাহার অসহায় স্বর।

মণিমোহনের সমস্ত চৈতন্যটা আগুনের মতো জ্বলিতেছে। দৃষ্টির সামনে অগ্নিশিখার মতো প্রখর ও ভাস্বর হইয়া শোভা পাইতেছে একখানা জীবন্ত বুদ্ধমূর্তি। সে মূর্তির চোখে দুইখানি নীলা বসানো। তাহা উপনিবেশের কোনো কালবৈশাখীতে ঝড়ের পিঙ্গল আলোয় দীপ্তি বিকীরণ করিতে থাকে, তাহার পশ্চাতে কামনার শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র একখানা ছোরা ঝলক লাগাইয়া যায়।

নৌকার মাঝি ঝপ্ করিয়া লগিটাকে ফেলিল। জল-কাদায় মধ্য হইতে আকস্মিক শব্দ উঠিল একটা, যেন শেষ রাত্রির রহস্যময়ী নদীটা সেই বর্মী মেয়ে মা-ফুনের মতো একটা কৌতুকের আনন্দে খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাঝি বলিল, হুজুর, উঠবেন না?

মণিমোহন জবাব দিল, নাঃ থাক। এত রাত্রে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘণ্টা তিনেক রাত আছে, নৌকোতেই ঘুম দিয়ে নেব এখন।

—সে কি হুজুর, কষ্ট হবে যে। ভালো বিছানা নেই, কিছু নেই—

—তা হোক, তা হোক।

মাঝিরা আর কথা কহিল না। হাকিমের মর্জির উপরে বলিবার কথা কিছুই তাহাদের নাই। মালসা হাইতে আগুন লইয়া তাহারা হুঁকা ধরাইয়া আরাম করিয়া বসিল, দশ পনেরো মিনিট ধরিয়া তামাক টানিল, মণিমোহনের দুর্বোধ্য চট্টগ্রামের ভাষায় খানিকক্ষণ কী গল্প করিল, তারপর একখানা কাপড় মুড়ি দিয়া যে যেখানে পারিল গুঁটিশুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। আর শোয়া মানেই ঘুমাইয়া পড়িতে যা দেরী।

নদীর বুক হইতে শেষ রাত্রির হাওয়া নৌকার এখান ওখান দিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। কম্বলের মধ্যেও অল্প অল্প শীতের শিহরণ লাগিতেছে মণিমোহনের। তবে এ ঠাণ্ডাটা পীড়াদায়ক নয়—শরীরের ভিতর কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে মাত্র।

ইচ্ছা করিয়াই রাতটা সে বোটে কাটাইয়া দিতে চায়। আজ দশবৎসর পরে বর্মী মেয়েকে দেখিয়া তাহার সমস্ত চিন্তা-চেতনাই যেন বিচিত্রভাবে বিশৃঙ্খল হইয়া গেছে। ঠিক সেই সব দিন যেন রক্তের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে—যে-সব দিনে তাহার রক্তে প্রবেশ করিয়াছিল উপনিবেশের নির্মম রুদ্র-বসন্ত, উন্মত্ত বর্বর যৌবন! বাহিরের গর্জন-মুখর অকাল-অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দুইটি দেহের অণুতে অণুতে মশাল জ্বলিতেছিল, রাণীর মুখখানা ছায়াছবি হইয়া মিলাইয়া গিয়াছিল দৃষ্টির বাহিরে।

গায়ের মধ্যে জ্বালা করিতেছে, মাথাটা যেমন ভারী, তেমনি গরম হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহন উঠিয়া বসিল। তাহার আবার নেশা ধরিতেছে নাকি? কাল দারোগা মেয়েটাকে লইয়া আসিবেন নিশ্চয়। সে কী বলিবে কে জানে!

কী বলিবে!

হঠাৎ মণিমোহনের চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

এ সে করিতেছে কী! সে কী পাগল হইয়া গেল? ওই অসচ্চরিত্র একটা মগের মেয়ে, নিজের স্বামীকে যে ইচ্ছা হইলেই খুন করিতে পারে, কামনার তাগিদে যে-কোনো লোককে আত্ম-সমর্পণ করিতে যাহার বাধা নাই এবং যে একসময় মণিমোহনকে নির্বোধের মতো নাকে দড়ি দিয়া নাচাইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সে আবার কথা কহিতে চায় কোন্ সাহসে এবং কোন্ লজ্জায়!

বর্মী মেয়েকে তো বিশ্বাস নাই। সেদিন যে ঝড়ের সন্ধ্যা তাহার জীবনে আসিয়াছিল, মণিমোহনের কাছে সেই বিস্ময়কর ভয়ানক মুহূর্তটির মূল্য যাহাই থাক, এ মেয়েটার কাছে তাহার দাম কতটুকু! ইহার এইই তো পেশা—যখন যাকে

পায় কাছে টানিয়া লয়, দুদিনের জন্য তাহাকে মদের নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তারপর একটা ভাঙা-পুতুলের মতো ফেলিয়া চলিয়া যায়। মণিমোহনও একদিন তাহার পুতুল খেলার সঙ্গী হইয়াছিল—তাহার বেশি কিছুই নয়।

মনে করো—কাল মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া বসিল, একদিন মণিমোহনের সঙ্গে তাহার একটা অশোভন সম্পর্ক ছিল, একদিন মণিমোহন—

কথাটা ভাবিতেই অন্তরাত্মা তাহার চমক খাইয়া উঠিল। কী সর্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টির সামনে কতখানি নামিয়া যাইবে সে! দারোগা জানিবেন, চর ইস্‌মাইলের সবাই জানিবে, রাণী জানিবে, কে জানিবে এবং কে জানিবে না! আর ব্যাপারটা হয়তো ওখানেই শেষ হইবে না, শ্রাদ্ধ আদালত পর্যন্তও হয়তো গড়াইবে এবং ওই নির্লজ্জ, ওই ভয়ঙ্কর নীলার মতো জলন্ত দুইটি শাণিত-নয়না মেয়েটি আদালতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বসিবে—

তাহা হইলে? মণিমোহনের আচ্ছন্ন সত্তার মধ্যে বাস্তব পৃথিবীর তীব্র রূঢ় আলো আসিয়া পড়িল। দশ বছর আগে যাহা ঘটিয়াছিল আজ আর তাহা সত্য নাই—আজ আর সত্য হইতে পারে না! সেদিন দায়িত্ব ছিল না—জীবনের কোনো পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ রূপ ছিল না, শুধু রোমান্স্‌ ছিল, শুধু উদগ্র খানিকটা মাদকতা ছিল। কিন্তু আজ সে গেজেটেড অফিসার হইয়াছে, সরকারী চাকরীর ক্রমোন্নতির পথ ধরিয়া চলিয়াছে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব সম্ভাবনার দিকে। রাণীকে সে ভালবাসে, ঝিণ্টুর মধ্য দিয়া তাহার নিজের মৃত্যুহীন প্রাণ-প্রবাহকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। খ্যাতি, অর্থ ও আরাম। অফিসে আদালতে দশ বছর আগেকার এই কেলেঙ্কারীটা জানাজানি হইলে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না, রাণীর কানে গেলে যেমন দুর্বহ, তেমনই বিড়ম্বিত হইয়া উঠিবে সমস্ত পারিবারিক জীবনটা। তাহার চাইতে—

কাল দারোগা আসিবার আগেই সে পালাইবে। পালাইবে এই চর ইস্‌মাইল হইতে। আগস্ট আন্দোলনের ফেরারী ধরা তাহার দায়িত্ব নয়, ওসম্বন্ধে মামুদপুরের দারোগা যাহা ভালো বোঝেন করিবেন! যে কাজে সে এখানে আসিয়াছিল, তাহা একরকম শেষ হইয়াছে, যাহা হয় নাই, তাহা সদর অফিসে ফিরিয়া গিয়া কাগজপত্র মারফৎ সারিয়া দিলেই চলিবে।

সে পালাইবে। আজ তাহার জীবন বদলাইয়াছে, তাহার যৌবন নাই। চর ইস্‌মাইলকে সে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না, মানিয়া নিতে পারে না কাল-বৈশাখীর তরঙ্গ-তাণ্ডবে উন্মত্ত এই ভয়ানক নদীর দিগন্ত-বিস্তারকে, এখানকার বর্বর প্রাণোল্লাসকে। আজ তাহার মনের মধ্যে একদিকে দেখা দিতেছে লাল-কাঁকর-ফেলা সেই ছোট প্লাটফর্ম, বাতাসে ভাঁটফুল আর আমের মুকুলের গন্ধ, পারুল-বনের

মধ্যে প্রেমদাস বৈরাগীর আখড়া হইতে খোল করতাল আর কীর্তনের সেই ঐক্যতান। আর একদিকে রাত্রির অপ্সরী কলিকাতা—ফ্লাওয়ার মার্কেট, মেট্রো সিনেমা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের গা হইতে পাউডারের গন্ধ; আর অফিসারদের ক্লাবে বিলিয়ার্ড টেবিলে ষ্টিকের শব্দ, তকমা আঁটা বেয়ারার হাতে রূপার ট্রেতে বিলাতী মদের পাত্র। ঘরের রেডিয়ো খুলিয়া বসিয়া আছে রাণী, ঝিণ্টু তাহার খেলার মোটর লইয়া পিয়ারীর সঙ্গে অকারণ কলহাসিতে সমস্ত বারান্দাটা মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

নাঃ—সে পালাইবে। কাল সকালেই এবং যেমন করিয়া হোক। যৌবনের আত্মবিস্মৃত একটি বিহ্বল তরুণের সঙ্গে আজকের হাকিম মণিমোহনের কোনো মিল নাই, কোনো মিল থাকা অসম্ভব।

* * * * *

ওদিকে কালুপাড়ার দিক হইতে জনতার উত্তাল তরঙ্গ চর ইস্মাইলের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মজঃফর মিঞার গোলা পোড়াইয়া দিয়া তাহাদের রক্তেও আগুন ধরিয়াছে। এতদিন ধরিয়া যে ভয় এবং দ্বিধার ভার তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছিল, সেটা সরিয়া গেছে। এখন তাহাদের ভয় নাই, সংশয় নাই; যুদ্ধ এবং মহাজনের পীড়নে যে জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল—তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, উপনিবেশের অমার্জিত উদ্বেল শক্তি। মরিতে যদি হয় তো সোজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মরিবে না—যা হয় একটা কিছু করিয়া তবে ছাড়িবে।

সারা রাত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি—বাদলের দমকা বাতাস বহিতেছে। তাহারই মধ্যে, সেই জল-বাতাস মাথায় করিয়া তাহারা মসজিদের মাঠে সভা করিল। মহাজনদের সকলকে দেখিয়া লইতে হইবে। চাল না পাওয়া যায়, তাহারা যেমন করিয়া হোক আদায় করিয়া লইবে। দিনের পর দিন এই যে একটা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, গায়ে রক্ত থাকিতে, হাতে লাঠি থাকিতে তাহারা কিছুতেই সেটা মানিয়া লইবে না।

সভায় জোর করিয়া বক্তৃতা দিল জমির।

—ভাই সব, নিজের বরাত নিজের হাতে। কুকুরের মতো না খেয়ে মরব কেন আমরা? চলে এসো, যে ব্যবস্থা পারি আমরাই করব। আমরা জোয়ান—মরি তো লড়াই করে মরব—

—আল্লা হো আকবর—

রাতের অন্ধকার ফিকে হইবার আগেই পাঁচশো লাঠিয়াল অগ্রসর হইল চর

ইস্মাইলের দিকে। মামুদপুরের বনোয়ারী দারোগা তখন সুখ-শয্যায় পড়িয়া অচির-ভবিষ্যতে ইন্‌সপেক্টার হইবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন।

মণিমোহন বলিয়াছিল, রাণী, আজই সদরে ফিরতে হবে—এখনি। খুব জরুরি দরকার, খবর পেলাম!

ঘাটে বোট তৈরী হইতেছে। জিনিসপত্র সব তোলা হইয়া গেল। রাণীর শরীরটা এখনো দুর্বল—বোটের মধ্যে বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে। ঝিণ্টু মায়ের কাছে বসিয়া একমনে চকোলেট চুষিতেছে, পিয়ারী মাঝিদের ধমক দিয়া নিজের পদ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

মণিমোহন পালাইতেছে। দারোগা আসিয়া কী ভাবিবেন কে জানে। কিন্তু সে কথা ভাবিলে তো মণিমোহনের চলিবে না। যাহা নিশ্চয় আর নির্ধারিত হইয়া গেছে—সেখানে নতুন করিয়া ঝড় আনিতে আর সে চায় না। জীবন্ত-বুদ্ধমূর্তির মতো চোখ দুটির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইতে আজ আর তাহার সাহস নাই।

ঠিক এম্‌নি সময় আর একখানা নৌকা আসিয়া পাশে লাগিল। মণিমোহন চাহিয়া দেখিল, সামনে গলুইয়ে কবিরাজ বসিয়া।

—এ কি, কবিরাজ মশাই যে!

কবিরাজ ম্লানভাবে হাসিলেন।

—কোথায় চললেন?

—শহরে।

—নৌকোর ভেতরে কে?

কবিরাজ মুহূর্তে কেমন হইয়া গেলেন, পরক্ষণেই তাঁহার মুখ কঠিন ও দৃঢ় হইয়া উঠিল। স্থির শান্ত গলায় বলরাম জবাব দিলেন: আমার স্ত্রী।

দশবছর আগেকার কথা ভুলিয়া গেছে মণিমোহন। শুধু বলিল, আপনার স্ত্রী? ওঃ!

মণিমোহনের মাঝিরা নৌকার নোঙর তুলিয়াছে। পাঁচ পীর বদর—বদর। সামনে সকালের নদী শান্ত ও উজ্জ্বল বিস্তারে যেন ঘুমাইয়া আছে। ঝড়ের গর্জন নয়—রাক্ষসী ভৈরবীমূর্তি নয়। জলের মৃদু কলধ্বনি যেন সঙ্গীতের মতো বাজিতেছে। ওপারে দিকচক্রবালে শ্যামল বনরেখার ধু-ধু আভাস দেখা যাইতেছে—মাথার উপর নির্ভাবনায় উড়িয়া চলিয়াছে মাছরাঙা আর গাং শালিকের ঝাঁক।

মণিমোহন বলিলেন, আচ্ছা কবিরাজ মশাই, নমস্কার।

—নমস্কার।

ভাঁটার প্রখরটানে সরকারী বোটখানা ভাসিয়া গেল।

বলরামের নৌকাও এখনি ছাড়িবে। মাঝিরা বেশ করিয়া তামাক টানিয়া লইতেছে—অনেকখানি পথ পাড়ি জমাইতে হইবে। বলরাম অন্যমনস্কের মতো বিড়ি ধরাইলেন।

মুক্তোর সর্বাঙ্গে গভীর ক্ষত। বেশ বোঝা যায়, ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়া তাহাকে কোপাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার জ্ঞান এখনো ফেরে নাই, শহরে গিয়া ফিরিবে কি না কে জানে! বোধ হয় সম্পত্তির গোলমালেই হুরুল গাজীর সুযোগ্য পুত্রেরা তাহার এই অবস্থা করিয়া ছাড়িয়াছে।

কিন্তু ওসব ভাবিবার দরকার তাঁহার নাই। আজ মুক্তো তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে—আজ আবার তাহাকে তিনি গ্রহণ করিবেন। এই চর ইস্‌মাইলে যেখানে সমাজ নাই, মানুষের বাঁধাধরা নিয়মের দোহাই মানিয়া যেখানে জীবন সরল-রেখাতেই বহিয়া যায় না—সেখানে মুক্তোকে নতুন করিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই, সংশয়ও নাই। তাই বোরখা খুলিয়া তিনি তাহাকে শাড়ী পরাইয়া দিয়াছেন—পরাইয়া দিয়াছেন দশ বছর আগেকার তুলিয়া রাখা অতি-যত্নের ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীখানা। শহরে গিয়া মুক্তো যদি বাঁচে, তাহা হইলে এই শাড়ী পরাইয়া মুক্তোকে তিনি নতুন করিয়া ঘরে তুলিবেন, নতুন করিয়াই তাঁহার মিলন-বাসর রচনা হইবে।

মুক্তো ঘুমাইয়া আছে। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন নাই, পরম নিশ্চিন্ত, পরম আশ্বস্ত। যেন সারা রাত ঝড়ের মধ্যে ঘুরিয়া ক্লান্ত ভীত একটা পাখী নীড়ে আসিয়া তাহার আপনার জনের বুকের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। বলরাম নাড়ী দেখিলেন। দুর্বল, কিন্তু স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত আশঙ্কার কারণ নাই।

মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে পাগলের মতো রাধানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

—বাবু, বাবু, সর্বনাশ!

—কী হয়েছে?

—পাঁচশো লোক এসে চড়াও হয়েছে—ধান লুঠ করে নিয়ে গেল! এখানে ওখানে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে—সব যে গেল!

—যাক।

—সে কি! আমি কী করব বাবু?

—যা খুশি। মাঝি, নৌকো খোলো।

চর ইসমাইলে বলরামের আর আকর্ষণ নাই। যদি কখনো ইচ্ছা হয় ফিরিবেন, নতুবা নয়। যাক—সব যাক। আজ মুক্তোকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, সব পূর্ণ হইয়া

গেছে। চর ইসমাইলে না হোক—এত বড় পৃথিবী, এত বিরাট, এর কোথাও কি তাঁহারা স্থান করিয়া নিতে পারিবেন না ? সারা জীবন ঘর বাঁধিবার যে ব্যর্থ বাসনা লইয়া তিনি শুধু বিষয়-সম্পত্তির মূল্যহীন বোঝাটাকেই ছানিয়া চলিয়াছেন—আজ সেই বোঝা নামাইয়া দিয়া একটিমাত্র প্রেমকেই স্বীকার করিতে চান তিনি।

রাধানাথ কথা কহিল না। সে শুধু বালির উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * *

চর ইসমাইলের দুরন্ত যৌবন জাগিয়াছে। নতুন কালে, নতুন রূপে। ইহার কাছ হইতে মণিমোহনেরা পালাইতে চায়, বলরামরা ইহার বিচিত্র বিপুল সংঘাতকে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে কতটুকু ক্ষতি। মৃত্যুঞ্জয় অমার্জিত মানবসত্তা এখানে নিঃশব্দ ও নিভৃত আয়োজনে দিনের পর দিন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে নিজেকে। এই বিশাল-ব্যাপ্ত জলরাশি হইতে—এই ঝড়ের আকাশ হইতে—বিলুপ্ত পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভাঙা পঞ্জর হইতে—এখানকার অসংযত আরণ্য-কামনা হইতে। সে দিন হয়তো দূরে নয়—যেদিন এখান হইতেই নিজেকে প্রকাশিত করিবে বাংলার গণশক্তি—বাংলার প্রচণ্ড ও বিপুল প্রাণশক্তি।

সে ইতিহাস—দৈনন্দিন, সে ইতিহাস—ধারাবাহিক। তাহার সমাপ্তি নাই, উপসংহারও নাই। আজ উপনিবেশ হইতে চারশো মাইল দূরে বসিয়া সে অনাগত বিপুল কাহিনীর আমি ভূমিকা মাত্র রচনা করিয়া গেলাম, নতুন যুগের মানুষ আসিয়া তাহাকে সমাপ্ত করিবে।

—শেষ—